স্বদেশ-সাধক সুশীল কুমার ধাড়া

প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপনি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক :
সুশীল কুমার ধাড়া পঁচাশিতম জন্মোৎসব কমিটির পক্ষে
সভাপতি ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকাল :
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯

প্রচ্ছদ :
প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রক :
শ্রীমা প্রিন্টার্স
তমলুক
মেদিনীপুর

উৎসর্গ

স্বাধীনতা সংগ্রামের
শহীদ ও অত্যাচারীতদের
উদ্দেশে

সম্পাদকীয়

'স্বদেশ সাধক সুশীল কুমার ধাড়া' শীর্ষক সংকলনটি পরম শ্রদ্ধেয় সুশীলবাবুর পঁচাশিতম জন্মোৎসব উদ্‌যাপন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হ'ল । এই সংকলনটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমরা সুশীলবাবুর জীবন বৃত্তান্তের পাশাপাশি তাঁর সমকালে মেদিনীপুরের তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে প্রেক্ষাপট রূপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাই এই সংকলনে আলোচ্য প্রবন্ধগুলি ২টি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হ'ল। প্রথম পর্বে সুশীলবাবুর কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচিত প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্বে সামগ্রিকভাবে জাতীয় আন্দোলনের, বিশেষ করে মেদিনীপুরের স্বাধীনতা-সংগ্রাম-কেন্দ্রিক প্রবন্ধগুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

এই সংকলনের জন্য যে সব বিশেষজ্ঞরা তাঁদের অমূল্য সময় ব্যয় করে লেখা দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। এই সংকলনটি প্রকাশ করে আমরা কেবল সুশীলবাবুর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাইনি সেই সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে ও জনসেবায় উৎসর্গীকৃত এমন মানুষদের আদর্শ যে আজকের দিনে অনুকরণযোগ্য সেকথাও বলতে চেয়েছি। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সন্তান-সন্ততিরা দেশের আদর্শ-স্থানীয় মানুষদের কথা জানুক এটিও আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এইসব লক্ষ্য পূরণে এই সংকলনটি সমর্থ হলে আমাদের প্রয়াস সার্থক বুঝব।

এই পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন 'পূর্বাদ্রি' পত্রিকার সম্পাদক ও তমলুকের সাহিত্য-সেবীদের একনিষ্ঠ উৎসাহ দাতা শ্রী ইন্দুভূষণ অধিকারী, প্রচ্ছদ শিল্পী শ্রী প্রণবেশ মাইতি এবং শ্রীমা প্রিন্টার্সের পক্ষে শ্রী জয়দেব মাজি ও কর্মীবৃন্দ। এঁদের সবাইকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

সুশীল কুমার ধাড়ার পঁচাশিতম জন্মোৎসব উদ্‌যাপন কমিটি

সভাপতি : ডঃ শংকরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহ-সভাপতি : অধ্যাপক প্রণব বাহুবলীন্দ্র

সম্পাদক : ডঃ প্রদ্যোত কুমার মাইতি

সহ-সম্পাদক : অধ্যাপক বিমলেন্দু চক্রবর্তী

কোষাধ্যক্ষ : রাজর্ষি মহাপাত্র

১। কুমুদিনী ডাকুয়া। স্বাধীনতা সংগ্রামী। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় অবিভক্ত তমলুক মহকুমায় গড়ে ওঠা 'ভগিনী সেনা'র অন্যতম সদস্যা। 'অগ্নি যুগের অজানা কাহিনী' সংকলন পুস্তকের অন্যতম লেখিকা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি স্মৃতিচারণ অবিভক্ত তমলুক মহকুমার বিয়াল্লিশের রক্ত ঝরা দিনগুলিকে জানতে সাহায্য করে।

২। কেশব চৌধুরী, এম.এ, পি-এইচ. ডি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান। বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

৩। গৌতম ভদ্র, এম.এ, পি-এইচ. ডি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা। বাংলা ভাষায় তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল: 'মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ।'

৪। নিমাই সাধন বসু, এম.এ, পি-এইচ. ডি (লণ্ডন), ডি. লিট. (লণ্ডন)। প্রাক্তন উপাচার্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক্তন প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বহু উল্লেখযোগ্য ইংরাজী ও বাংলা পুস্তকের রচয়িতা। বর্তমানেও তিনি সৃষ্টিধর্মী কাজে লিপ্ত।

৫। প্রণব বাহুবলীন্দ্র, এম.এ। তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। সাহিত্য ও স্থানীয় ইতিহাস বিষয়ে লেখালেখি প্রায়ই দেখা যায়। এছাড়া বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত গ্রন্থগুলির অন্যতম হল: 'ওমর খৈয়াম-মেঘদূত-গীতগোবিন্দ', 'বিশ্ব ক্লাসিকস-সম্ভার', 'বিদ্যাসুন্দর'।

৬। প্রণবানন্দ যশ, এম.এ., পি-এইচ ডি.। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ও কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

৭। প্রদ্যোত কুমার মাইতি, এম.এ., পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন), ডি. লিট. (যাদবপুর)। তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। প্রাবন্ধিক ও গবেষক। ১৯টি উল্লেখযোগ্য সংকলন পুস্তকের অন্যতম প্রবন্ধকার। কোলকাতা ও দিল্লী থেকে ইংরেজী ও বাংলায় ছোট বড় করে ১০টি গবেষণামূলক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। লোক সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের আজীবন সদস্য এবং তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রের (তমলুক) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও ডিরেক্টর।'

৮। প্রভাতাংশু মাইতি, এম.এ.। কোলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক। 'Studies in Ancient India', 'A History of Europe', 'ইউরোপের ইতিহাসের রূপরেখা', 'ভারত ইতিহাস পরিক্রমা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। বেশ কয়েকটি প্রবন্ধের রচয়িতা।

৯। বানীব্রত ত্রিপাঠী, এম.এ., বি. এড.। প্রাবন্ধিক ও গবেষক। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের মুখপত্র 'ইতিহাস অনুসন্ধান'-এ এঁর কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কাঁথি ও তমলুক মহকুমার বিয়াল্লিশের আন্দোলনের উপর গবেষণা শেষ করে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস জমা দিয়েছেন। দুটি শিক্ষাবর্ষব্যাপী তিনি তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে আংশিক সময়ের অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছিলেন।

১০। 'মালীবুড়ো'। এটি ছদ্মনাম। আসল নাম যুধিষ্ঠির জানা। ইতিহাস, গল্প ও উপন্যাস পুস্তকের রচয়িতা। বহু মূল্যবান প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস' সুধী সমাজে প্রশংসিত।

১১। রাজর্ষি মহাপাত্র, এম.এ., বি. এড.। প্রাবন্ধিক ও তরুণ গবেষক। তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আংশিক সময়ের অতিথি অধ্যাপক হিসেবে দীর্ঘ দিন কাজ করছেন। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস ও পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সদস্য। কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের মুখপত্র 'ইতিহাস অনুসন্ধান'-এ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় ও অন্যত্র পত্র পত্রিকায় গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

১২। রাধাকৃষ্ণ বাড়ী। স্বাধীনতা সংগ্রামী। তমলুকের '৪২-এর আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। 'তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি'র সাধারণ সম্পাদক এবং 'অজেয় পুরুষ অজয় কুমার' পুস্তকটি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে 'বিয়াল্লিশের আন্দোলনে অবিভক্ত তমলুক মহকুমা' শিরোনামে পুস্তক রচনা করছেন।

১৩। বীনা পাল, এম.এ., পি-এইচ. ডি.। রীডার, ইতিহাস বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর। তাঁর পি-এইচ. ডি. গবেষণার বিষয় হল 'স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের মহিলাদের ভূমিকা'। গবেষণা সন্দর্ভটির প্রকাশ আসন্ন।

১৪। শচীন্দ্র কুমার মাইতি, এম.এ, পি-এইচ. ডি. (লন্ডন)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। বহু সৃষ্টিধর্মী পুস্তকের রচয়িতা। কোলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও আগ্রা থেকে ইতিপূর্বে তাঁর লেখা ও সম্পাদিত ১২টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানেও তিনি সৃষ্টিধর্মী গবেষণা কর্মে লিপ্ত। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

১৫। শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., পি-এইচ. ডি.। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের 'আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অধ্যাপক' ও বিভাগীয় প্রধান। দর্শন শাস্ত্রের উপর তাঁর মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি বিশেষ সুবিদিত।

১৬। সনৎ কুমার নস্কর, এম.এ., পি-এইচ. ডি.। হলদিয়া সরকারী কলেজের (মেদিনীপুর) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক।

১৭। সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য, এম.এ., পি-এইচ. ডি.। প্রাক্তন উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণা সুধী সমাজে বিশেষ সমাদৃত। তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। অর্থনীতিবিদ হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা সুবিদিত।

১৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এম.এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট. (রাঁচি)। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর তাঁর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা পুস্তক বারাণসী ও দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯। হরিপদ মাইতি, এম. এ.। ময়না কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: (১) স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, ময়না থানা (২) ভগবানপুর থানার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও (৩) মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)। শেষোক্ত পুস্তক দুটির তিনি যুগ্ম গ্রন্থকার। বর্তমানে তিনি ইংরাজী ভাষায় মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় রত।

বিমলেন্দু চক্রবর্তী, এম এ.। রামপুর বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের (চৈতন্যপুর, মেদিনীপুর), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

প্রসঙ্গ : সুশীল কুমার ধাড়া

দ্বিতীয় পর্ব

একনজরে অবিভক্ত তমলুক মহকুমার বিয়াল্লিশের আন্দোলনের চালচিত্র

১

ব্রিটিশ সরকার '৪২ এর আন্দোলনের সময় তমলুক মহকুমায় যা ঘটিয়েছে তার বিবরণ

(১)	গুলীতে শহীদ হয়েছেন—	৪১ জন
(২)	গুলীতে গুরুতর আহত —	১৯৯ জন
(৩)	অন্যান্যভাবে আহত -	১৪২ জন
(৪)	নারী ধর্ষিতা হয়েছেন—	৭৩ জন, এর মধ্যে ১ জন মারা যান
(৫)	ধর্ষণের চেষ্টা হয়েছিল—	৩১ জন
(৬)	নারীদের উপর প্রহার ও নির্যাতন—	১৫০ জন
(৭)	গৃহ পুড়িয়েছিল —	১১৭ টি
(৮)	গৃহ পোড়ানোর ক্ষতির পরিমাণ—	১,৩৯৫০০ টাকা
(৯)	গ্রেপ্তার—	১৮৬৮ জন
(১০)	বে-আইনীভাবে আটক—	৫০৭৬ জন
(১১)	লাঠির আঘাতে নির্যাতন—	৪২২৬ জন
(১২)	আটক বন্দী (ডি. আই. আইন বলে)—	১২৯ জন
(১৩)	স্পেশাল পুলিশ হিসাবে কাজ করতে হয়—	৪০১ জনকে
(১৪)	গৃহ লুণ্ঠন—	১০৪৪ টি
(১৫)	গৃহ লুণ্ঠনের ফলে ক্ষতির পরিমাণ—	২১২৭৯৫ টাকা
(১৬)	গৃহ তল্লাসী—	১৩৭৩০ টি বাড়ী
(১৭)	বাড়ী জবর দখল—	২৭ টি
(১৮)	মাল ক্রোক—	৫৯ টি পরিবারের
(১৯)	মাল ক্রোকের ফলে ক্ষতির পরিমাণ—	২৫৩৬৫ টাকা
(২০)	পাইকারী জরিমানার পরিমাণ—	১৯০০০০ টাকা
(২১)	প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষণার সংখ্যা—	১৭ টি
(২২)	বোমা বর্ষণ—সুতাহাটায় একবার	
(২৩)	সর্বমোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ—আনুমানিক—১০,০০,০০০ টাকা	

২

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের কার্য বিবরণী

(১) বিচার বিভাগ—জনসাধারণের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার সংখ্যা—২৯০৭ টি। এছাড়া কিছু মামলা আপিল কোর্টে ও ট্রাইবুন্যাল কোর্টে বিচার হয়

(২) জনস্বাস্থ্য ও জনরক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়েছে—৭৯,০০০ টাকা

(৩) শান্তি-শৃঙ্খলা— চুরি-ডাকাতি প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ করেছিল

(৪) শিক্ষা—বহু জাতীয় স্কুলকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেছিল

৩

থানা জাতীয় সরকারের অধিনায়কবৃন্দ

(২৪।৪।৪৩—১।৯।৪৪)

মহিষাদল ঃ প্রথম অধিনায়ক—শ্রী নীলমণি হাজরা
দ্বিতীয় অধিনায়ক—শ্রী বরদাকান্ত কুইতি

সুতাহাটা ঃ প্রথম অধিনায়ক—ডাঃ জনার্দন হাজরা
দ্বিতীয় অধিনায়ক—শ্রী রাসবিহারী জানা (ছোট)
তৃতীয় অধিনায়ক—শ্রী দেবেন্দ্রনাথ কর

নন্দীগ্রাম ঃ শ্রী কুঞ্জবিহারী ভক্তা

তমলুক ঃ প্রথম অধিনায়ক— শ্রী গুণধর ভৌমিক
দ্বিতীয় অধিনায়ক—ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র বসু
তৃতীয় অধিনায়ক—শ্রী অমূল্যচরণ মাইতি

৪

বিদ্যুৎ বাহিনী ও ভগিনী সেনার সর্বাধিনায়ক

(C-in-C) এবং অধিনায়ক (G. O. C.) গণ

সর্বাধিনায়ক—শ্রী সুশীল কুমার ধাড়া
মহিষাদল থানার জি. ও. সি.—শ্রী গোপীনন্দন গোস্বামী
সুতাহাটা থানার জি. ও. সি.—শ্রী বিধুভূষণ কুইতি
নন্দীগ্রাম থানার জি. ও. সি.—শ্রী ব্রজভূষণ ভক্ত
তমলুক থানার জি. ও. সি.—শ্রী নরেন্দ্রনাথ জানা

১ম পর্ব

১

স্বদেশ-সাধক সুশীল কুমার

কেশব চৌধুরী

বিরল প্রজাতির হলেও, দেখা যায় না এমন নয়, এমন এক জাতের মানুষের সন্ধান মেলে যাঁরা আমাদের মধ্যে থেকেও অনন্য হয়ে ওঠেন। এঁরা সবার আগে জেগে ওঠেন, চলতে থাকেন, অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত থামেন না। স্থির পদক্ষেপে জীবন-মৃত্যু হেলায় তুচ্ছ করে তাঁরা একের পর এক চৌকাঠ পেরিয়ে মহাজীবনের অভিসারী হয়ে ওঠেন। টুর্গেনিভের 'দি থ্রেসহোল্ড' নাটকে এমন এক বালিকার বর্ণনা আছে যে চৌকাঠ পেরোতে চায়, ঘর তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। ভয়-ডর বলতে কিছু নেই মেয়েটার। যখন চৌকাঠ পেরোতে যাচ্ছে, দূর থেকে নেপথ্য কণ্ঠ ভেসে এল ঃ ভয় করছে না তোমার? চেনা ঘর ছেড়ে চৌকাঠ পেরিয়ে অজানার সন্ধানে বেরোতে?

ভয়? কীসের ভয়? আমি কা'কে বলে ভয় জানিনে।

আবার ভেসে এল নেপথ্য কণ্ঠ ঃ বেশ কথা। কিন্তু নিন্দার ভয় কি কর না? চৌকাঠ পেরোলেই অনেকে তোমার নিন্দায় সরব হবে? তবু চৌকাঠ পেরোবে তুমি?

তবু। নিন্দায় আমি ভয় পাইনে।

তোমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেউ পাশে এসে দাঁড়াবে না।

না দাঁড়াল। আমি একাই পথ চলব।

নেপথ্য কণ্ঠের সুর চড়া হল ঃ তোমার বাবা-মা পর্যন্ত তোমাকে সমালোচনা করবেন। তবু তুমি চৌকাঠ পেরোতে চাইবে, বোকা মেয়ে?

তবু চাইব। বালিকার কণ্ঠে চাঞ্চল্য একেবারে অনুপস্থিত। নেপথ্য কণ্ঠ নির্বাক রইল কিছুক্ষণ। তারপর গম্ভীর সুরে বালিকাকে সাবধান করে দিতে বলল, পরিণত বয়সে তুমি-ই একদিন ভাববে বালিকা বয়সে আমি কী বোকা ছিলুম, শত্রু-মিত্রের কথা না শুনে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজের কৈশোর-যৌবনকে বিড়ম্বিত করেছি! তখন?

তখন আবার কী? ভবিষ্যতে কি হবে, না হবে ভেবে আমি এখনকার কাজ ছেড়ে দেব না। আমি চৌকাঠ পেরোব-ই।

নেপথ্য কণ্ঠে এবার স্পষ্টত ক্রোধান্ধ বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল, মূর্খ তুমি। শেষ বয়সে তুমি বুঝবে তোমার চৌকাঠ পেরোবার সংকল্প ভুল ছিল। তখন আর চৌকাঠের এদিকে ফেরার পথ তোমার জন্য খোলা থাকবে না। বল তুমি এবার পেরোবে চৌকাঠ? মূর্খ কোথাকার!

যা খুসী বল, আমি চৌকাঠ পেরোব-ই।

নৈঃশব্দ নেমে এল। দুয়ার খুলে গেল। চৌকাঠ পেরোতে বালিকা উদ্যত হলে নেপথ্য কণ্ঠ ধ্বনিত হল ঃ প্রবেশ কর। স্বাগত তুমি, হে বালিকা।

১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনে সাতারা, বালিয়া, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলে এই বালিকার আত্মার আত্মীয় সহোদরেরা মৃত্যুর আশঙ্কাকে বিবাহ-রাত্রির মালিকার মত কণ্ঠে ধারণ করে মহাজীবনের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন। অভ্যস্ত জীবনের চৌকাঠ তাঁরা অকুতোভয়ে অতিক্রম করেছিলেন। প্যারী কমিউনের বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কস বলেছেন, তাঁরা স্বর্গে গিয়ে ঝড় তুলেছিলেন। এমনই তাঁদের সাহস ও শক্তি।

সতীশ সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, সুশীল ধাড়া প্রমুখ মুক্তি সংগ্রামীরা নিজেদের জীবন, যৌবন, ধন, মান বন্ধক রেখে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়েছিলেন। জীবনের মূল্যে রাজনীতি প্রগাঢ় অর্থাবহ রাজনীতি—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথায় serious politics। বিয়াল্লিশের ঐ যোদ্ধারা প্রবল আদর্শগত আবেগে টুগে নিভের বালিকার মত পরবর্তীকালের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা না ভেবে দৃপ্ত তেজে অগ্রসর হয়েছেন, চৌকাঠ পেরিয়েছেন, বাধার বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করেছেন।

জীবন প্রবাহের উৎস সন্ধানে

এবার সুশীলবাবুর কথায় আসি। তাঁর জীবন-প্রবাহের উৎস, নির্দ্বিধায় বলা যায়, নিহিত ছিল জ্বলন্ত দেশপ্রেমের মুক্তাঙ্গণে। ঐ অংগণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল একটি বিগ্রহ—দেশমাতৃকার স্বরূপে। বাঙালী দেবদেবী উপাসক হলেও তার উপাসনার তন্ময়তা লক্ষ্য করা যায় দেবীবন্দনায় ভক্তির একাগ্রতায়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সে পিতার সংগে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সম্পর্ক রাখতে অভ্যস্ত, আর মাতার সংগে প্রাণের নিবিড়, মধুর সম্পর্ক। শশীভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন যে, গোষ্পদের মধ্যে স্থির বৃষ্টিজলে প্রতিবিম্বিত মহাকাশের ক্ষুদ্রায়তন রূপের মত পিতা-মাতার

সম্পর্কের মধ্যে সে হরপার্বতীর যুগল রূপ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু বাঙালী জীবনে হরের তুলনায় পার্বতী প্রাধান্য পায়, কৃষ্ণের তুলনায় রাধা, নারায়ণের তুলনায় লক্ষ্মী। বাঙালীর সমষ্টিগত চৈতন্যে (collective consciousness) ধর্মীয়-সামাজিক প্রেরণায় মাতার রূপটি ভক্তি-ভালবাসার বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিহাসের সুরে বলা যায়, গার্হস্থ্য জীবনে পিতার তুলনায় বাঙালী মাতা ঠাকুরাণী সন্তান-সন্ততির প্রণাম লাভ করেন অনেক বেশী। অনুরাগ ও ভক্তি-বণ্টনের ক্ষেত্রে সুশীলবাবু মাতার প্রতি বাঙালী সুলভ পক্ষপাত প্রদর্শন করে নৈতিক অকর্তব্য করেছেন বলা যায় না।

সুশীলবাবু তাঁর বিপ্লবী জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা 'প্রবাহ' উৎসর্গ করেছেন তাঁর 'ক্ষুদ্র জীবনপ্রবাহের উৎস' মাতৃদেবীর শ্রীচরণ উদ্দেশে ভক্তি-অর্ঘ হিসেবে। মা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ 'আমার মা খুব শান্ত ও নরম প্রকৃতির ছিলেন—তবে তাঁর নির্ভীক ভাব দেখেছি। বাবা কিন্তু খুব ভীতু প্রকৃতির ছিলেন।' পিতার স্মৃতি তিনি বহন করেছেন জীবনপ্রবাহের বাঁকে বাঁকে বৃক্ষের নিঃশব্দ ছায়া সঞ্চারের স্মৃতি বিজড়িত অনুভূতির লঘুভার রত্নরাজির মত। তা সত্বেও তাঁর রচনায় 'পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ' হয়ে ওঠেন নি, দোষ-গুণে ভরা মানুষ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। 'মুনসেফ কোর্টের পেসকার হিসাবে তাঁর কাঁচা পয়সার আয় ছিল বেশ ভাল।..........কেন জানিনা, আমার মনে ঐরূপ টাকার প্রতি বিতৃষ্ণা হয়েছিল এবং তা ক্রমশঃ বাড়ছিলই। তবু বাবাকে সেজন্য কিছু বলা বা ঐ বিষয়ে কিছু করার প্রবণতা তখন আমার মধ্যে গড়ে ওঠেনি। বাবা ভাই-বোন আমাদেরকে যতটা সুখ দেওয়ার চেষ্টা করতেন আহারে, পোষাকে, শিক্ষায় তা আমি সানন্দে ভোগ করতাম।'

স্পষ্টতই সুশীলবাবুর পিতা সম্পর্কিত মূল্যায়ন আবেগপ্রবণ নয়, বিশ্লেষণ-মূলক। আত্মসমালোচনায় নিজের কিশোর জীবনের দুর্বলতাকে বিদ্ধ করতে তিনি দ্বিধাহীন। কিন্তু উদার মাতৃবন্দনায় কোথাও তিনি কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নি। সম্ভ্রান্ত ধনী গিরি পরিবার থেকে আগতা শোভাবতী দেবীকে নিয়ে কাকীমাদের পরিহাসের সূত্রে তিনি মাকে রূপসী জেনেছেন এবং ঘটনা পরম্পরায় তাঁকে নানাবিধ মানসিক উৎকর্ষের আধার ভেবেছেন।

মানসপটে অঙ্কিত জন্মদাত্রীর রূপকল্পটি সুশীলবাবুর দেশমাতৃকা মানসাংকনে ছায়াপাত ঘটিয়েছে। মাতার স্বরূপে দেশমাতৃকাকে চিত্রিত করার শিক্ষা তিনি অবচেতন মনে গ্রহণ করেছিলেন সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে।

সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ার সময় তিনি এক দাদার ইচ্ছানুসারে 'আনন্দমঠ' পাঠ করেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে তিনি দেশমাতৃকাকে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, তাঁর 'জীবনপ্রবাহের অনুকূলে বাঁধা' ঐ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ। কিছুকাল পরে তিনি পাঠ করেন 'দেবী চৌধুরাণী'। ঐ উপন্যাসের 'ঐতিহাসিক ও রাজকীয় উচ্চগ্রাম' তাঁকে সম্মোহনী আকর্ষণে আবিষ্ট করে।

মাতৃমূর্তিতে স্বদেশের রূপকল্পনা সুশীলবাবু বঙ্কিমের উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত ও বাংলার মিশ্রণে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'বন্দেমাতরম' কবিতাটি প্রথম রচনা করেন। আনন্দমঠ উপন্যাসে স্থান লাভ করার পর তা ক্রমে ক্রমে জাতীয় মানসে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি হিসাবে মুক্তিসংগ্রামে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকে (১৯০৫—১৯০৮)। ক্রমে ক্রমে এই রণধ্বনি মুক্তি সংগ্রামীদের কাছে একটি মন্ত্র বা একটি প্রতিজ্ঞার দ্যোতক হয়ে উঠতে থাকে। সুশীলবাবু এই ধ্বনির ব্যবহার প্রথম শোনেন যখন তাঁর বয়স দশ বছরের কাছাকাছি। তিনি লিখেছেন ঃ

'মনে আছে, তমলুক শহরে একদিন সন্ধ্যায় একটি মিছিল শহর পরিক্রমার সময় আমাদের বাসার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় শুনেছিলাম 'বন্দেমাতরম্' ও কয়েকটি জয়ধ্বনি—কি কি তা মনে নেই। আমাদের ছাদ থেকে মায়েরা খই ছড়ালেন—আমরা ভাই-বোনরাও।'

সন্ধ্যারাগে বালক সুশীল কুমারের মনে স্বদেশ বন্দনা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্য দিয়ে উচ্চকিত হয়ে উঠল, হৃদয়তন্ত্রী হিল্লোলিত হল। জননীর রূপমাধুরী দেশমাতৃকার অপরূপ বিমূর্ত রূপলাবণ্যের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। বিপ্লবী কোন অনুভূতি তাঁর রক্তে তখন তুফান তুলেছিল মনে হয় না। না তোলারই কথা তখন তিনি নিতান্তই বালক বলে। তাছাড়া, 'বন্দেমাতরম্' কবিতা বা সঙ্গীতে 'লা মার্সাই'-র প্রচন্ড গতিময়তা ও বজ্রনির্ঘোষ অনুপস্থিত; এখানে স্বর্গীয় মহিমায় বিরাজিত দেশমাতৃকার বন্দনা প্রাধান্য লাভ করেছে। শ্বেতবর্ণের খইয়ের ছড়াছড়ি, বন্দেমাতরম্-এর সুললিত ঝঙ্কার, আর দেশমাতৃকার 'সুজলাং, সুফলাং, শস্যশ্যামলাং' রূপকল্প বালক সুশীল কুমারকে মাতৃমন্ত্রে সম্মোহিত করেছিল। ঐ সম্মোহন তিনি উপভোগ করেছেন সারা জীবন। সংসার জীবন যাপনের আকর্ষণ ঐ সম্মোহনের কাছে পরাভূত হয়েছে।

দেশমাতৃকার কাল্পনিক বিগ্রহটি প্রচলিত হিন্দু ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসাবে বিবেচ্য নয়। কেননা বন্দেমাতরম্ রচিত হয়েছিল কোৎ অনুসারী জীবনদর্শন ও যুক্তিবাদী তত্ত্বের ছত্রছায়ায় ধর্মনিরপেক্ষ, দেবদেবী-বিবর্জিত প্রশস্তিসূচক একটি স্তোত্র হিসাবে। সুষমামণ্ডিত এই স্তোত্র স্বদেশভূমিকে মাতৃত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছে।

সাহিত্যে সুশীলকুমারের অনুরাগ ছিল। তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন, মহাপুরুষদের জীবনী ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়তে উৎসাহ বোধ করতেন, বৈষ্ণব পদাবলীর সুললিত ঝংকারে আনন্দলাভ করতেন এবং স্বনামধন্য অধ্যাপকের কণ্ঠে সেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি শুনে বিমোহিত হতেন। তাঁর রাজনীতিক জীবনের প্রবাহ গতিবেগ লাভ করার পূর্বেই সাহিত্যের সোপান বেয়ে দেশমাতৃকার বঙ্কিমী রূপটি তাঁর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই রূপটি নিঃসন্দেহে রোমান্টিক, কাব্যিক। এই রূপটিকে বিবেকানন্দ বাস্তবানুগ করে তোলেন। বঙ্কিম-বর্ণিত কাব্যসুষমামণ্ডিত দেশমাতৃকাকে তিনি বাস্তব গার্হস্থ্য জীবনে দেখা, রক্তমাংসে গড়া সন্তান-জননীতে রূপান্তরিত করেন। তিনি সকল ভারতবাসীকে—ধনী, দরিদ্র, মুচি, মেথর, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে—ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি দেশমাতৃকার প্রতি কর্তব্য পালনের নামে সকল ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী ছিলেন। সেবা ও কর্মের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর বেদনার ভার লাঘব করাকে তিনি দেশমাতৃকার প্রতি অর্ঘ নিবেদনের সমার্থক করে তুলেছিলেন।

বিবেকানন্দ-কল্পিত, কোটি কোটি সন্তানের জননী ভারতমাতা সুশীল কুমারের রাজনীতিক মুক্তিসাধনার প্রেরণাদাত্রী। বঙ্কিমী কাব্যিক দেশমাতৃকার তুলনায় বহু দুঃস্থ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মূর্খ সন্তানের জননী ভারতমাতার প্রতি তিনি অধিকতর অনুরক্ত ছিলেন। এর পশ্চাতে দু'টি কারণ ছিল বলে আমার মনে হয়। প্রথমতঃ, বিবেকানন্দের শিবজ্ঞানে জীবসেবার জীবনাদর্শ সুশীল কুমারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 'অনুভূতি-সঞ্জাত মৈত্রীবন্ধন' (instinctive alliance) রচনা করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্মের সঙ্গে কৈশোরের দিনগুলিতেই প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে যায় বলে তিনি বিবেকানন্দের কর্মমুখী জীবনদর্শনে দীক্ষিত হন বলা যায়। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি তমলুক রামকৃষ্ণ আশ্রমের ঘনিষ্ঠ সেবকে পরিণত হন। কলেরা রোগীর সেবা হোক বা মৃতদেহ সৎকার করা হোক,

সেবামূলক যে-কোন কাজে তিনি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পুণ্যনামে অংশ গ্রহণ করতেন। বেশ কয়েক বৎসর তিনি আশ্রমের বহির্বিভাগে কম্পাউন্ডার হিসাবে রোগীদের মধ্যে ঔষধ বিতরণ করেছিলেন।

সুশীলকুমারের জীবনপ্রবাহের উৎসমুখ খুলে যায় বিবেকানন্দের কর্মবাদের (activism) বিপুল উত্তাপে।

প্রবাহের যাত্রাপথ ও ঘূর্ণাবর্ত

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি দশকের মেদিনীপুর জেলা ঢাকা জেলার মত বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্র নাথ বসু, যোগজীবন ঘোষ এবং হেমচন্দ্র কানুনগো প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অগ্নিযুগের জ্বলন্ত দেশপ্রেমের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। কানুনগো নাড়াজোলের রাজার আর্থিক সহায়তায় প্যারিস গিয়ে বোমা তৈরির বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেছিলেন। ১৯০৪ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে মাদাম কামা স্বাধীন ভারতের সম্ভাব্য যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তার পরিকল্পনায় তাঁর অবদান ছিল। চারণ-কবিদের 'হাসি হাসি পরব ফাঁসি / দেখবে জগৎবাসী' গানের বন্দিত কিশোর নায়ক, বাংলার 'প্রথম শহীদ' ক্ষুদিরামের গৌরবগাথা মেদিনীপুরের সীমানা ছাড়িয়ে সারা বাংলায় অভয়মন্ত্রের প্রচার ঘটিয়েছিল।

১৯২৮ সালে মেদিনীপুর কলেজে পাঠরত অবস্থায় বিপ্লবী সংগঠন বি. ভি.-র একটি শাখা প্রতিষ্ঠায় দীনেশ গুপ্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার তিনজন জেলা শাসক—পেডি, ডগলাস ও বার্জ—সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হন। যতিজীবন ঘোষ, বিমল দাশগুপ্ত, প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, প্রভাংশু পাল, মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত, অনাথবন্ধু পাঁজা, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, নির্মল জীবন ঘোষ, কামাখ্যা ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায়, সনাতন রায়, সুকুমার সেন এবং নন্দদুলাল সিংহের নাম ও দুরন্ত কার্যকলাপ ত্রিশের দশকে গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

সুশীলবাবু সন্ত্রাসবাদের রাজনীতিক মতাদর্শে আকর্ষিত না হয়ে গান্ধীবাদে দীক্ষিত হন। মেদিনীপুরবাসী যুবক হিসাবে তাঁর পক্ষে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী হওয়া অনিবার্য না হলেও স্বাভাবিক ছিল। তাছাড়া, 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি যে-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাতে এ রকম প্রশ্ন উঠতেই পারে তিনি

গান্ধীবাদের পরিবর্তে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদে (revolutionary terrorism) কেন দীক্ষিত হন নি।

আমার মতে এ রকম প্রশ্ন উত্থাপনের অর্থ দাঁড়ায় যে, গান্ধীবাদে সুশীলবাবুর প্রত্যয় যথেষ্ট দৃঢ় ছিল না। বোমার রাজনীতিতে (cult of the bomb) সুশীলবাবুর কোনদিনই আস্থা ছিল না। কারাবাস জীবনে বহু সন্ত্রাসবাদী, কিংবদন্তীর নেতা ও কর্মীর সংগে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছে। তাঁদের অনেককে তিনি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করেছেন, আবার অনেকের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। কিন্তু কখনো গান্ধীবাদে তাঁর আস্থা হ্রাস পায়নি। '৪২-এর সংগ্রামে সশস্ত্র কার্যক্রম রূপায়ণের আগেও তিনি কোলকাতা গিয়ে গান্ধীবাদী জীবনদর্শনের প্রবক্তা বিজয় ভট্টাচার্যের অভিমত গ্রহণ করেছিলেন। কাকাসাহেব কালেলকরের হিন্দী রচনা পাঠ করে তাঁর প্রতীতি জন্মে যে, ১৯৪২-এর অগ্নিগর্ভ মেদিনীপুর তথা ভারতে গান্ধীবাদী কার্যক্রম বলে বিবেচিত না হলেও গান্ধীর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' রণধ্বনির সঙ্গে সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কার্যকলাপের বিরোধ খুব বেশী প্রকট নয়।

একথা অবশ্য ঠিক সংগ্রামী সুশীলকুমার গান্ধীবাদের তাত্ত্বিক হিসাবে কখনো প্রতিষ্ঠা লাভে আগ্রহ দেখান নি। ঋষিতুল্য সতীশ সামন্ত এবং অজয় মুখোপাধ্যায়, কুমার জানা ও রজনীকান্ত প্রামাণিকের আদেশ, প্রভাবে সুশীল কুমার রাজনীতিক জীবনে অনেক পথ অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু, শুধু শোনা কথায় তিনি গান্ধীবাদ গ্রহণ করেন নি। '৪২-এর মরণপণ সংগ্রামের পূর্ববর্তী দু' বৎসর তো গান্ধীবাদ সম্পর্কে প্রচুর পড়াশুনো করেছেন।

সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে সুশীলবাবু যান নি বোধহয় আরও একটি গভীরতর কারণে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বেই বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ভাটার টান শুরু হয়ে যায়। প্রথম বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনটি রাজনীতিক সংগ্রাম কৌশলই পরীক্ষিত হয়ে যায়। নরমপন্থী আবেদন-নিবেদন-প্রতিবাদের (Petition-Prayer-Protest যা Policy of Three Ps আখ্যা লাভ করেছে) রাজনীতি দেউলিয়া প্রমাণিত হয়। বঙ্গভঙ্গ রূপায়ণ ঐ রাজনীতিতে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় নি। চরমপন্থী কংগ্রেসীদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অস্ত্রও অকার্যকর প্রমাণিত হয়। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ দেশবাসীকে সচকিত করে শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী দমন-পীড়নে পরাভূত হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিধিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতিতে বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী দশকটিকে সংগ্রামী

পদ্ধতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বন্ধ্যা বলা যায়। নরমপন্থা, দক্ষিণপন্থী চরমপন্থা ও বামপন্থী চরমপন্থা বা বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ অভীষ্ট সাধনে ব্যর্থ হয়ে স্থবিরত্ব লাভ করে। ক্ষুদিরাম ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অকল্পনীয় সাহসিকতা ও বীর্যবত্তা বাঙালী তথা ভারতবাসীর কাছে বেদনাবিধুর স্মৃতির শুকতারার মত জ্বলজ্বল করতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় মুক্তিসংগ্রাম ক্লান্তপক্ষ বিহঙ্গের নভোমণ্ডলে পক্ষ বিস্তারের স্বপ্নের মত আগামী দিনের শুভ লগ্নের প্রহর গুণতে থাকে।

ঐ শুভ লগ্নের সূচনা হয় ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর আবির্ভাব থেকে। তাঁর উদ্ভাবিত সত্যাগ্রহের পদ্ধতি অবলম্বনে রাজনীতিক অসহযোগ সৃষ্টির কৌশল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রে নূতন আশার সঞ্চার করে। নরমপন্থী রাজনীতির শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ছকটি গান্ধী বর্জন করেন নি। আবার, জঙ্গী বা চরমপন্থীদের প্রতিরোধের (resistance) রাজনীতি গ্রহণ করেছিলেন। ন্যায্য দাবী আদায় করার সত্যনিষ্ঠ, কার্যকরী অস্ত্র হিসাবে। সন্ত্রাসবাদীদের মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনাদর্শ তিনি গ্রহণ করেছিলেন অহিংসার নীতিতে অবিচল থেকে সত্য প্রতিষ্ঠার দুর্নিবার তাগিদে। 'I shall do or die'. তিনি বোমা হাতে সশস্ত্র শত্রুর মোকাবিলা করার চেয়ে নিরস্ত্র থেকে সশস্ত্র শত্রুকে জয় করার কাজটিকে অধিকতর দুঃসাহসী মনে করতেন। অবশ্য তিনি একথা বলতেন যে, কাপুরুষতার চেয়ে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠতম মৃত্যুঞ্জয়ী বীর তিনি যিনি অহিংসার নীতিতে অবিচল থেকে সশস্ত্র শত্রুকে সত্যের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে সক্ষম হন।

বলা বাহুল্য, গান্ধীর সত্যাগ্রহ পদ্ধতি নরমপন্থা, চরমপন্থা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির পন্থা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেও কোন পন্থারই কার্যকারিতার অভিনন্দনযোগ্য শিক্ষাকে বাতিল করেনি। ত্রিধারার সঙ্গম ঘটেছিল অহিংস সত্যাগ্রহের রাজনীতিক দর্শনে। শুধুমাত্র নরমপন্থায় গান্ধীর আস্থা ছিলনা, কেননা আবেদন-নিবেদন-প্রতিবাদের রাজনীতি ব্যর্থ হলে শূন্যগভ ভিক্ষার ঝুলি আন্দোলনকারীর একমাত্র সম্বল হয়ে দাঁড়ায়। আর, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance) ও সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপকে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় পুলিশ-মিলিটারির দমন-পীড়নে। তাই গান্ধী কার্যকরী ও অমোঘ অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন অহিংস সত্যাগ্রহের নীতিকে। নরমপন্থীদের তুলনায় গান্ধী অধিকতর নরমপন্থী চরমপন্থীদের তুলনায় অধিকতর অনমনীয় এবং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের তুলনায় অধিকতর সাহসী ছিলেন।

গান্ধীর রাজনীতি মেদিনীপুরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গভীর পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হয়। তৃণমূল থেকে শুরু করে উচ্চতম স্তরের ভারতীয় জনগণের কাছে ঐ রাজনীতি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক একটি বিষয়সূচী (agenda) উপস্থাপিত হয়। ঐ বিষয়সূচীতে উপস্থাপিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপরেখাটি শ্রেণী, বর্ণ, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের সক্রিয় সহযোগিতার পথ সুগম করে। বিনা দ্বিধায় আজ স্বীকার করা যায় যে, বহু শ্রেণী-ভিত্তিক (multi-class) গান্ধী-নির্দেশিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে নির্ভুল প্রতিপন্ন হয়। তাছাড়া, গান্ধীর গ্রামীণ বাগ্ধারা (rural idioms), সনাতন ঐতিহ্য অনুসারী আধুনিকীকরণের উদ্যম, সমাজ উন্নয়নের কর্মসূচী ইত্যাদি গান্ধী-প্রবর্তিত রাজনীতিকে একটি গণভিত্তির উপর সংস্থাপিত করে।

তরুণ মুক্তিযোদ্ধা সুশীলকুমার আইন অমান্য আন্দোলনের সময় থেকে গান্ধীবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। সন্ত্রাসবাদের সম্মোহনের তুলনায় গান্ধীবাদের বিপ্লবী তাৎপর্য তাঁকে অধিকতর আকর্ষিত করেছিল।

মেদিনীপুরের '৪২-এর বিদ্রোহকে হাচিনুস আখ্যা দিয়েছেন 'স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব'। এরূপ অভিমতে ব্রিটিশ আমলাদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রিপোর্ট, সাক্ষ্য ইত্যাদির স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মেদিনীপুরের ভারত ছাড় জঙ্গী আন্দোলন যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! টুলিপরা চোখের দেখা এই বজ্রপাতের স্বরূপ উপলব্ধি একমাত্র ঘনকৃষ্ণ মেঘের বিপুল সমাবেশের প্রেক্ষিতেই সম্ভব। অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর বৃহৎ গণজমায়েত প্রত্যক্ষ করে। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়ন মেদিনীপুরের বাসিন্দাদের জঙ্গী মনোভাবাপন্ন করে তোলে। তাঁরা অগ্নিঝরা পথে বিদ্রোহের দীক্ষা পায়। 'They had baptism of fire.'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সরকারী বহুবিধ আইন মেদিনীপুরের জনজীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। মুদ্রণের উপর নিষেধাজ্ঞা, মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য, যানবাহন ও নৌকা ব্যবহারে বাধানিষেধ, যুদ্ধপ্রয়াসে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে বণ্ড ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা অক্টোপাসের মত জনজীবনকে দুর্বিসহ ফাঁসে জড়িয়ে ধরে।

গান্ধীর ব্যক্তিগত সচিব প্যারেলাল মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মানুষজনের মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন, দৃপ্ত মনোভাব ও অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রামী মনোভাব

প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক বরুণ দে মাহিষ্যদের সম্প্রদায়গত সংহতির উপর আলোকসম্পাত করেছেন। অসহযোগ আন্দোলন ও ইউনিয়ন বোর্ড আরোপিত ট্যাক্স-বিরোধী আন্দোলন উক্ত সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক মানুষকে সংগ্রামী ঐক্যে যূথবদ্ধ করেছিল। ঐ আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল নিজে মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

১৯৩১ সালের একটি সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, মেদিনীপুর জেলার গ্রামীণ অঞ্চলে ঐ সময় থেকে সরকারী প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি কংগ্রেসী ক্রিয়াকলাপের ফলে সমান্তরাল প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্ভব ঘটেছিল।

জাতীয় স্তরের নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের শুরুতেই কারাবদ্ধ হলে মেদিনীপুরে '৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনের পরিচালনা আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের করায়ত্ত হয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে, "**In the initial stage of the movement each action involved thousands of peasants engaged in collective violence against targets that symbolized the power of an oppressive colonial state.**" ক্রমে ক্রমে জনরোষ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লড়াইতে পরিণত হয়ে যায়। '৪২-এর আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব যেমন ছিলনা, তেমনই পরিকল্পিত বিদ্রোহও ছিল না। পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলিতে অর্জিত অভিজ্ঞতা, সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ ও দমন-পীড়নের তিক্ত অভিজ্ঞতা, কৃষকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী সরকারী নীতি এবং সমকালীন কংগ্রেসী ও বৈপ্লবিক গণসংগঠনগুলির ভূমিকা সশস্ত্র বিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিল।

সুশীলবাবুদের এরূপ বিশ্বাস জন্মে ছিল যে, সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে সমুদ্র পথে কাঁথির উপকূলে অবতরণ করবেন। তাই একটি মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করে সুভাষচন্দ্রের 'দিল্লী চল' সার্থক করার তাগিদ তাঁরা অনুভব করেছিলেন।

সাগর সঙ্গমে প্রবাহ

১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহের স্বেচ্ছাসেবকরূপে উনিশ বৎসর বয়সে সুশীল কুমারের রাজনীতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তমলুক রাজবাটির লবণ সত্যাগ্রহ শিবিরের উপাচার্য পদে বৃত হন এবং ঐ বৎসরেই আচার্য সতীশ সামন্ত কারারুদ্ধ হলে তিনি আচার্য পদ লাভ করেন। সাংগঠনিক কার্যে তিনি তখন থেকে দক্ষ

প্রশাসকের ভূমিকা পালন করতে পারদর্শিতা দেখাতে শুরু করেন। একদিন পুলিশ শিবির ঘেরাও করে ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে সুশীল কুমারকে বন্দী করে। তারপর থেকে কারাগার জীবন তাঁকে বহুবার যাপন করতে হয়। কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করলে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজকর্মের দায়-দায়িত্ব পালন করতেন। কারাজীবনের নানা কাহিনী বিচিত্র স্বাদে পরিবেশিত হয়েছে তাঁর লেখা 'প্রবাহ'-তে।

১৯৪২ সালে ৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হয় বোম্বে শহরে। মেদিনীপুরে এই আন্দোলনের সূচনা কিছুটা বিলম্বিত হয় প্রস্তুতি পর্বের কাজ সংগঠিত করার প্রয়োজনে। সুশীলবাবুর দক্ষ প্রশাসনিক নেতৃত্বে সুন্দরা কংগ্রেস শিবির বাস্তবায়িত হয় ২৬শে সেপ্টেম্বর। এই সময়ে তিনি বিদ্যুৎবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর তিনি মহিষাদল থানা দখল অভিযানে নেতৃত্ব দান করেন। ১৯শে অক্টোবর ভগিনী সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭ই ডিসেম্বর তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। স্বরাষ্ট্র ও সমর দপ্তর তাঁর নেতৃত্বাধীন হয়।

১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে বিদ্যুৎবাহিনী ও ভগিনী সেনা জাতীয় সরকারের সেনাবাহিনীরূপে স্বীকৃতি লাভ করে এবং প্রধান সেনাপতি পদে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। গরম দল বা action squad গঠিত হলে তিনিই পরিচিত হন ঐ দলের 'বড় সাহেব' হিসাবে।

জাতীয় সরকার গঠন করে কী করতে পেরেছিলেন সুশীলবাবুরা? প্রথমে বলা যায় তাঁদের কর্মজগতের ভৌগোলিক পরিধি সম্পর্কে। জাতীয় সরকারের হুকুম কায়েম হতে পেরেছিল ৬৮৭·২৫ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে নয় লক্ষ মানুষের ক্ষেত্রে। সাড়ে তেরশত গ্রাম, ৭৬টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা ঐ সরকারের অধীনস্থ ছিল। প্রায় ২২ মাস স্বাধীন তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অস্তিত্ব ছিল।

আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী আগষ্ট বিদ্রোহের সময় যে কয়েকটি মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মচঞ্চল ও তাৎপর্যমণ্ডিত ছিল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠনের প্রয়াস। মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার নানা পাতিলের নেতৃত্বাধীন পত্রী সরকার ও উত্তর প্রদেশের বালিয়াতে অনুরূপ ধরণের সরকার কিছুকাল সক্রিয় থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু সতীশ সামন্ত, অজয় মুখার্জী, কুমার জানা ও সুশীল ধাড়ার মত কর্মযোগীরা জনসমর্থনের জোরে বেশ কিছুকাল

জাতীয় সরকারকে জীবন দান করতে পেরেছিলেন। সারা ভারতে আগষ্ট বিদ্রোহ স্তিমিত হলেও ঐ সরকার একটি মুক্তাঞ্চল (liberated zone) রক্ষায় সক্ষম হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে গান্ধী কাঁথি ও তমলুক এসে সব কিছু দেখে শুনে বলেন, "ব্রিটিশেরা যা করেছে এখানে আমি হলে কি করতাম জানিনা। তোমরা যা করেছ তা বীরোচিত ও গৌরবময়, তবে তোমরা অহিংসার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলে।"

গান্ধীর বক্তব্যে কোন ভুল ছিল না। কিন্তু গান্ধী জানতেন কিনা জানিনা বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে মুক্তাঞ্চলকে কেন্দ্র করে সারা দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। চীনদেশে মাও জেদঙ ঐ পদ্ধতিতেই বিপ্লব পরিচালনা করে সাফল্য লাভ করেছিলেন। অথচ আমাদের দেশে দমদম-বসিরহাট, তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ, নবশালবাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা মুক্তাঞ্চলের স্বপ্ন সার্থক হতে পারেনি। সুশীলবাবুদের কর্মযজ্ঞ নিঃসন্দেহে বড় মাপের পরীক্ষানিরীক্ষা ছিল। পরীক্ষাটি সফল হয়নি, কিন্তু স্বাধীন ভারতের সম্ভাব্য আবির্ভাবের দিনকে তা ত্বরান্বিত করেছিল।

সুমিত সরকার তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারকে 'petty national government tucked away in a corner of the isolated district of Midnapore' বলেছেন, আর এরূপ মন্তব্যও করেছেন '(it) did not seriously bother Calcutta or upset communications with Arakan and Assam fronts which is no doubt one reason why the Tamluk Jatiya Sarkar could survive till September, 1944.' সুমিতবাবুর মন্তব্যে সত্যের সাযুজ্যতা কতটা জানিনা, তবে এটুকু জানি যে ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ তাম্রলিপ্ত সরকার সম্বন্ধে ভিন্নরূপ অভিমত পোষণ করতেন। সমকালীন বাংলার গভর্নর আর জি কেসি গভর্নর জেনারেল ওয়াভেলকে লিখেছিলেন 'a high proportion of the inhabitants are in sympathy with the local national government....'। ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে লিখেছিলেন, 'I am engaged in meeting by far the most serious rebellion since that of 1857, the gravity and extent we so far concealed from the world for reasons of military security.'

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার পাশবিক অত্যাচার থেকে নারী সমাজকে বাঁচাতে

কৃতিত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেছে। দু' একটি ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হলেও ঐ সরকারের বিচার-ব্যবস্থা ন্যায়পরায়ণ থেকেছে। ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিনগুলিতে জাতীয় সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও সম্পদ নিয়ে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছে।

গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে আগস্ট বিদ্রোহের নায়কেরা সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেন। সুশীল কুমারও তাই করেন। যিনি ছিলেন জাতীয় সরকারের সেনাপতি তিনিই গান্ধীর উদ্দেশে কারার অভ্যন্তরে রচনা করেন একটি কবিতা। গান্ধীবাদ দিয়ে শুরু করে গেরিলা যুদ্ধ ও সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক দৃপ্ত বক্তব্যের পথ-পরিক্রমা সেরে শেষ পর্যন্ত গান্ধীবাদী জীবনদর্শনে ফিরে যান।

সুশীলবাবুর জীবনের যে ধারাটি ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার তিনটি থানা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তার গতিপ্রকৃতির বলিষ্ঠতা, বিচিত্রতা ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আজও ফুরায়নি। এই ধারার স্বরূপ নিয়ে লেখালিখি বেশ কিছু হয়েছে, কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে বলা চলে না। সুশীলবাবুর নিজের লেখা 'প্রবাহ', গোপীনন্দন গোস্বামীর 'বাংলার হলদিঘাট তমলুক', প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিকের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর', বঙ্কিম ব্রহ্মচারীর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে সুতাহাটা', হরিপদ মাইতির 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ময়না', চিত্তরঞ্জন দাশের 'মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস', হিতেশরঞ্জন সান্যালের 'দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন' সতুগোপাল ভট্টাচার্যের 'স্বাধীন তমলুক', তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটির 'সর্বাধিনায়ক', বীণা দাসের 'দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল', পুষ্প অধিকারীর 'ক্ষুদিরাম', প্রথমনাথ পালের 'দেশপ্রাণ শাসমল' ইত্যাদি পুস্তক মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত মেদিনীপুরের বীর সন্তান ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য সরবরাহে সক্ষম। সুশীল কুমার ধাড়া অশীতিতম জন্মোৎসব উদযাপন কমিটি প্রকাশিত 'চিরতরুণ বিপ্লবী সুশীল কুমার' সুশীলবাবুর কর্মময় জীবনের নানা ঘটনায় বিধৃত।

সতীশ সামন্তর 'অগাস্ট রেভলিউশন অ্যান্ড টু ইয়ার্স অফ ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট ইন মিডনাপুর', নরেন্দ্রনাথ দাসের 'ফাইট ফর ফ্রীডম ইন মিডনাপুর', বিনয়জীবন ঘোষের 'মার্ডার অফ ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটস', তারাচাঁদ এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'হিসট্রি অফ ফ্রীডম মুভমেন্ট' সম্পর্কিত বইগুলি সর্বভারতীয়

আন্দোলনের সঙ্গে স্থানীয় আন্দোলনগুলির সংযোগ বা linkages বোঝার পক্ষে প্রয়োজনীয়। জাতীয় ও রাজ্য মহাফেজখানায় সংরক্ষিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র (রাজনীতি) দপ্তরগুলির নানাবিধ তথ্য, রিপোর্ট, সুপারিশ ইত্যাদি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক রিপোর্টসমূহ, টটেনহামের 'কংগ্রেস রেসপন্সিবিলিটি ফর ডিসটারবেনসেস (১৯৪২-৪৩), ফ্যামিন এনকোয়্যারি কমিশন রিপোর্ট এবং '৪২ সালের আন্দোলনের সময়কার পত্রপত্রিকাগুলি সরকারী কার্যকলাপ ও জনরোষের বিস্ফোরণ সম্পর্কে সাক্ষ্য, প্রমাণ ইত্যাদির প্রয়োজন মেটায়। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মুখপত্র 'বিপ্লবী' '৪২-এর আন্দোলনের প্রকৃতির উপর আলোকসম্পাত করে। সুবলচন্দ্র মাইতির 'নাইন্টিন ফরটি টু ঃ কুইট ইন্ডিয়া ইন মিডনাপুর—এ কেস স্টাডি' গবেষণামূলক কাজটি তথ্য ও বিশ্লেষণের অনেকটা কাজ সম্পন্ন করেছে।

আজও মেদিনীপুর মুক্তি সংগ্রামী রূপের প্রকৃতি সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যায় না। সুশীলবাবুদের মত উদ্বুদ্ধ দেশসেবকদের নিয়ে লেখা বইপত্র ও নিবন্ধ পক্ষপাত দোষে দুষ্ট বলে আমার মনে হয়। পক্ষপাত জাতীয়তাবাদী ও নয়া জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লিখনে (nationalist and neo-nationalist historiography) যেমন দেখা যায়, তেমন দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস লিখনে (imperialist and neo-imperialist historiography)। তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় অত্যুৎসাহী এসব ইতিহাস লিখন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সংগ্রহের অনীহা প্রকাশ করে। তাই এরূপ ইতিহাস লিখনের ঝুলি থেকে বেরিয়ে এসেছে নানা তত্ত্ব ঃ জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত বিপ্লবের তত্ত্ব, নেতৃবৃন্দের চারিত্রিক গুণের তত্ত্ব, ভদ্রলোক ও নিম্নবর্গের জনতার সমান্তরাল বিদ্রোহী আন্দোলনের (parallel insurrectionary movements) তত্ত্ব। কিন্তু মহাকাব্যে উপেক্ষিতা ঊর্মিলার মত '৪২-এর বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী সাধারণ মানুষের অসাধারণ বীরত্বগাথা সমাদরের অপেক্ষায় আছে আজও। সুশীলবাবু তো এদেরই নেতা ছিলেন, এদেরই সমরকৌশলে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শোষণের চিহ্নগুলি উৎখাত করার আদেশ দিয়েছিলেন। এদের আশা-আকাঙ্খা, সফলতা, ব্যর্থতা, শৌর্য, বীর্য, কাপুরুষতা, অজ্ঞতা, সচেতনা এদের কথাতে মূর্ত না হয়ে উঠলে ইতিহাস লিখন ক্ষমতাবান গোষ্ঠী (elite)-কেন্দ্রিক হয়ে উঠতে বাধ্য। হয়েছেও তাই।

'৪২-এর স্মরণীয় দিনগুলির ঘটনাবলী জাতীয়তাবাদের প্রবল অতিশয্যে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে একদল ঐতিহাসিক ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর দক্ষতা ও মানবিক গুণরাজির অকৃপণ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। আর একদল জাতীয়তাবাদকে একমাত্র ধ্রুব জেনে নিম্নবর্গের জনতাকে (subaltern masses) দূরে রেখে নেতৃবৃন্দের ক্রিয়াকর্মকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে মহান প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সুশীলবাবুদের স্বদেশ-সাধনার সব কাহিনী আজও সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যায় না। ঊর্মিলাকে মরমী কবির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল যুগের পর যুগ। আমার বিশ্বাস, দু' একটি যুগ নয়, আর দু' একটি দশকের মধ্যে সুশীলবাবুদের সাধনা যোগ্য ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণে সমাদৃত হবে।

২

দেশ-গৌরব সুশীল কুমার

সনৎ কুমার নস্কর

১৯২৫ সাল।

তমলুকের হ্যামিল্টন হাইস্কুলের স্কাউট ট্রেনীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। ট্রেনার অমৃতলাল মাইতি Prayer শুরু করার নির্দেশ দিলেন। একতালে সবাই গেয়ে চলছে 'God save the king.' কিন্তু একটি চোদ্দ বছরের কিশোর বালক চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ঠোঁট নড়ছে না তার, নিস্পন্দ নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে রয়েছে পায়ের মাটির দিকে। ব্যাপারটা কি। গানের পর প্যারেড শেষ হতেই হেডমাস্টার শ্রুতিনাথবাবুর অফিসে ডাক পড়ল ছেলেটার।

—কি, ব্যাপার কি? Prayer-এ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?

এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর সেই কিশোর দৃপ্ত ভঙ্গীতে জবাব দিলে, এ গান আমি গাইতে পারবো না।

ভ্রূকুটি করে উঠলেন শ্রুতিনাথ, মানে? কারণটা জানতে পারি কি?

আবার সেই নিস্পন্দ ছেলেটির গম্ভীর কণ্ঠস্বরের জবাব, এ গান দেশমাতৃকার বন্দনা নয়, শাসক ইংরেজদের স্তুতি। এ আমার দ্বারা হবে না।

—বটে! এর ফল কি জানো?

—খুব সম্ভব স্কুল থেকে বহিষ্কার। কিন্তু তা হলেও আমার পক্ষে এ গান গাওয়া অসম্ভব।

গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে আসছে ছেলেটি। স্কুলের যারা জানতো না, তারা তখন ফিস্‌ফিসানি শুরু করেছে। কে, কে রে? এতবড় বুকের পাটা কার? হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে তর্ক করেছে? সাহস বলিহারি। কি যেন বললে নামটা? সুশীল?

হ্যাঁ। সুশীল। সুশীল কুমার ধাড়া। ১৯২৫ সালে তখন তিনি মাত্র ফোর্থ ক্লাসের (বর্তমানের সপ্তম শ্রেণী) ছাত্র। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বহিষ্কৃত হতে হয়নি অবশ্য, কারণ শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী বিবেচক লোক ছিলেন। ক্লাসের সেরা ছাত্রটিকে এই সামান্য কারণে হারালে আখেরে ক্ষতি হবে তাঁরই।

সুশীল কুমারের সেই কিন্তু শুরু। অন্যায় আর অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সারা জীবন একনিষ্ঠ থেকেছেন দেশ সেবায়। অত্যাচারী বর্বর ইংরেজ যে একদিন ভারত ছেড়ে চলে গেল তার পিছনে সুশীল কুমারদের অবদানকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। দমন, পীড়ন, শোষণ, ধর্ষণ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বৃটিশ সরকার যখন অন্যায়ভাবে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে কায়েম করতে চাইছে তাদের রাজত্ব, তখন এদেশের লক্ষ লক্ষ বীর তরুণ বিপ্লবী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন দেশমাতৃকার পায়ে। কোন বন্ধন, কোন প্রলোভন, কোন মিথ্যামোহ তাঁদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। নিজেদের তাজা খুন দিয়ে দেশজননীর শৃঙ্খলিত পায়ে এঁকে দিয়েছেন অলক্তরাগ। কত সংগ্রাম, কত বেদনা, কত প্রাণের বিনিময়ে যে শেষ পর্যন্ত এসেছিল কোটি কোটি ভারতবাসীর চির-আকাঙ্খিত স্বাধীনতা সে সব আজ ইতিহাস। সুশীল কুমার এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মেদিনীপুর জেলার বিশেষ এক পর্বের নায়ক। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যিনি সমস্ত জীবনটা ব্যয় করলেন দেশের সেবায়, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বাধীনতা সংগ্রামে, যশের আকাঙ্খা না করেই যাবতীয় অর্থ ও সামর্থকে অকাতরে ঢেলে দিলেন দেশহিতকর কর্মে সেই অকৃতদার মানুষটিকে আজ কতজনই বা মনে রেখেছেন ? এই বিস্মৃতি—তা স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক—আমাদের কাছে লজ্জাকর। কারণ যাঁদের জন্য আজ আমরা স্বাধীন দেশের বুকে গর্বিত পদক্ষেপে চলার অধিকার পেয়েছি তাঁদের অবদানকে নতমস্তকে স্বীকার না করলে অন্যায় হবে, অধর্ম হবে। দেশ যাঁদের কাছে নানাভাবে ঋণী, যাঁদের জীবনাদর্শ উদ্বুদ্ধ করতে পারে আপামর মানুষকে, তাঁরা পার্থিব সম্পদে দীনহীন হলেও যথার্থই দেশের গৌরব। দেশ-গৌরব সুশীল কুমার অদ্যাবধি জীবিত সংগ্রামীদের মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিত্ব যাঁর কাছ থেকে দেশ এখনও শিক্ষা করতে পারে অনেক কিছু, গড়তে পারে সুন্দর স্বর্ণপ্রসূ ভবিষ্যৎ।

সুশীল কুমারের সেবাব্রত ও সহজ সরল জীবন যাপনের আদর্শ প্রথমেই আকৃষ্ট করতে পারে আমাদের। হ্যামিল্টন হাইস্কুলে পড়ার সময় তিনি সহপাঠীদের কয়েকজনকে নিয়ে তমলুকের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জন্য ঘুরে ঘুরে মুষ্ঠিভিক্ষা সংগ্রহ করে এনে তুলে দিতেন স্বামীজীদের হাতে। বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষটি তখন থেকেই বুঝে ছিলেন, জীবসেবাই শিবসেবা। এটাই পরবর্তীকালে তাঁর মধ্যে স্বদেশ প্রীতির বীজকেও অঙ্কুরিত করে তুলেছিল। তাঁর চেতনায় এই বিশ্বাস গেঁথে গিয়েছিল যে, দেশ শুধু মাটির স্তূপ নয়, সম্মিলিত

জনগণের সমষ্টি। এরই সাথে সাথে তিনি কিশোর বয়স থেকে ত্যাগ, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য, কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

'Plain living and high thinking'-এ সুশীল কুমার আজন্ম বিশ্বাসী। ছাত্রাবস্থায় মশারি না খাঁটিয়ে শুয়ে সামান্য মাত্র আলুসিদ্ধ ভাত খেয়ে নিজের জামা-কাপড় নিজেই কেচে, ইস্ত্রি না করা কাপড় পরে তিনি যে সহজ সরল জীবনযাত্রার প্রতি আসক্তি দেখিয়ে ছিলেন, আজও তা অক্ষুন্ন রয়েছে। ১৯৬৭-তে যখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তখনও ২৬নং বসন্ত বোস রোডের দেড় কামরার ঘরে ফুটপাতের কেনা আয়নায় ডাইনিং-কাম-রাইটিং টেবিলে বসে দাড়ি কামাচ্ছেন। আজকের স্বার্থপর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলে এইসব মানুষদের সঙ্গে আত্মোদর পরায়ণ সুখবিলাসী জীবদের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়বে।

সুশীল কুমারের চরিত্রের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও প্রভাবশালী দিক বোধ হয় তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা। এ দক্ষতা তাঁর সহজাত ছিল। নিমতৌড়ীর সমাজসেবী ভবতোষ দাসের সংস্পর্শে এসে তিনি জাতীয় আন্দোলনের কার্যধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনি, বিপ্লবী ক্ষুদিরামের উপর বই-পত্র পড়ার ফলে বৈপ্লবিক কর্মকান্ড বিষয়ে তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০ সালে সরাসরি যখন রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন সুশীল কুমার, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৯ বছর। গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহের ডাকে সারা তমলুক শহর সে সময় উত্তাল। ১২ই মার্চ ডান্ডি অভিযান সফল হলে ১৯শে মার্চ মেদিনীপুরের এক বিরাট জনসভায় আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ৬ই এপ্রিল লবণ আইন ভাঙা হল হলদী নদীর তীরে নরঘাটে বে-আইনী লবণ প্রস্তুত করে। ৩০টি কেন্দ্রে প্রায় তিন মাস ধরে এই আন্দোলন চলে। সত্যাগ্রহীদের জন্য শিবির তৈরী হয় তমলুক শহরের উপর। এই শিবিরের আচার্য ছিলেন সেকালের বিখ্যাত স্বদেশী সতীশচন্দ্র সামন্ত এবং উপাচার্য নিযুক্ত হলেন উনিশ বছরের তরুণ সুশীল কুমার। আন্দোলন মাত্র ৪ / ৫ দিন এগিয়েছে, সতীশবাবু গ্রেপ্তার হলে পর সমগ্র শিবিরের দায়িত্ব এসে পড়ে সুশীলবাবুর উপর। অসামান্য দক্ষতায় তিনি বয়স্কদেরও সঠিকভাবে পরিচালনা করেছিলেন। এভাবে দেড় মাস চলার পর ৫০ জন সত্যাগ্রহী সহ তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাঁর ৯ মাসের জেল হয়। রাজসাহী জেলে অনুশীলন সমিতির নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। জেল-সুপার ওয়ার্ডের যে দায়িত্ব

দিয়েছিলেন তাও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন তিনি। অবশেষে ১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্তে সমস্ত কারাবন্দী সত্যাগ্রহীদের মুক্তি মিললে সুশীল কুমারও কারাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসেন।

প্রথম পর্বের আন্দোলনে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা প্রমাণিত হওয়ার ফলে স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা ঠিক করলেন মহিষাদল থানার ১নং. ইউনিয়নে কংগ্রেস সংগঠন তৈরী করার ক্ষেত্রে তিনিই হলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। অতএব বরগোদা গ্রামে শিবির স্থাপিত হলে ক্রমশঃ ১২টি ইউনিয়নের দায়িত্বভার এসে চাপে তাঁর কাঁধে। তবে ১৯৩২-এ গান্ধীজির গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে সুশীল কুমার আত্মগোপন করলেন।

আন্দোলনের পুরোভাগে আবার তাঁকে দেখা গেল চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধের ইস্যুতে। তাঁর নেতৃত্বেই মহকুমার মধ্যে মহিষাদলে এই আন্দোলন সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন নেতারা মন্তব্য করেছিলেনঃ 'সুশীল সাহসী, নির্ভীক, দুঃখজয়ী পরিচালনা জানে। ছোট বড় সকলকে নিয়ে কাজ করতে ও করাতে পারে। ভাল ভাষণ দেয়, কাজ আদায়ের কৌশলও জানে।' এ আন্দোলনের সমাপ্তি ১৯৩৩ এর ১২ই জুলাই। কিন্তু স্বার্থান্ধ ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে সুশীল কুমার অপরাধী। অতএব আদালতে উঠতে হল তাঁকে। প্রহসনমূলক বিচারে ১ বৎসর ২ মাসের কারাদণ্ড হল তাঁর। ১৯৩৪-এ জেলে থেকে বেরিয়ে লিপ্ত হলেন ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনে। এবার তাঁর উপর কড়া দৃষ্টি রাখলো সরকার। ৭ দিন গৃহে অন্তরীণ রইলেন তিনি। এরপর সপ্তাহে একদিন করে ১০ মাইল দূরের থানায় হাজিরা দিতে হতো তাঁকে।

সংগ্রামী সুশীল কুমারের তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হয়ে গেল ১৯৩৯-এ। তখন তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। হয়তো বা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে মেধাবী ছাত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কিন্তু যিনি শুনেছেন দেশব্যাপী বিপ্লবের শংখ নিনাদ, নিয়েছেন স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা, তাঁর কাছে পরীক্ষা পাশ আর ডিগ্রী লাভ হয়ে পড়ে নিতান্ত গৌণ। অতএব তমলুকের তৎকালীন কংগ্রেস নেতা অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের আহবানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সংগ্রামে। সুতাহাটা থানার বাসুদেবপুরে বিপ্লবী কুমারচন্দ্র জানার গান্ধী আশ্রমে ৭ দিন ব্যাপী যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহী প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হল তার মধ্যে মহিষাদল থানা থেকে নির্বাচিত চারজনের একজন হয়ে উঠলেন তিনি। অপর তিনজন হলেন—নীলমণি হাজরা, হংসধ্বজ মাইতি ও সতীশচন্দ্র সামন্ত। এই আন্দোলনে

তিনি নিজের হাতে চরকা কেটেছেন, নানা স্থানে ভাষণ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন মেদিনীপুর বাসীদের। কিন্তু সরকার আবার তাঁকে জেলে পুরলো যুদ্ধবিরোধী ভাষণের অভিযোগে। দুটি ধারায় ৬ মাস করে মোট ১ বছর। ১৯৪১-এর প্রথম দিকে ফিরে এলেন জেল থেকে আর প্রস্তুত করলেন নিজেকে অভিনব এক বিপ্লবের জন্য।

১৯৪২-এর আগষ্ট বিপ্লব ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। গান্ধীজীর মতো অহিংসবাদী মানুষও শ্লোগান তুললেন 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—Do or Die।' এই ডাকে সাড়া দিয়ে উত্তাল হয়ে উঠলো বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনগুলি। এ আন্দোলনের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায়। জাপানী আক্রমণ ঠেকানোর জন্য সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো ভারতের ব্রিটিশ সরকার। যুদ্ধের ব্যয়ভার টানতে গিয়ে ভারতবাসীর উপর চাপালো নতুন নতুন করের বোঝা। এই নতুন পরিস্থিতেতে চুপচাপ রইলেন না সুশীল কুমারেরা। ইতিমধ্যে তিনি ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ এবং কুমারচন্দ্র জানার নেতৃত্বে স্বালম্বী গ্রাম গঠনের কাজে নেমেছিলেন। ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হলে জাপানের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনার কথা ভেবে সরকার নদী তীরবর্তী তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সমস্ত জলযান সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এই সুযোগে রাজকর্মচারীদের অত্যাচার চরমে ওঠে। একই সঙ্গে তখন দেখা দিতে শুরু করেছে ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ। অথচ মুনাফালোভীরা চালকল থেকে বাইরে চাল পাচারের ব্যবস্থা চালু করেছে। এর প্রতিবাদে কংগ্রেস কর্মীরা দনিপুরে বিক্ষোভ দেখালে সেখানে আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চলে। প্রতিরোধ শক্তিকে আরো দৃঢ় করার জন্য সুশীল কুমার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলেন। বাসুদেবপুরের গান্ধী আশ্রমে তৈরি হয় মহিলাদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী। বাংলাদেশে এটাই প্রথম সংগ্রামী মহিলা বাহিনী। তমলুক মহকুমায় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন সতীশ সামন্ত, অজয় কুমার ও সুশীল কুমারের মতো নেতারা। এঁদের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারের শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়া। আন্দোলন যখন মাঝপথে তখন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি উকিল মন্মথনাথ দাসের কলকাতার বাড়িতে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সমস্ত বহিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে, ব্রিটিশ ঘাঁটি, থানা, আদালত ও অন্যান্য সরকারী অফিস আক্রমণ করা হবে। দিন ধার্য হল ২৯শে সেপ্টেম্বর। সরকারের প্রতি আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য

সুশীল কুমার এবার নতুন কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠলেন। পূর্বের স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে থেকে গড়ে উঠলো বিদ্যুৎ বাহিনী আর মহিলাদের দলের নির্বাচিত কয়েকজনকে নিয়ে ভগিনীসেনা। ২৮ তারিখ রাত্রে নেতাদের নির্দেশ মতো রাস্তায় বড় বড় গাছ ফেলে, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের খুঁটি উপড়ে তার ছিঁড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হল। এরপর ২৯ তারিখে বিকেল তিনটে নাগাদ চারদিক থেকে চারটি দল মহিষাদল ও তমলুকের থানা আক্রমণ করে। এই অভিযানে মহকুমার প্রথম সারির কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কেবলমাত্র সুশীল কুমার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েছিলেন। বহু শহীদের মৃত্যুর ভিতর দিয়ে এই গণ-অভ্যুত্থান লাভ করেছিল এক স্বাধীন সরকার 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার'। শুধু নামেই নয়, পৃথক ডাকঘর, ব্যাংক, সেনাবাহিনী, আদালত ইত্যাদি সব কিছুই তৈরি করেছিল এই জাতীয় সরকার। এর সর্বাধিনায়ক ছিলেন সতীশ সামন্ত, আর স্বরাষ্ট্র ও সামরিক দপ্তরের দায়িত্ব ছিল সুশীল কুমারের উপর। ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ কর্মচারীরা এ সময়ে ভীষণ নিষ্ঠুর ও বর্বর আচরণ শুরু করে মহিলাদের উপর। অপরাধীদের শাস্তি বিধানের জন্য বিদ্যুৎবাহিনী ও ভগিনী-সেনার মধ্যে থেকে বাছাই করা স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সুশীল কুমার এবার তৈরি করেন গরম দল। এরা লাঠি খেলা, ছোরা চালানো, যুযুৎসু ইত্যাদি শিক্ষা করেছিল। অনেক ঐতিহাসিক বিপ্লবীদের এই সাফল্যকে তেমন মূল্য না দিলেও, সেকালের নথিপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে প্রশাসক ইংরেজের কাছে এ সরকারে অভ্যুত্থান মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল। সরকারের স্থায়িত্বকাল মাত্র ২১ মাস। গান্ধীজী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে সবাই একে একে আত্মসমর্পণ করেন। বিচারে এবারেও সুশীল কুমারকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় ৩ বৎসর ২ মাস।

অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট অনেক রক্ত আর প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হল স্বাধীনতা। স্বাধীন ভারতে সংগ্রামী বীরদের ভূমিকাও গেল পাল্টে। এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে দেশকে নতুন করে গঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুশীল কুমার। শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে একটি সভায় জনগণের আশীর্বাদ চেয়েছিলেন এই বলেঃ "হে গণদেবতা, আশীর্বাদ করুন আমার উৎসর্গীকৃত এই জীবন যেন স্বাধীন ভারত গড়ার কাজে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হতে পারে। আশীর্বাদ করুন যেন কোন লোভ, কোন মোহ, কোন দুর্বলতা আমাকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে।" বক্তৃতায় যা অঙ্গীকার করলেন কাজে তা

সফল করে তুললেন অসংখ্য বাধা সত্ত্বেও। আমরা সেইসব সমাজসেবামূলক কাজের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে উপস্থাপিত করতে পারি।

১। ১৯৪৭ সালে তাজপুরে খাদি কেন্দ্র স্থাপন। খাদি বিভাগের উদ্যোগে গোটা মহিষাদল থানায় প্রায় ১০০০ চরকা চলতো। এতে ধুতি, শাড়ি, জামা, গামছা, চাদর ইত্যাদি তৈরি হত।

২। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে বাগদা গ্রামের পশ্চিম সীমানায় মাতৃভবন স্থাপন। গ্রামাঞ্চলের দুঃস্থ মহিলাদের জন্য আউটডোর খোলা হয়েছিল। তাছাড়া ছিল শিশু আশ্রয় কেন্দ্র, নার্স ট্রেনিং সেন্টার, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ এবং ১০ শয্যা বিশিষ্ট প্রসূতি সদন। এই আশ্রমটির চারপাশে গাছ লাগিয়ে উদ্যানও বানানো হয়েছিল।

৩। ১৯৪৮-এ তাজপুর গ্রামে 'মহিষাদল থানা গ্রাম উদ্যোগ সমিতি' স্থাপন। এর কাজ ছিল ঘানিতে তেল প্রস্তুত, সাবান, কাগজ, মাটির দ্রব্যাদি তৈরি এবং গরু ও মুরগী পালন। এ গুলির মধ্যে 'স্বাধীন ভারত' সাবান ও ঘানির তৈরি ভোজ্য তেল বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

৪। ১৯৫৭ সালে 'স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ স্মৃতি রক্ষা কমিটি' গঠন। সুশীল কুমার-এর সম্পাদক ছিলেন। এই সমিতির অধীনে টাউন লাইব্রেরী, ব্যায়ামাগার, হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, চিত্রাঙ্কন ও আবৃত্তি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে।

ছিল তাঁর আন্তরিক উচ্চারণ। এই ব্রতকে আজও পালন করে চলেছেন যথাসাধ্য। বালক বয়সে সুযোগ পেয়েও চুরি করা তাঁর স্বভাব ছিল না, পছন্দ করতেন না তোষামোদ ও ঘুষ দেওয়াকে। বৃত্তি পেলে অত্যাচারী সরকারের টাকা নিতে হবে বলে বৃত্তি পরীক্ষায় বসেন নি তিনি কোনদিন। স্বাধীন ভারতে R. T. A. বাসের পারমিটের ব্যাপারে তিনি দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৫৭-তে জেলা কংগ্রেসের ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সপ্তাহব্যাপী অনশন শুরু করেন। ১৯৫৭-তে কুমার সিংহলে অতুল্য ঘোষ, অজয় মুখোপাধ্যায়কে অপমান করে বিতাড়িত করলে তিনিও ইস্তফা দেন। এই আদর্শনিষ্ঠা তাঁকে এতদূর টেনে নিয়ে গিয়েছিল যে গুরু, বন্ধু, সঙ্গী, সহযোদ্ধা অজয় কুমারকেও ত্যাগ করেন একটা সময়। ১৯৫৭-এ 'মে' দিবসে সরকারী কর্মচারীদের অন্যায় আব্দারের বিরুদ্ধে জলঢাকাতে অনশন করেন তিনি। ঐ একই বৎসরে হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে সারা রাজ্যে এক মাসব্যাপী ৪৫০টি গণঅনশন শিবিরে ২ লক্ষ সত্যাগ্রহীকে উদ্বুদ্ধ করেন। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হয়েও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অন্যায়ভাবে জরুরী অবস্থা জারীতে জেহাদ ঘোষণা করে হাসিমুখে কারাবরণ করেন সুশীল কুমার। ১৯৫৭ সালে বাংলা কংগ্রেস এবং ১৯৫৭ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের সহায়তায় জনতা দল গঠন সুশীল কুমারের রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। শুধু স্বদেশের জন্য ভাবিত ছিল না তাঁর মন, অন্যান্য দেশের বিপদেও তিনি নির্দ্বিধায় বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে খাদ্যসামগ্রী, বুলেট গ্রেনেড, ডিনামাইট ইত্যাদি প্রেরণ করে তাঁর আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় রেখেছিলেন। ১৯৫৭-এ চীন ভারত আক্রমণ করলে তিনি দেশের মধ্যে প্রতিরোধী দল গড়ে তোলেন এবং দু' লাখ টাকা সংগ্রহ করে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর হাতে তুলে দেন।

সংশয়ীদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এই চিরতরুণ বিপ্লবীর সমস্ত কাজকর্ম কি সর্ববাদীসম্মত ছিল? বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের চোখে সুশীল কুমার দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লবী। একটা সময় তাঁকে আত্মগোপন করে পরিচালনা করতে হয়েছে সরকার বিরোধী সংগ্রাম। চতুর ইংরেজ বুঝেছিল এই লোকমান্য নেতাটিকে কারাগারের অন্ধকুঠরিতে বন্দী করতে পারলেই প্রত্তপ্ত তমলুক জুড়িয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। তাই তাঁর মূল্যবান মাথাটির দাম ধার্য হয়েছিল ১৯৪৩ সালে ১০ হাজার টাকা, যার আজকের

আর্থিক মূল্য হয়তো এক লাখেরও ওপর। শুধু অত্যাচারী ব্রিটিশরাজই নয়, কংগ্রেস নেতাদের কয়েকজন তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের হিংসাত্মক কাজের জন্য সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা বিদ্যুৎ বাহিনী, ভগিনী সেনা আর গরম দলের সহায়তায় সহিংসভাবে জাতীয় সরকার কায়েম করা হয়েছে এ সংবাদ অহিংসবাদী গান্ধীজীর কানে তুলে দেন। গান্ধীজীও ১৯৪৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর মহিষাদলে এসে নিজে সরেজমিনে তদন্ত করে গেছেন ব্রিটিশের শাসনে মেদিনীপুরবাসীরা কেমন আছেন। তাঁর মতো প্রাজ্ঞ জনদরদী নেতা বুঝেছিলেন মহিলারা কত অসহায় হয়ে ছোরা আর বঁটি দিয়ে রক্ষা করতে চেয়েছিল নিজেদের সতীত্ব। বীরের ধর্মে অহিংসার প্রয়োগ যে কত সার্থকতা লাভ করতে পারে তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। তবে তাঁর স্পষ্ট মূল্যায়ন ছিল এইরূপ : "ব্রিটিশরা যা করেছে এখানে, আমি হলে কি করতাম জানি না। তোমরা যা করেছ—তা বীরোচিত ও গৌরবময়। তবে তোমরা অহিংসার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলে।"

এইখানে তাহলে সুশীল কুমার সম্পর্কে তৈরি হয়ে যায় দ্বিতীয় প্রশ্ন। কারণ তিনিই ছিলেন জাতীয় সরকারের সমর সচিব, বিদ্যুৎ বাহিনী ও ভগিনী সেনার কমান্ডার ইন চিফ্। তাঁর নির্দেশে দেশের শত্রুদের শাস্তি বিধান করেছেন জাতীয় আদালত, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে গরম দলের অ্যাকশান স্কোয়াডের তরুণ বিপ্লবীরা। অতএব সঙ্গত জিজ্ঞাসা : যথার্থ অর্থে সুশীল কুমার অহিংসাপন্থী ছিলেন কিনা ? তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থ 'প্রবাহ'-১ম খণ্ড থেকে জানা যায়, প্রথম দিকে তিনি কতটা নরমপন্থী গান্ধীভক্ত ছিলেন। ভবতোষ দাস, সতীশচন্দ্র সামন্ত, কুমারচন্দ্র জানা, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত প্রামাণিক প্রমুখ নেতৃবর্গ দ্বারা তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু এর পাশাপাশি তাঁর চেতনায় অন্য গোষ্ঠীর প্রভাবও কাজ করছিল। শহীদ ক্ষুদিরাম ছিলেন তাঁর জেলার মানুষ, ১৯৩০-এর রক্তঝরা দিনগুলোতে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য, বিনয়-বাদল-দীনেশ, বিমল দাসগুপ্তের আত্মত্যাগের রোমাঞ্চকর কাহিনী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ছিল, ঐ সালেই তিনি রাজসাহী জেলে পরিচিত হয়েছিলেন অনুশীলন সমিতির কয়েকজন সশস্ত্র বিপ্লবীর সঙ্গে, আর এর সঙ্গে চির বিদ্রোহী বীর সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ স্বাধীনতার সুস্পষ্ট দাবিও হয়তো তাঁকে সহিংস পথের দিকে কিছুটা আগ্রহী করে তোলে। ১৯৪১-৪২-এ মেদিনীপুরে রাজকর্মচারীদের বর্বর অত্যাচার আগুন জ্বালিয়ে দেয় সুশীল কুমারের মনে। তিনি পাল্টা আক্রমণের

জন্য নিঃশব্দে গড়ে তোলেন গরম দল। অহিংসা দিয়ে হিংসাকে যখন জয় করা যাবে না, তখন শেষ অস্ত্র অবশ্যই হিংসা—এই নীতিতে বিশ্বাস করে সুশীল কুমার ভুল করেছিলেন না ঠিক করেছিলেন তার বিচার করবে আগামী প্রজন্ম। তবে তাঁর মধ্যে যে দ্বৈতদর্শন কাজ করেছিল এ বিষয়ে আজ অনেকেই স্থিরনিশ্চিত। অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতির প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে এখানে কিছু উদ্ধার করা যাক—"তাঁরা (জাতীয় সরকারের প্রথম স্তরের নেতারা) সম্ভবতঃ Double banner বা দ্বৈত পতাকার নীচে লড়াই করেন। এই পতাকার একটি ছিল গান্ধীবাদ অপরটি সুভাষবাদ। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান ও জার্মানীতে তাঁর ইণ্ডিয়ান লীগ গঠনের কথা তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মহারথীত্রয় জানতেন। তাঁদের আশা ছিল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার সমগ্র তমলুক মহকুমাতে যে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করেছে তা তমলুক বা কাঁথির সমুদ্র উপকূলে সুভাষচন্দ্রের সমুদ্রপথ অভিযানে সাহায্য করবে।" অধ্যাপক বিমলেন্দু চক্রবর্ত্তীর নিকট সুশীলবাবু অকপটে স্বীকার করেছেন, 'আমরা তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার সমগ্র তমলুক মহকুমাকে মুক্তাঞ্চলে পরিণত করেছিলাম এবং নেতাজী সুভাষের পথ চেয়ে বসেছিলাম—তিনি এলে তাঁকে সর্ব শক্তি দিয়ে এই সরকার সাহায্য করবে সুভাষের দিল্লী অভিযানে।"

এই বক্তব্যের দ্বারা পরিস্কার হয়ে ওঠে সুশীল কুমারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। আসলে দেশজননীর বন্ধন মোচনই ছিল তাঁর একমাত্র ব্রত; তা যদি সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র সংগ্রামের পথেও হতো তাকে স্বাগত জানাতে কোন দ্বিধা ছিল না তাঁর। ঠিক একই কারণে আজন্ম কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক হয়েও বামপন্হী রাজনীতির আদর্শে বিশ্বাস না করেও দেশের স্বার্থে দুর্নীতি পরায়ণ কংগ্রেসকে সরিয়ে যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এমন কি তাঁর রাজনৈতিক গুরু, জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্রের সঙ্গেও ১৯৭১-এ ঘটে যায় মতান্তর। এসব নিয়ে ঘরে-বাইরে তাঁকে অনেক প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু চিরকাল তিনি অবিচল পদক্ষেপে এগিয়ে গেছেন কোন কিছুকে ভ্রুক্ষেপ না করে। বোধ হয় এক্ষেত্রে তাঁকে সাহস যুগিয়েছে কবিগুরুর গানের সেই বিখ্যাত পংক্তিটি—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।' আজ পঁচাশি বছর বয়সেও তিনি সমান বেপরোয়া, উদ্যমশীল, প্রাণবন্ত। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও এইসব অনমনীয় প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের কাছে চারিত্রিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৩

সুকৃতী সুশীল কুমার

প্রণবানন্দ যশ

সুশীল কুমার ধাড়া—স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্নবিভোর সৈনিক। অবিস্মরণীয় আত্মার অংকুরোদ্গম। বিরল ব্যক্তিত্ব। আদর্শে আপ্লুত অদম্য আশার আলোকদ্যুতি। নিরাভিমান, নিঃস্বার্থ, নির্লোভ ও নির্ভীক। ত্যাগ-তিতিক্ষা আর আত্মপ্রত্যয়ের অপরাজেয় অন্বিষ্ঠ।

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত মহিষাদল থানার স্বল্পখ্যাত টিকারামপুর গ্রামে জন্ম হয় সুশীল কুমারের। ২রা মার্চ ১৯১১ সাল। আর পাঁচজন বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান-সন্ততির মতই তাঁর জীবনও ছিল সুখ-দুঃখের সংমিশ্রণ। কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথেই ছিল প্রবহমান জীবন। নিষ্ঠা নিয়মানুবর্তিতা নীতিজ্ঞানই তাঁর জীবনচর্চার সংগ্রামী হাতিয়ার। বিরতি বিহীন বিশ্রামহীন সংগ্রামই হ'ল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—চিন্তাধারার চিন্ময় চলৎশক্তি। সেইখানেই তিনি অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য, অনন্য। কর্মসাধনার উচ্চারোহণের পথে কর্মযোগী সুশীল কুমারের আবির্ভাব ঘটে অতি সাধারণ বৃত্তবেষ্টনে। সাধারণ আটপৌরে জীবনের আবেষ্টনী অতিক্রম করে এবং বৃত্তরেখার বহির্দেশে সাধারণের সমতলে অবস্থান করেও তিনি অসাধারণের শ্রেণীতে সহজেই সুদৃঢ় করেন তাঁর আসন। কীর্তির কল্যাণে আর কর্মের কুশলতায় তিনি নরকুল শিরোমণি। বরণীয়-স্মরণীয়। পরম পূজনীয়। দ্বিধাহীনচিত্তে, মুক্ত মনে বলতে বাধা নাই—

> "—সেই ধন্য নরকুলে
> লোকে যারে নাহি ভুলে
> মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।"

বিদ্যালয়ের সূচনা থেকেই সুশীল কুমার অন্য সকলের থেকে কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল। যৌবনের প্রারম্ভেই দেশভক্তির জোয়ারে অবগাহন করেছিলেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকায়। কিন্তু পুরোপুরিভাবে স্বাধীনতা একনিষ্ঠ সৈনিকরূপে আবির্ভূত হন বিদ্যালয় গণ্ডীর পরিসমাপ্তির পর।

১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রত্যক্ষরূপে দীক্ষিত হন ভারত স্বাধীনতার সংগ্রামী সংস্পর্শে। আর ১৯৪২-এ ভারত ছাড়

আন্দোলনে সেই ভাবধারার পূর্ণ বিকাশ প্রতীত হয়। ইংরেজ শাসনের শেষ দু' দশক তাঁর জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রকাশ। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের বাস্তব রূপায়ণকল্পে 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' স্থাপনের প্রচেষ্টা অন্যতম অবদান। আনুবীক্ষণিক ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেই নিহিত ছিল ১৯৪৭ সালের স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের গঠন গরিমা। বিন্দুতে সিন্ধু-দর্শন। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সেই ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণেই পরিস্ফুটিত হবে সুশীল কুমারের কৃতিত্বের ইতিকথা।

লবণ সত্যাগ্রহ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিশেষ মাত্রা। এই সিদ্ধান্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর। যিনি মহাত্মা গান্ধী অভিধায় জনমানসে সুপরিচিত। প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন। অহিংসভাবে ইংরেজ শাসককুলকে পর্যুদস্ত করাই ছিল লবণ সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা। ইতিহাস বলে যে ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ লবণ আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী গুজরাটের সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৯ জন সহযাত্রী নিয়ে পদযাত্রা শুরু করেন। সমুদ্রের অফুরন্ত লবণাক্ত জল থেকে লবণ তৈরী ভারতবাসীর নিকট দণ্ডনীয় অপরাধ। গান্ধীজীই সর্ব প্রথম সে আইন ভঙ্গ করতে ব্রতী হন। চব্বিশ দিনে ২৪১ মাইল পথ অতিক্রম করে গান্ধীজী গুজরাটের সমুদ্রোপকূলে ডাণ্ডিনামক স্থানে উপস্থিত হন। গান্ধীজীর এই পথ পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করেন পথি-পার্শ্বস্থ বহু পল্লীবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সত্যাগ্রহীরা অভিভূত হন বিপুল জনসমর্থন, সংবর্ধনা ও অভিনন্দনে। পরিলক্ষিত হয় জাতীয়তাবাদের নব উন্মেষ। সর্বত্র এক অভাবনীয় উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। দেশপ্রেমের ঢেউ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তড়িৎগতিতে সঞ্চারিত হয়। লবণ সত্যাগ্রহীদের উত্তাল সেই ঢেউ প্লাবিত করলো বাংলার স্বাধীনতা পিপাসু-সংগ্রামীদের অন্তর। স্বাধীনতা সাধনকেন্দ্র মেদিনীপুরের কয়েকটি স্থানে ব্যাপকভাবে আন্দোলনের সূচনা হয়। আন্দোলন অবদমনের জন্য শাসক গোষ্ঠীর দমননীতিও উগ্ররূপে ধারণ করে। কাঁথি মহকুমায় লবণ প্রস্তুতের সময় উপস্থিত দর্শকদের উপর নির্মমভাবে গুলি বর্ষিত হয়। তমলুকে সত্যাগ্রহী ও তাঁদের সমর্থকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলে; ঘরবাড়ী ভস্মীভূত করে দেয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার মূক-বধিরের ন্যায় সহ্য না করে প্রতিবাদের ধ্বনি সরব হতে থাকে। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান মেদিনীপুরের জনরোষ ও গণবিক্ষোভ ব্রিটিশ সরকারকে স্বল্পকালের জন্য হতবাক, নিঃশ্চল করে দিয়েছিল।

ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণে আইন অমান্য আন্দোলন ভারতের তাৎক্ষণিক স্বরাজ অর্জনে হয়তো সফল হয়নি ; কিন্তু স্বরাজ অর্জনের ভবিষ্যৎ সংগ্রামে এর গুরুত্ব অপরিসীম —সে কথা অস্বীকার করা অনৈতিহাসিক। জনমানসে এই আন্দোলন এক মহান আদর্শের প্রতিভূ। শুধুমাত্র মেদিনীপুরই নয়, ভারতবর্ষের আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন সচেতনতা। যা ছিল অন্তরের গুঞ্জন তারই প্রকাশ ঘটলো বজ্রসম নিনাদে। সচকিত হ'ল আপামর জনগণ। প্রমাদ গুণলো রাজদণ্ডধারী ইংরেজ সরকার।

লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে সুশীল কুমারের সাংগঠনিক ক্ষমতা সমসাময়িক কালের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিচিত হন বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে— সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সতীশচন্দ্র সামন্ত মশায়কে হঠাৎ আইনভঙ্গের জন্য বন্দী করা হলে তমলুক শিবির পরিচালনার সমূহ দায়িত্ব অর্পিত হয় সুশীল কুমারের উপর। বয়ঃকনিষ্ঠ তথাপি নিষ্ঠা ও দক্ষতার পরিমাপে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম। পরম প্রিয়। সুশৃঙ্খল ও সুচারুরূপে প্রতিপালন করেন সেই গুরুভার। ব্রিটিশ শাসককুলের বিষদৃষ্টি থেকে তিনিও অব্যাহতি পান নাই। তাই বন্দীদশা অচিরেই তাঁর ললাটেও ফুটে উঠলো। কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন বার বার। কারাগার থেকে কারাগারে স্থানান্তরিত হন —তমলুক, মেদিনীপুর, রাজসাহী, হিজলী প্রভৃতি কারাশ্রয়ে অতিবাহিত করেছেন জীবনের পরম রমণীয় মাধুর্যময় দিনক্ষণগুলি। মাস থেকে বছরও কেটেছে কারান্তরালে। কারাবাসের কণ্টকময় জীবনধারার মধ্যেই আস্বাদন করেছেন নবজীবনের আনন্দানুভূতি। কারাবাসের কক্ষকোণে স্বপ্নাবিভোর মন, স্বাধীন ভারত সন্দর্শনের নিমিত্ত নির্মিত করেছিলেন কত পরিকল্পনা কত ভাবনাচিন্তা কত শলাপরামর্শ কত জপতপ ধ্যান-ধারণা আর নিবিড় আরাধনা। এই সবগুলির প্রাঞ্জল প্রকাশ পাওয়া যায় স্বাধীনতা উত্তর সুশীল কুমারের জীবন ধারায়।

যাহোক, সুশীল কুমারের কর্মসাধনার মূল্যায়ন নিরূপণের পটভূমিকা স্বরূপে ভারত-ছাড় আন্দোলনের বিষয় দু-চার কথা বলা অসমীচীন হবে না। ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে ঐতিহাসিক 'ভারত-ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের উপর সিদ্ধান্ত হয় যে ভারতের মঙ্গলের নিমিত্ত এবং জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান অপরিহার্য। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে ভারতকে স্বাধীন করা হলে ভারতের

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে একটি সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং এই সরকার ভারতের সকল শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা করবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজীকে স্বদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করে বৃহত্তর সংগ্রামে জাতিকে পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ জানায়। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর সেই যাদুমন্ত্র - "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" প্রতিধ্বনিত হল। মন্ত্রমুগ্ধে আপ্লুত দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছিলেন তাঁর সেই আবেদনে। ব্যাপক সে আন্দোলন। সর্বত্রগামী। যদিও আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সর্বত্র এক ধরনের ছিল না। তাছাড়া গণ-বিক্ষোভের সংহতি ও সমন্বয়ের অভাব প্রকটিত। শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলনের প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও, কোন কোন ক্ষেত্রে চরম হিংসাত্মক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। তবে আন্দোলনের সময়ই ভারতের কোন কোন অঞ্চলে সমান্তরাল সরকার গড়ে ওঠে। ১৯৪২ সালে প্রথম বিহারের বালিয়াতে এরূপ এক আঞ্চলিক সরকারের পত্তন হয়। অবশ্য এই সরকারের আয়ু ছিল অতি স্বল্পকাল। কিন্তু মেদিনীপুর জেলার তমলুকে ১৯৪২ সালে যে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তার অস্তিত্ব ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল। তমলুক ছিল গান্ধীবাদী তথা গান্ধীজীর জাতীয় কর্মসূচীর এক অন্যতম কেন্দ্র। 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' সংগঠনে ও পরিচালনা বিষয়ে সুশীল কুমারের ভাবনা চিন্তা সর্বজনবিদিত এবং তাঁর এই চিন্তাজগতে যে দুই মনীষীর প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁরা হলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত এবং অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়। সুশীল কুমারের দীক্ষা গুরু। সমাজসেবার দিশারী। তমলুক মহকুমার সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক গঠিত জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবসের এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান সূচীর সুন্দর এক চিত্র ধরা আছে সুশীল কুমারের বর্ণনায়ঃ

"এই উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা অভিবাদন ও কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হল— পোষাক পরে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে। এসব আয়োজন সুন্দরা শিবিরে করা হয়েছিল – সর্বত্র সরকারী বুলেটিন 'বিপ্লবী' পূর্বাহ্নে ঘোষণা করেছিল যে, এইদিন জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হবে। পুলিস ও বিদেশী সরকার তা জানত। ২৯শে সেপ্টেম্বরের পর প্রায় আড়াই মাস পরে সামরিক পোষাক পরে বাদ্যযন্ত্র বাজনার তালে তালে কুচকাওয়াজ করার নির্দেশ দিতে খুবই ভাল লাগছিল।"[১]

জাতীয় সরকারের মন্ত্রীসভায় সুশীল কুমারের উপর ন্যস্ত হয় স্বরাষ্ট্র ও সমর বিভাগ। অত্যন্ত সুনিপুন ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। গ্রাম থেকে

গ্রামান্তরে, জনপদ থেকে জনপদে সম্প্রসারিত হল সেনাবাহিনী গঠনের কাজকর্ম। তাঁর আহ্বানে সমগ্র মেদিনীপুর জেলা শিহরিত হ'ল অনাস্বাদিত আলোড়নের বাতাবরণে। মহিষাদল, সুতাহাটা, তমলুক, নন্দীগ্রাম অঞ্চলে এবং প্রতি থানায় সংগ্রামী বাহিনীর সদস্য বহুলাংশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল। সৃষ্টি করা হ'ল বিভিন্ন সেনানী পদ সুচারুরূপে বাহিনী পরিচালনার জন্য—যেমন, কম্যানড্যাণ্ট, সহকারী কম্যানড্যাণ্ট ইত্যাদি। একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনও শুরু হয়। ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ ও ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লবীদল গঠন করে যে সশস্ত্র প্রচেষ্টা চলেছিল—তা সাধারণভাবে 'বিপ্লব বা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব' নামে অভিহিত। বিপ্লবীদের মূল লক্ষ্য ইংরাজ শাসকদের মনে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা এবং শাসন যন্ত্র বিকল করা। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারকে ভারত ভূমি থেকে বিতাড়িত করা। ভয়-ভীতি বিভীষিকা সন্ত্রাসই ছিল আন্দোলনের চরিত্র, তাই আন্দোলনকে 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যায় বর্ণিত করা হয়। ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই এই আন্দোলনের প্রসার ঘটেছিল ; কিন্তু বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে এর গভীরতা বিশেষ মাত্রা লাভ করেছিল। সন্ত্রাসবাদী ভাবনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এই সময়কার সংগ্রামী সংস্থার বিভিন্ন কর্মপন্থার পর্যালোচনায়। সুশীল কুমারের ভাবনাশ্রিত 'গরমদল'-এর উদ্ভব স্মরণে আনে সন্ত্রাসবাদী সংস্থার কম ধারার সাযুজ্য।

'গরমদল' নামক সংস্থাটি হ'ল অতি গোপনীয় একটি সংস্থা। 'বিদ্যুৎবাহিনী' 'ভগিনীসেনার'ই গোপন সংস্থা। কারাবাসের কণ্টকময় জীবনধারার মধ্যেই সুচিন্তিতভাবে গড়ে তুলেছিলেন দু'টি সেনাবাহিনী—বিদ্যুৎবাহিনী ও ভগিনীসেনা নামক সংগ্রামী সংগঠন। কেবল সংগ্রামই নয়, এই বাহিনীদ্বয় প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় থেকে মানুষকে উদ্ধার করার কাজে নিযুক্ত ছিল। সেবামূলক কাজে এই বাহিনীদ্বয় যে অভূতপূর্ব গঠনমূলক কাজে ব্রতী হয়েছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে লিখিত আছে সুশীল কুমার রচিত 'প্রবাহ' গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ছত্রে। গোয়েন্দা বিভাগের কাজকর্মের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য—এরা অজ্ঞাত কুলশীল। অর্থাৎ পরিচয় অজ্ঞাত। জাতীয় সেনাবাহিনীর হার্ডকোর বা এ্যাকশন স্কোয়ার্ডরূপেই পরিচিত। সুশীল কুমারের নেতৃত্বে ও পরিচালনাধীনে এই বিশেষ দলটি গড়ে ওঠে। গরমদলের

গঠনের মধ্যেও তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়। প্রকাশমান হয় দেশমাতৃকার চরণে ভক্তি আপ্লুত তরতাজা জীবনের নিঃশর্ত আত্মদান। দলের সদস্যদের নিকট তিনি ছদ্মনামে 'বড়সাহেব'। গোপনীয় এই সংস্থাটির উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম বিষয়ে জানা যায়—"মজার কথা এই যে ব্রিটেনের গোয়েন্দা বিভাগ সম্পূর্ণ অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দেশদ্রোহীদের সন্ধান করতে বা আমাদের কারাগারে বন্দী একজনকেও উদ্ধার করতে। কোন কারাগারের সন্ধান করে উঠতেও পারেনি। জাতীয় সরকারের নিয়ম শৃংখলা ও গোপনীয়তা ছিল দুর্ভেদ্য বর্মে মোড়া—এটা তার প্রমাণ। প্রেম, প্রীতি, স্নেহ ও ভালবাসার অচ্ছেদ্য বন্ধনে কয়েক সহস্র সেনানী ও সরকারের পরিচালকবৃন্দ এমনভাবে আবদ্ধ ছিল যে এই সুকঠিন শৃংখলা কোন সময় তাদের কাছে শৃংখল বা বন্ধন হয়ে ওঠেনি।[২] আবার 'গরমদল' ছিল "দুষ্টের আতঙ্ক, শত্রু সরকারের ত্রাস ও তাদের গোয়েন্দা বিভাগের বিস্ময় এবং নাগরিকবৃন্দের শান্তি, তৃপ্তি ও ভরসার বস্তু।"[৩] গরমদলের সদস্যগণের নিকট দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে তাঁরা দেশ সেবার যে মহান ঐতিহ্য তুলে ধরেন, তা ভারতবাসীকে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করে—একথা অস্বীকার করা যায় না। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। জনমানসের উপর তাঁদের সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের প্রভাব গভীরভাবে পড়েছিল। প্রয়াত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই প্রসঙ্গে আলোচনায় মন্তব্য করেছেন যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল স্থান অস্বীকার করা যায় না। এদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশদের বিতাড়ন করে স্বাধীনতা অর্জন করা এবং তারজন্য ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতে কখনও দ্বিধা করেন নাই। গরমদলের কার্যকলাপের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী এবং সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার পরিচালনাক্ষেত্রে এই বাহিনীর ভূমিকা সর্বজনবিদিত। ব্রিটিশ সরকারের শাসনব্যবস্থা তমলুক মহকুমায় একপ্রকার অচলই হয়ে পড়েছিল। শাসক সরকার এই বাহিনীর বিলুপ্তির জন্য প্রভূত প্রচেষ্টা চালিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সক্ষম হন নাই। অবশেষে ১৯৪৪ সালে গান্ধীজীর নির্দেশে জাতীয় সরকারের সব কাজকর্ম বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেন সুশীল কুমার। তাঁর সাংগঠনিক কৃতিত্বের ফলেই এই বাহিনী এক দুর্ধর্ষ প্রবল প্রতাপশালী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। রাজশক্তির অদম্য ক্ষমতাও চরম সমীহ করে চলতো গরমদলের

কার্যকলাপগুলিকে। এসবই সম্ভব হয়েছিল সেই মানুষটির চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ফলে। দুর্বার সাহস আর আসুরিক পরিশ্রমই ছিল তাঁর জীবনপ্রবাহের মূলমন্ত্র, জয়মাল্যের অমোঘশক্তি। নির্ভেজাল দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ তাঁকে দুঃসাহসী করে তুলেছিল। গান্ধীবাদে বিশ্বাসী হয়েও অহিংস সহিংস উভয় পথেই তিনি দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। গরমদলের মাধ্যমে বিপ্লবাত্মক ও হিংসাত্মক কাজ করতে তিনি দ্বিধাগ্রস্থ হননি। পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য—সেই উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত ছিল তাঁর পরম পুণ্যময় প্রাণপাখিটি। প্রসঙ্গক্রমে সুশীল কুমারের মতামতটি যাচাই করে নিই একবার—"বাইরে গান্ধীজীর আন্দোলনের কর্মী হয়েও অন্তরে সযত্নে লালন পালন করেছিলাম ১৯৩০-এর রাজসাহী জেলের বিপ্লববাদের শিক্ষা আর ১৯৩১-এর দমদম অ্যাডিশনাল স্পেশাল জেলের লাঠি. ছোরা, যুযুৎসুর প্রশিক্ষণ।"[৪] গান্ধীজী-সতীশচন্দ্র-অজয় কুমারের ভাবশিষ্য হয়েও, সুশীল কুমার প্রবলরূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন সমসাময়িক কালের বিপ্লবাত্মক বা সন্ত্রাসবাদী চিন্তাদর্শে। ইংরেজ শাসকদের অকথ্য অত্যাচার তরুণ বিপ্লবী নির্ভীক দুঃখজয়ী সুশীল কুমারের অন্তরের অকৃত্রিম ব্যথা বেদনার সঞ্চার করতো। অসহ্য সে বেদনার অনুভূতি। তাই তিনি বলতেন—"সুযোগ পেলেই ঐ বিপ্লবের পথই ধরব মনের সে বাসনাকেও সদা জাগ্রত রাখার চেষ্টা করতাম। মেদিনীপুরের তিন জেলা শাসক হত্যার পর প্রতিবারে আমি উৎফুল্ল হলেও অজয়দার নির্দেশে মুখ-মন কিছুই খুলতাম না এ বিষয়ে। এছাড়া বীণাদাসের সাহসিকতা, শান্তি-সুনীতির দুর্দ্ধর্ষ ও অতুলনীয় কৃতিত্ব আমার মনকে বিপ্লববাদের দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল।"[৫] সুশীল কুমার 'প্রবাহের' মধ্যে 'দ্বন্দ্ব তো হিংসা-অহিংসার প্রশ্নে' বলে স্বীকার করেছেন। আসল কথা, হিংসা-অহিংসা, নরম-গরমের দ্বন্দ্বমুক্ত, সংশয়মুক্ত কোন মার্গের সন্ধান লাভ খুবই সুকঠিন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম কর্ণধার, স্বাধীনোত্তর কালেও ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের কক্ষপথে বিতর্কিত এক ব্যক্তিসত্তা সুশীল কুমার। ব্যক্তিগত সিদ্ধি সাধনে অনীহাপ্রবণ এই মানুষটি বারবার মানবাত্মার সেবার নিমিত্ত সংকল্প গ্রহণ করেন আজও—বয়সের বাধা তুচ্ছ করে, অপ্রতিরোধ্য গতিতে সংকল্প সাধনে প্রয়াসী। আজও তিনি জনমানসের সেবা পরম তৃপ্তিভরে সাধন করেন। তাঁর ভাবনাচিন্তা আজও সচল এবং প্রাসঙ্গিক। পঁচাশিটি শরতের অভিজ্ঞতালব্ধ তাঁর জীবন ভারত ইতিহাসের বিস্ময় ও কৌতূহলোদ্দীপক।

কর্মযোগী সুশীল কুমার দেশের যুবকদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের জন্য আজও সমভাবে অগ্রণী। তাঁর প্রাণ-স্পন্দনের অনুরণন দরিদ্র দেশবাসীর শিক্ষাব্যবস্থার উপযুক্ত পরিচালনা নিমিত্ত অপরিসীম আগ্রহ সহকারে তাঁকে বিভিন্ন পর্য্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন করতে হয়েছে। সেই প্রচেষ্টার অঙ্কুর পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা সংস্থার অবয়ব নিয়ে জাতি গঠনে শিক্ষার প্রতি তাঁর ঘনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকটিত। সুশীল কুমারের শিক্ষাভাবনা অনেকটাই কর্মমুখী। সার্বিক মানুষ গঠনের শিক্ষা। ভারতীয় শাস্ত্রে 'বিদ্যা' অর্থের পরিপূরক। একমাত্র 'বিদ্যার' দ্বারাই মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য 'অমৃতত্ব' লাভ করা যায়। 'বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্' অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। কিন্তু 'বিদ্যার' অর্থ কেবলমাত্র জ্ঞানের অনুশীলন, অবধারণ বা প্রাপণই নয়, বরং জ্ঞানের সঙ্গে 'ভক্তি' এবং 'ভক্তির' পাশে রয়েছে 'কর্ম' যার প্রকাশ সৌন্দর্যে মাধুর্যে ঐশ্বর্যে সগৌরবে। তাই বিদ্যার দ্বারা অনুসৃত হয় মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধন— মোক্ষলাভ, অমৃতত্ব লাভ। এ বিদ্যা জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের অনুপম-অপরূপ-অত্যাশ্চর্য সমন্বয়। নিষ্কামকর্ম আর সেবার দ্বারা অর্চিত হবে সে বিদ্যার অন্বেষণ। সুশীল কুমার সনাতন ভারতবর্ষের সেই ঐতিহ্যময় পরম সত্যকে শাশ্বত-তত্ত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন 'ছেলেবেলায় পাঠ্যাভ্যাসের সান্ধ্যবাসরে দাদুর কোলে বসে পণ্ডিত মশাইয়ের নিকট রামায়ণ-মহাভারত শ্রবণের মধ্যে দিয়েই।' সাধুসঙ্গ লাভের সৌজন্যে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন বিভিন্ন সাত্ত্বিক গুণাবলী। 'নিভৃতে তাঁর (সাধন মহারাজ) কাছে বসে ত্যাগ, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা এবং জনসেবা প্রভৃতি সদুপদেশ সুশীল লাভ করে। এরূপেই তার হৃদি-কন্দরে সেই ত্যাগ, সেবা, ধর্ম, কল্যাণ ও মঙ্গল মন্ত্রের দীপ আজিও প্রজ্বলিত।"[৬]

আজও আপন মনের মাধুরী মিশায়ে গড়ে এক এক বিদ্যামন্দির। নরনারায়ণের আশ্রয়স্থল। মানবজীবনের মুক্তি সাধন কেন্দ্র। এ মুক্তি কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়েই সীমিত নয়, বরং এর পরিসর সুদূর-প্রসারিত। আর্থ-সামাজিক বলয়রেখায় প্রতিভাত হয় সেই সমস্যার চিত্রাবলী। আপন শিল্প-শৈলীর পরিকাঠামোয় সুশীল কুমার সচেষ্ট হয়েছেন সমাধানের পথ অনুসন্ধানে।

বাংলার অন্যতম কৃতী সন্তান সুশীল কুমার বাংলা তথা ভারতীয় অর্থনৈতিক সংস্থানের জন্য ব্যবসা ও বাণিজ্যে তাঁর মেধা ও কর্মপ্রতিভার সুস্পষ্ট ছাপ রেখেছেন। নিত্য সৃজনশীল কর্মসূচীর মধ্যেই ব্যক্ত করেছেন তাঁর চিন্তা-ভাবনা।

গ্রামীণ মানুষজনের খাদ্য ও বস্ত্রে স্বয়ম্ভর হওয়া, শিক্ষা ও স্বাক্ষরতার প্রসার, উপার্জনের নানাবিধ উপায়, প্রভৃতি আর্থিক চিন্তাভাবনা এবং বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সেগুলির রূপায়ণ তিনি বাস্তবে পরিণত করেন। খাদি গ্রামোদ্যোগ কেন্দ্র, মাতৃকল্যাণ ও প্রসূতি সদন, দাতব্য চিকিৎসালয়, মৌমাছির পালন, কুটির শিল্প, গ্রামীণ পাঠাগার, বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষা ও স্বাক্ষরতার প্রসার প্রভৃতি নানা সংগঠনের দ্বারা গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনধারায় সচলতা ও সচ্ছলতার গতি সঞ্চার করেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের এই প্রতিষ্ঠার জনকরূপে বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চারিত্রিক নিষ্ঠাবলে, বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে বিশাল সম্পদ করায়ত্ত করলেও, সম্পদের শৃঙ্খল তাঁকে বন্দী করতে ব্যর্থ হয়েছে। ঐশ্বর্যের মধ্যেও সাধারণ সহজ সরল জীবনের সীমানাকে ভুলেও তিনি অতিক্রম করেন নি। যারা রিক্ত অবস্থা থেকে বিত্ত-সিক্ত হয়ে থাকেন, তাদের অনেকেই মানসিক ও চারিত্রিক ব্যাধিস্বরূপ চিত্তের অহমিকা, ঐশ্বর্যের ঝলকানি, পদমর্যাদার মদমত্ততায় ভুগতে দেখা যায়। কিন্তু সুশীল কুমার এইসব ব্যাধি কলুষমুক্ত। নিষ্পাপ কলংকহীন। মৃদুভাষী, স্মিতহাস্যময়, অনাড়ম্বর বেশভূষায় আচ্ছাদিত এই মহাপ্রাণ মানুষটিকে কখনও উত্তেজিত দেখা গেছে বলে জানা যায় না। ধীর, স্থির, সংযত এই ব্যক্তিটি নিজেকে বিলিয়ে দেবার সহজাত শক্তি নিয়েই জীবন যাপন করেন। নিজেকে বিলিয়ে দেবার প্রেরণা আসে মানুষের আত্মোপলব্ধি থেকে, জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও অভ্রান্ত অনুভূতি থেকে। জীবনের অন্তরাত্মার আহ্বানে আত্মনিবেদনের আবেদন যখন মানুষের গহনে বারবার আঘাত দিতে থাকে সে সময় মানুষ আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়েই মুক্তির সন্ধান পায়। নিষ্কাম সাধনায় নিজেকে নিবেদন করেছেন জনগণের সেবায়-নিভৃতে-নীরবে। তাঁর বহুধা প্রসারিত জীবনধারা ছিল কল্যাণময় কর্মের নিমিত্ত। তাঁর মনের গীতা উল্লিখিত 'শান্ত পুরুষের' স্তরে উত্তরণ ঘটেছে।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধি গচ্ছতি ॥

এরূপ এক মানুষ সুশীল কুমার—সর্বজনপ্রিয়, সর্বজনবন্দ্য, সর্বজনবরেণ্য, সর্বজনপ্রণম্য 'দেশকর্মী', দেশ-হিতৈষী। তাঁর কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, তাঁর হৃদয়ের বিশালতায় উদ্দীপ্ত, তাঁর স্নেহ-নির্ঝরে অভিসিক্ত হোক নতুন প্রজন্মের জনমানস।

৪
কিছু কথা কিছু স্মৃতি
মালীবুড়ো

১৯৮৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর। সুশীলদা কলিকাতার পি জি হাসপাতালে উডবার্ণ ওয়ার্ডে অচৈতন্য। অসহ্য পেটের যন্ত্রণা। কয়েকদিন জ্ঞান আসছে না কিছুতেই। ভি. আই. পি. রূপে ভর্তি হয়েছেন। সংবাদপত্রে পড়ছি দাদার সাংঘাতিক অসুখের খবর। সরকারী মহল থেকে ঘন ঘন খোঁজ নিচ্ছে, সুশীলদা কেমন আছেন। অবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে কিনা।

ডাঃ প্রদীপ মজুমদার সবিশেষ চিন্তিত। তিনি এই অবস্থায় সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে পারছেন না। সার্জারী ডিপার্টমেণ্টের হেড। পি. জি.-র নামকরা বিখ্যাত ডাক্তার। কি করবেন ভেবে স্থির করতে পারছেন না। মিনিট, ঘণ্টা, দিন কাটছে এই যায় ঐ যায় অবস্থায়। এমনি কেটে গেল ৫-৭ দিন।

শেষে এইরূপ অজ্ঞান অবস্থায় পাঠান হল আই. টি. ইউ ডিপার্টমেণ্টে। ডাঃ মান্না ডিউটি অফিসার। এটি পি. জি-র মেডিসিন শাখা। ডাঃ মান্না রোগীর অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে ডাক দিলেন ডাঃ এস আর জানা, এম. ডি-কে। ডাঃ জানা এসে দেখলেন, রোগীর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, পেট ফুটে ঢাই, নাড়ির শব্দ অতিক্ষীণ। এমতাবস্থায় পেটের জল বের করা আশু প্রয়োজন। কিন্তু কেউ সাহস করছেন না। তখন ডাঃ পি. মজুমদার ও ডাঃ মান্না বললেন ডাঃ জানাকে—এমতাবস্থায় নিজ দায়িত্বে আপনি পারেন রোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে। কারণ, আপনি মেডিসিন বিভাগের অভিজ্ঞ চিকিৎসক।

ডাঃ জানা তখন কালবিলম্ব না করে নাকের মধ্য দিয়ে নল চালিয়ে সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে টেনে আরম্ভ করলেন জল বের করতে। কিন্তু রোগীর যা অবস্থা এত ধীর গতিতে জল বের করলে কিছুতেই সম্ভব হবে না রোগীকে সুস্থ করা। আরো দ্রুত ও বেশী পরিমাণে জল বের করা প্রয়োজন। তখন তিনি সাকার ম্যাসিন এনে ফিট্ করলেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। অনায়াসে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে আসতে লাগল পেটের পুকুর ভর্তি জল। পাশের বড় বড় বয়াম একটির পর একটি চললো ভর্তি হয়ে। ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এল পেট। ক্রমে দূরীভূত

হলো শ্বাসকষ্ট। উন্নতি হলো পালসের। কুমুদির ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এলো। আমরা খবরের কাগজে দেখলাম, শ্রী ধাড়ার আংশিক সুস্থতার খবর। সে ক'দিনের রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তের কথা কল্পনা করা যায় না।

সেদিন ডাঃ জানা যদি নিজ দায়িত্বে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এই কাজ না করতেন, তাহলে দাদাকে আমরা ফিরে পেতাম কি না জানি না। ভাগ্য-বিশ্বাসী মানুষ হয়ত বলবেন—'রাখে হরি মারে কে !'

যাইহোক দাদার বিপদ কিন্তু এতেই কেটে গেল না। ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল এ্যাপেণ্ডিসাইটিসে। করাতে হল অপারেশন। একটির পর একটি বিপদ ঠিক যেন মালার মত দেখা দিতে লাগল। এক ছিদ্র বন্ধ করা হল ত দেখা দিল তার গায় আর এক ছিদ্র। এই নিয়ে ডাক্তার আর রোগের মধ্যে চললো টাগ অব ওয়ার। যাকে বলে যমে মানুষে টানাটানি।

এইসব নানান ডাক্তারী গল্প শুনছিলাম ডাঃ জানার চেম্বারে বসে বসে। সে সব খুঁটিনাটি ডাক্তারী পরিভাষা আমি মনে রাখতে পারিনি বা লিখে রাখতেও অবসর ছিল না।

এবার আসল কথাটিই বলি। ক্রমে ক্রমে সুশীলদা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। পি. জি -তে ছিলেন প্রায় দু' মাস। ডাঃ জানা যেতেন দাদার বেডে। নিতান্ত সৌজন্যমূলক সাক্ষাত করতে। দু' দণ্ড বসে গল্প করতেন। বলতেন, ছেলেবেলা থেকে আপনার সম্পর্কে কত গল্পই না শুনে আসছি। আপনাদের স্বাধীন তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার, বিদ্যুৎবাহিনী—আর আপনার জীবনের কত রোমাঞ্চকর গল্প। সে সবতো ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। লিখুন না, তাহলে আমরা জানতে পারব। আমার দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সে সব ইতিহাস পড়ে গর্ব অনুভব করবে। জানবে আপনাদের শৌর্য-বীর্যের কথা।

রোগ শয্যায় বসে সুশীলদা হাসেন মৃদু মৃদু। উৎসাহজনক কোন জবাব দেন না। ডাঃ জানা কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। রাউণ্ড শেষে যখনই অবসর পান, তখনই হাজির হন দাদার কাছে। গিয়ে তুললেন সেই একই প্রশ্ন। শেষে দাদা মুখ খুলেন। বলেন—তিনি আরম্ভ করেছেন। ইতিমধ্যে অনেকটা লিখেও ফেলেছেন। তবে সেটি ইতিহাস নয়। তাঁর নিজের আত্মজীবনী। জেলে থাকতে থাকতেই তিনি লেখা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু তা যথাযথ আত্মজীবনী হয়ে উঠেছে কিনা সে বিষয়ে দাদার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

শুনে ডাঃ জানা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন—তাহলে ত খুব ভালই

হল। আপনার সেই লেখা প্রকাশ করা যায় কিনা আমি দেখছি। আমাকে চিঠি লিখলেন ডাঃ জানা। চিঠি পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম। আমার 'সূর্যদেশে' আমি ধারাবাহিকভাবে নিশ্চয়ই প্রকাশ করব। তবে তার আগে পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখতে চাই।

কয়েকদিন পরে ডাঃ জানার উত্তর পেলাম। উনি লিখেছেন—খাতা যাচ্ছে আপনার কাছে। সম্ভবতঃ কয়েক দিন পরে বাদল মাইতির হাতে তিনটি খাতা পেঁছে গেল আমার কাছে।

আমি ভীষণ উৎসাহ নিয়ে রাত জেগে জেগে পড়ে তিনটি খাতা শেষ করলাম। সত্যি বলতে কি, পড়ে অভিভূত হলাম। দাদা তখন পি. জি. থেকে ছাড়া পেয়ে চলে গিয়েছেন দিল্লিতে। যোগাযোগ যা কিছু সবই চলছে চিঠি-পত্রে।

আমার মনে তখন ঝড় উঠেছে। এ লেখা ত সূর্যদেশে প্রকাশ কর ই। যেমনভাবেই হোক বই আকারে প্রকাশ করতেই হবে। কিন্তু তার আগে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ ত করি। দেখি পাঠক ও বুদ্ধিজীবী মহলে কেমন সাড়া পড়ে। সূর্যদেশের একাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে (১৯৮৩) 'প্রবাহ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ আরম্ভ করলাম। মাসিক পত্রিকা আমার।

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশের পরই সাড়া পড়ে গেল। দপ্তরে চিঠি-পত্র আসতে আরম্ভ করল। বাংলাদেশেও ছিল বেশ কিছু গ্রাহক। ঢাকা বাংলা একাডেমিতেও যেত পত্রিকা। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন দু'একজন মুক্তি ফৌজও নিতেন আমার পত্রিকা। আজকের সাংবাদিক ও গবেষক অধ্যাপক আমজাদ হোসাইন তখন কলেজের ছাত্র ও মুক্তিযোদ্ধা। ওরা লিখলে— ওখানের ছাত্র সমাজ 'প্রবাহে'র প্রথম অধ্যায় পড়ে ভীষণ উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। পরবর্তী সংখ্যার জন্য ওরা আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু আশ্চর্য হলাম আমার তমলুক মহকুমার কোন পাঠকের কাছ থেকে কোন পত্র না পেয়ে। পরে অবশ্য অনেকেই যোগাযোগ করেছিলেন। এতসব কথা লিখছি এইজন্য যে, যে দেশে ফসল উৎপন্ন হয়, সেই উৎপাদিত ফসলের মূল্য তৎক্ষণাৎ সেই দেশ দেয় না বটে কিন্তু দেরীতে হলেও একদিন তার মূল্য বুঝতে পারে। এক্ষেত্রেও হলো তাই। দু'টো সংখ্যায় 'প্রবাহ' প্রকাশিত হওয়ার পরই চারিদিক থেকে চিঠি আসতে আরম্ভ করল। আর তারা ধরে ধৈর্য রাখতে পারছেন না। যেমন করেই হোক যেন বই আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করি।

আমি পড়লাম ভীষণ চিন্তায়। এমনি পত্রিকা বের করতেই হিমসিম খাচ্ছি,

এত টাকা পাব কোথায় ? কয়েকজন নামকরা প্রকাশকের দরজায় ঘুরলাম, ফল বিশেষ কিছু হলো না। একজন নামকরা প্রকাশক বললেন, তিনি ছাপতে পারেন, তবে তাঁকে সব স্বত্ত্ব দিয়ে দিতে হবে। ওদের আমি ভালভাবেই চিনি। তাই এলাম ফিরে।

অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলাম, দাদারই স্মরণাপন্ন হবো। চিঠি লিখলাম কুমুদিকে (কুমুদিনী ডাকুয়া)। দীর্ঘ চিঠি। উনি যেন দাদাকে বুঝিয়ে বলেন। জীবনে অনেক টাকা ত দেশের জন্য ভিক্ষে করে সংগ্রহ করেছেন। দাদার মত মহা ভিখেরী ত বড় একটা কাউকে দেখি না। উনি যদি এই সামান্য কয়েক হাজার টাকা কোথাও থেকে ধারও করে দেন, তাহলে আমি বই প্রকাশ করতে পারব বলে আশা করি। এক সঙ্গেও যদি না পারেন, প্রাথমিকভাবে কাগজ কেনার দাম দিলেই হবে।

এদিকে তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কসের নিশিকান্ত হাটই-এর সঙ্গে ছিল আমার পূর্ব থেকেই পরিচয়। তিনি আমার মেদিনীপুরের ময়নার অধিবাসী। ২৬, বিধান সরণিতে বিরাট তাঁর প্রেস। তাঁকে বলতেই তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ধারে ছেপে দেবেন বললেন। আমি অবশ্য বললাম - সম্পূর্ণ ধারে আমি চাচ্ছি না। কিছু কিছু করে ৬ মাসের মধ্যেই শোধ করে দেব সব টাকা। তিনি তাতেই সম্মত হলেন। দাদার লেখা বই ছাপা হবে তাঁর প্রেসে এর চেয়ে গৌরবের কি আর হতে পারে !

শেষে কুমুদির চিঠি এলো। না, নিরাশ করেননি কুমুদি আমাকে। তিনি জনকল্যাণ ট্রাস্ট থেকে টাকা ধার করে শীঘ্রই টাকা পাঠাবেন বলে লিখলেন। দিল্লিতে দাদা ভালই আছেন। অবশ্য আর একটি অপারেশনও করতে হয়েছে। ডাঃ জানার সঙ্গে চিঠিপত্রে চিকিৎসা সম্পর্কে সব পরামর্শ ওঁরা নিয়মিত করেছেন।

বাংলা ১৯৪৩ সালের ৮ই আষাঢ়, বুধবার রথযাত্রার দিন প্রবাহ ১ম মুদ্রণ প্রকাশিত হল। আমি পূর্ব থেকে কাউকে কোন কথা না জানিয়ে দুম করে বই নিয়ে হাজির হলাম তমলুকে 'তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটির' অফিসে। সঙ্গে একটু মিষ্টি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। দাদাকে প্রণাম করে মিষ্টির প্যাকেটসহ ধরিয়ে দিলাম 'প্রবাহ'।

উপস্থিত সকলেই নিতে চান বই। আমি বললাম—ছাড়ুন ২৫টি করে কড়ি। প্রায় সকলেই এক সঙ্গে পকেট থেকে বের করতে আরম্ভ করল টাকা।

দেখতে দেখতে ২৫ কপি নিঃশেষ। আনন্দে ভরে উঠল আমার মন। এই হলো 'প্রবাহ' প্রথম খণ্ড, প্রথম মুদ্রণ প্রকাশের পিছনের ইতিহাস।

প্রবাহ হলো স্বাধীনতা সংগ্রামী একজন শীর্ষস্থানীয় নেতার জীবন ইতিহাস। সেই সঙ্গে এতে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অঞ্চলের মানুষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী। আমি পূর্বেই বলেছি, প্রবাহের পাণ্ডুলিপি পড়ে অভিভূত হয়েছিলাম। কথাটি একটু ব্যাখ্যা করে বলা দরকার। পড়ার সময় বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলাম, একজন বিপ্লবী সংগ্রামীর মানসিক দ্বন্দ্ব তার লেখার মধ্যে কতখানি ধরা পড়েছে। তথ্য, সন, তারিখকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে, খুঁজেছিলাম তাঁর অন্তর-রাজ্যকে। লেখার মধ্যে মুন্সিয়ানার খোঁজ না করে বাক্যের মধ্যে শব্দের প্রয়োগ তিনি কিভাবে করেছেন। কারণ, শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই খুঁজে পাওয়া যাবে অবচেতন মনের খবর। তাই প্রকাশের সময় বাক্য, বানান ভুল যেটুকু ছিল তাই সংশোধন করেছিলাম মাত্র। কোন শব্দের পরিবর্তন বা পরিবর্জন করিনি। চিন্তা করে দেখেছিলাম, তা যদি করি আসল সুশীলদাকে তাঁর লেখার মধ্যে খুঁজে পাব না। আসল মানুষটিকে হারিয়ে ফেলব।

'প্রবাহ' নিয়ে বিচিত্র ও বিরুদ্ধ সমালোচনা অনেক হতে পারে। তার প্রমাণ Geyl-এর Napoleon For and Against। আমি এইসব বিতর্কে যেতে চাইছি না। প্রবাহের মধ্যে সুশীলদার প্রতিভার অনুসন্ধান করতে তৎপর হয়েও উঠিনি। কারণ, ইতিহাসে প্রতিভার ব্যাখ্যা নাই। কথাটা একটু খোলসা করে বলি। গান্ধী কেন গান্ধী হলেন, এই প্রশ্নের উত্তর ঐতিহাসিক দিতে অক্ষম। কেউ বলেন, গান্ধী মায়ের কাছ থেকে ধর্ম কি তাই পেয়েছিলেন আর বাবার কাছ থেকে রাজনীতি। তাহলে অন্য ছেলেরা কেন শুধু গান্ধীই থেকে গেল। একা মোহনদাস দেশের বাপু হলেন। এই সংকটে ঐতিহাসিক ধরেন অন্য পথ। তার কাছে প্রশ্ন এই নয় যে, গান্ধী নিজস্ব কোন প্রতিভার জোরে দেশের নায়ক হলেন, তাঁর মনের মধ্যে তখন প্রশ্ন হল গান্ধীর বক্তব্য, গান্ধীর নির্দেশ ওই বিশেষ সময় দেশ কেন মেনে নিল। অর্থাৎ সমস্যাটা গান্ধীকে নিয়ে নয় সমস্যা দেশকে নিয়ে।

প্রবাহ প্রথম সংস্করণ পড়ে ঐতিহাসিক নিমাইসাধন বসু, ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায় প্রভৃতি বিজ্ঞজন বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থী কেউ কেউ ভাষা নিয়ে দু-একটি আপত্তিমূলক কথা তুলেছিলেন। তাই দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের সময় এই পুস্তকের বহু শব্দ এমন কি বাক্যেরও কিছু সংশোধন

করা হয়েছে। এইসব পরিবর্তন ও পরিবর্জনের ফলে লেখকের মনের আন্তর্জ্ঞানিক (sub-conscious state) অবস্থার কথা জানার পক্ষে অন্তরায় দেখা দেবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যখন কোন মনস্তত্ত্ববিদ সুশীলদার হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করতে চাইবেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে সফল হবেন মনে হয় না।

এই আন্তর্জ্ঞানিক প্রদেশের অলক্ষ্যে কত চিন্তাই যে লুকিয়ে আছে তার ইয়ত্তা নাই। আমরা জীবনে যত কিছু চিন্তা করি তার কোনটাই একেবারে নষ্ট হয় না। সেগুলি চেতনার রাজ্য থেকে বিস্মৃতির রাজ্যে চলে যায়। আত্মজীবনী লিখতে গেলে কত কথাই না মনে পড়ে। সে সব নিজ জীবনের শৈশব, কৈশোর, যৌবনের ফেলে আসা অতীতের কথা। মনের যে প্রদেশে অতীতের এবং বর্তমানের শত শত আশা আকাংখা লুকিয়ে আছে তাকেই বলে অবচেতনার প্রদেশ বা sub-conscious state। সুশীলদার সেই বিস্মৃতির কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রদেশে বিভিন্ন কারাগার বাসের স্মৃতিও লুকিয়ে আছে। সেই সময়ে একজন বিপ্লবীর অন্তর-রাজ্য কেমন ছিল তা অনুভব করতে হলে সুশীলদা যে শব্দগুলি প্রয়োগ করেছেন, মনস্তত্ত্ববিদ্‌কে তাই অবলম্বন করতে হবে। যারা প্রবাহের দ্বিতীয় সংস্করণ পড়ে তা অনুসন্ধান করতে যাবেন, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সফল হবেন বলে মনে হয় না।

প্রবাহ নিছক আত্মজীবনী নয়, একাধারে ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শনও সাহিত্য ত বটেই। তাই গবেষক ইতিহাসের ছাত্রকে এই তিন রকম চেষ্টার সঙ্গে নিজের কাজকে তুলনা করে দেখতে হবে। তবেই স্পষ্ট হবে ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে সুশীলদার জীবনের কথা এসেই পড়ে। ওঁর জীবনকে মোটা-মুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামী শুধু নন একজন বিশেষ গুণ সম্পন্ন নেতা। দ্বিতীয় ঃ স্বাধীনতার পরবর্তী রাজনৈতিক জীবন। তৃতীয় ঃ ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বরে মৃত্যুর কোল থেকে ফিরে এসে দাদার নতুন জীবন ও কর্মে আত্মনিয়োগ।

জীবনের এই তৃতীয় অংশের কথা সংক্ষেপে একটু বলি। একদিন যিনি যৌবনে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, সেই মানুষটিই হাঁটছেন ইতিহাসের পথ ধরে। সংগ্রহ করতে তৎপর হয়ে উঠেছেন "তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের" ইতিহাস রচনার জন্য মাল-মশলা সংগ্রহ করতে। ভাবতে বড় আশ্চর্য লাগে, সেই সংগ্রামী বিপ্লবী মানুষটি কেমন করে হয়ে উঠলেন ইতিহাস প্রেমী দাদার অবচেতন মনে সেই উদ্বোধক মানুষটির কথা আজ কি মনে পড়ে।

তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ভবিষ্যতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন কোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করবেন। লিখবেন যে যার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব হবে না সাধারণ কাঠামো বস্তুটিকে এড়ান। কারণ, বিশেষ মানুষগুলি স্থান এবং কালের কাঠামোতেই ধরা থাকে।

আজ দাদা যদি অশেষ কষ্ট স্বীকার করে এইসব তথ্য সংগ্রহ করে রেখে না যেতেন, তাহলে কোন ঐতিহাসিকের উপাদানই সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না। এই কাজে নেমেই তিনি প্রথমে জোর দিলেন তথ্য সংগ্রহ করার উপর। এখনো যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামী বেঁচে রয়েছেন, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে টেপ করে ধরে রাখলেন তাঁদের কণ্ঠস্বর। কোথায় কি নিদর্শন আজো আছে আরম্ভ করলেন সে সব সংগ্রহ করতে। সংগ্রামের স্থানগুলিকে খুঁজে গ্রহণ করতে লাগলেন সে সব স্থানের আলোকচিত্র। এমনি ভাবে গ্রামে গ্রামে চললো প্রকৃত জাত ঐতিহাসিকের মত ক্ষেত্রানুসন্ধান। একেবারে প্রাণমন সমর্পণ করলেন। দেশের মানুষের মধ্যে যেন এল ইতিহাস চর্চার গণ জাগরণ। মানুষকে ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করে তুললেন। স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন করেছিলেন, এবার ইতিহাসের জন্য আন্দোলন।

এই আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়, বিভিন্ন কার্যক্রম দেখছি কাছে থেকে আজ ১৫ বছর ধরে। এর পূর্বের দেখা ছিল দূরে থেকে। সে দেখা আর এই দেখার মধ্যে আসমান জমিন ফারাক।

তৈরী করলেন ইতিহাস কমিটি। ইতিহাস লেখাও হল। কিন্তু ছাপা হবে কেমন করে। অর্থ কোথায়। সে উপায়ও দাদা বের করলেন নিজের মাথা থেকে। যাঁরা একদিন তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, হাজির হলেন তাঁদেরই দুয়ারে। আজ আর তাঁকে কেউ শুধু হাতে ফেরালেন না। শতশত লোক হলো ইতিহাস কমিটির আজীবন সদস্য। দেখতে দেখতে হাজার হাজার টাকা সংগৃহীত হল। একদিন প্রকাশিত হল 'সর্বাধিনায়ক'। সেই বই-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান হল দিল্লীতে। প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী করলেন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। দেশের বিভিন্ন সংবাদ পত্রে সংবাদ বেরুল। সাড়া পড়ে গেল চতুর্দিকে।

সর্বাধিনায়ক সতীশদা হলেন অমৃতলোক যাত্রী। যোগ্য শিষ্য শুধু নয়, যোগ্য পুত্রের মত করলেন বিভিন্ন স্থানে মহাড়ম্বরে শ্রাদ্ধ নয় শ্রদ্ধা বাসর। সতীশদার মনের শেষ বাসনাও পূর্ণ করলেন। হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। লক্ষাধিক টাকা তুললেন দেশবাসীর কাছ থেকেই।

আমি বিপুল বিস্ময়ে দেখি আর ভাবি কি অগাধ আত্মবিশ্বাস আর অসাধারণ অধ্যাবসায় ও কর্মক্ষমতা। দাদার মত এমন নিঃস্ব গরীব ভূ-ভারতে বুঝি আর একজনও নেই, আবার দাদার মত ধনী শুধু নয় সমৃদ্ধ ধনী আর একটিও ত চোখে পড়ল না।

৮৫টি বসন্ত অতিক্রম করে আজো চলেছেন যৌবনের বিজয় কেতন কাঁধে করে। মনে পড়ছে ডাঃ জানার একটি সহাস্য উক্তি। 'সুশীলবাবুর শরীর যে রকম শক্ত হয়েছে অপারেশনের পর, সেভাবে উনি মেনে চলছেন ডাক্তারের নির্দেশ, এখন দেবদূত গেব্রিয়েল এলেও ফিরে যাবেন নত মুখে।' তাই হোক, সত্য হোক ডাঃ জানার ভবিষ্যৎ বাণী।

দাদা যৌবনের বিজয় ধ্বজা এনে পুঁতেছেন নিমতৌড়ির কাছে শহীদ স্মৃতি-সৌধে। গড়ে তুলছেন কীর্তি-স্তম্ভ। এই সৌধ হবে চৌতল। তৈরী করতে খরচ প্রাথমিকভাবে গোড়াতে ধরা হয়েছিল প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা। ক্রমে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে বাড়তে এখন প্রায় ৫০ লক্ষের কাছা-কাছি এসে পৌঁচেছে। ত্রিতলের কাজ শেষ হতে চলেছে। এত টাকা এলো কোথা থেকে। দাদা কিন্তু গেলেন না সরকারের দরজায় ধন্না দিতে। সেই ফকিরের গল্পের মত। একবার এক ফকির গিয়েছিল শাহানশা আকবরের কাছে কিছু সাহায্য চাইতে। বাদশা তখন মসজিদে নামাজ করছেন। নামাজ শেষে আকবর বলছেন--'হে আল্লা, আমায় ধন দাও, দৌলত দাও।' শুনেই ফকির মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়তে চাইলেন। এই না দেখে বাদশা তাঁকে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। বেরিয়ে এসে জিগ্গেস করলেন—"ফকির কেনই বা এসেছিল, এখন কিছু না বলে ফিরে যাচ্ছেই বা কেন।" ফকির বল্লে—আমি ভিখেরী, কিন্তু দেখছি আপনি আমার থেকেও বড় ভিখেরী। আপনি চাইছেন আল্লার কাছে ধন দৌলত; কিছু সাহায্য চাইতে এসেছিলাম আপনার কাছে, আপনিও দেখছি সাহায্য চাইছেন। তাই ভাবলাম, টাকা কড়ি যদি চাইতেই হয়, তাহলে যাঁর কাছে আপনি চাইছেন, আমি চাইব তাঁরই কাছে।

দাদা চল্লেন সেই গণদেবতাদের দুয়ারে দুয়ারে। কি অদ্ভুত দুরন্ত ভিখেরী। ভিক্ষের ঝুলি তাঁর অপূর্ণ রইল না। দেখতে দেখতে তিনি অসাধ্য সাধন করে চলেছেন। তাঁর গায়ে এখন আর পার্টির গন্ধ নেই। তিনি সকল রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের ডেকে এনে বসিয়েছেন এক আসনে। কেটে গেছে মত বৈষম্য। রাজনৈতিক দলগুলোই দেশটাকে নিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামের দরজায়।

ক্ষুণ্ণ করছে জাতীয় সংহতি। জাগিয়ে তুলছে সাম্প্রদায়িক বিভেদ। দাদা মুখ না খুলে মুখ বুজে যেন বলছেন—এস আমরা সব কিছু ভুলে দেশ জননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করি। তাতেই হবে দেশের মঙ্গল।

কি হবে শহীদ-স্মৃতি-সৌধে? এ সৌধ তমলুকবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বর্ণ স্বাক্ষর হয়ে বিরাজ করবে সগৌরবে। দেখে উদ্বুদ্ধ হবে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ। তারা নিজেকে নিয়োগ করবে দেশ সেবায়। থাকবে পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। গবেষণা করবে গবেষকগণ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়বস্তু নিয়ে। একই বিপ্লবের ইতিহাসকে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারেন। ঠিক ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস রচনার মত। হয়ত একদিন এই স্মৃতি-সৌধে গবেষণা করে ঐতিহাসিক লেফেভ্‌র, সবুল (Soboul), লাব্রুস (Labrousse), কব (Copp), আর্থার ইয়ং, গিজো (Guizot), তিয়ের (Thiers), মিন্যে (Mignet), কার্লাইলের মত বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ আত্মপ্রকাশ করবেন। আবার হয়ত জুল মিশ্‌লের মত ঐতিহাসিক এসে বল্‌বেন, সবার সব গবেষণা নস্যাৎ করে লিখবেন "আমার হল প্রথম সাধারণতন্ত্রী ইতিহাস যা সব প্রতিমা ও দেবতাকে ধ্বংস করেছে, প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত এর একমাত্র নায়ক—জনগণ"।

কেউ বা খুঁজবেন এই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান আর এই মাটির অধিবাসীদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে। খুঁজে হন্যে হবেন কোথায় গেল সেই দুর্দান্ত দামাল জাতি, যারা একদিন খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল দক্ষিণ ভারতে তামিলনাদ কিংবা চিনে নতুন সাম্রাজ্য। সেই জাতির উত্তর পুরুষগণই কি আজকের সংগ্রামী মাহিষ্য জাতি, তাম্রলিপ্ত স্বাধীন জাতীয় সরকার গঠনে যাঁরা ছিলেন প্রধান অংশীদার।

ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে সত্যানুসন্ধানই ঐতিহাসিকের ধর্ম। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকগণ যাতে সেই সত্যানুসন্ধানই করতে পারেন সেই চেষ্টাই করছেন সুশীলদা। তিনি রেখে যাচ্ছেন ঐতিহাসিক নিদর্শন শহীদ-স্মৃতি-সৌধে। সেই নেপোলিয়নের রোজেটা পাথর সংগ্রহ করে রাখার মত। নিজে প্রত্নতাত্ত্বিক না হয়েও ছিলেন প্রত্নপ্রেমী। তাঁর সেই সংগৃহীত রোজেটা পাথর থেকেই উত্তরকালে সম্ভব হয়েছে মিশরীয় লিপি পাঠ। ঠিক তেমনি হয়ত একদিন সুশীলদার সংগৃহীত ও সংরক্ষিত ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি প্রকৃত সত্যানুসন্ধানে ঐতিহাসিকদের সাহায্য করবে।

'রত্নদধির' মত এখানের গ্রন্থাগার একদিন হয়ে উঠবে মহামূল্যবান। ছুটে আসবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে গবেষণা করার জন্য গবেষকবৃন্দ। কি মহান ও বিশাল পরিকল্পনা ; ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কিছু কিছু সংগৃহীত হয়েছে। অদূরে ভবিষ্যতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে এই গ্রন্থাগার। আবেদন পাঠান হচ্ছে বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে।

মানুষ সুশীলদা কেমন সেই প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলে এই প্রবন্ধের শেষ করতে চাই। অতিথিপরায়ণ এই মানুষটি অন্য যে কোন নেতা বা স্বাধীনতা সংগ্রামীর চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। অতিথি আপ্যায়ণ করতে দাদার জুড়ি মেলা ভার। প্রথম এঁর আন্তরিক আতিথেয়তার পরিচয় পাই শ্রদ্ধেয় বিনয়দার (নাগ) মেয়ের বিয়েতে ঘাসিপুরে। শুধু পরিবেশন নয়, খাওয়ার আসন থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি মানুষের প্রতি কি সতর্ক আন্তরিক দৃষ্টি। কে কোন্ ব্যঞ্জন খেতে ভালবাসে তা তিনি খাদ্য গ্রহণকারীকে খেতে দেখেই বুঝতে পারেন। প্রতি পংক্তিতে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করেন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে।

ভীষণ সৌখিন ও মার্জিত রুচির মানুষ। জরুরী অবস্থায় বিখ্যাত সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত ও দাদা যখন একসঙ্গে জেলে আটক ছিলেন, সেই সময়ের কথা বেরিয়ে এসে আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখেছিলেন বরুণ সেনগুপ্ত। "সুশীল বাবুর সঙ্গে জেল বাস করে আমার কোন অসুবিধাই হয়নি। ওঁর মত নেতা খুব কমই দেখেছি। জেল সুপার ওঁর দাপটে সর্বদা তটস্থ থাকতেন। যখন যা প্রয়োজন, পেয়েছি সবই।" জেলে কিভাবে গড়ে তুলেছিলেন সুন্দর বাগান, সে কথা 'প্রবাহ' পাঠক মাত্রই অবগত আছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা হয়েও মানুষকে বিশ্বাস করেন একান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে। একবার এক সভায় বলেছিলেন, "মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকতে হয় সেও ভাল কিন্তু অবিশ্বাস করে জয়লাভে কোন আনন্দ নেই।" এই বাণীর সত্যতা আমি অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি।

অধ্যবসায়ী শুধু নন, প্রচণ্ড রকমের আত্মবিশ্বাসী। ফলে নিদারুণ পরাজয়কে হাসিমুখে গ্রহণ করেন আশ্চর্য নিষ্ঠার সঙ্গে। ওঁর এই দৃঢ় মানসিক শক্তি দেখে স্মরণে আসে স্বামীজীর সেই বিখ্যাত উক্তি—"যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিক, আর যে নিজেকে বিশ্বাস করে সেই আস্তিক।"

যে মানুষটি শত দেশদ্রোহী ইংরেজের গুপ্তচরকে গুম খুন করেছেন, সেই

মানুষটির হৃদয় কি অসাধারণ কোমল, ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। তের বছর বয়সে ভোলা কুকুরের দুর্দশার কাহিনী দাদা লিখেছেন কি আন্তরিক বেদনাপূর্ণ দরদ দিয়ে (প্রবাহ, ১ম সং, পৃঃ ১৭) পড়তে পড়তে দরদী শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের সেই কুকুরটির কথা মনে পড়ে। আজো এই পরিণত বয়সে মহিষাদলের বাড়িতে সেই সাদা বিড়ালটিকে যখন বুকে করে আদর করেন, তখন আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি।

দাদার বন্ধু-প্রীতির তুলনা হয় না। কোন স্বাধীনতা সংগ্রামী সহ-যোদ্ধার অসুখ-বেসুখের খবর পেলে আজো এই ৮৫ বছর বয়সেও উনি ছুটে যান তার রোগ-শয্যার পাশে।

রোগশয্যা ছাড়া বিশ্রাম করতে ও'কে দেখলাম না কখনো। সর্বদা কর্মব্যস্ত এই মানুষটি কোন না কোন কাজ করছেন সর্বদাই। সময়ের যে কি দাম এ'র সঙ্গে না মিশলে ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। মিথ্যে আড্ডা দিতে দাদাকে দেখলাম না কোন দিন। নিতান্ত অলস ব্যক্তিত্ব এ'র কাছে এলে হয়ে উঠেন কর্মঠ। কর্মী হওয়ার মন্ত্রে যদি দীক্ষা নিতে হয়, দাদাকেই নিতে হবে গুরুপদে বরণ করে।

আজো এই ৮৫ বছর বয়সেও কোন সভায় আমন্ত্রণ পেলে কাওকে হতাশ করে ফেরান না। যুবকদের ডাকে সাড়া দেন সর্বাগ্রে। শুধু তাই নয়, হাজির হন যথা সময়ে। বেশ কয়েকটি সভায় ও'র নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিতি দেখে কর্তৃপক্ষগণ বিস্মিত হয়েছিলেন। আজকের দিনে অতিথিদের সময়জ্ঞান প্রায়ই থাকে না। অনেকে আবার কথা দিয়েও আসেন না। দাদার আদর্শ ও দায়িত্বজ্ঞান যে কত প্রখর না দেখলে ঠিক বোঝান যায় না।

দাদার লেখা সাহিত্যের আজো মূল্যায়ন হয়নি। দাদার কবিতা, প্রবন্ধ, বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাষণ নিয়ে ভিন্ন একটি সমৃদ্ধ প্রবন্ধ লেখা যায়। সেখানে দাদাকে আমরা খুঁজে পাব আর এক ভিন্ন রূপে। একাধারে তিনি কবি ও প্রাবন্ধিক, আবার সমাজ-সংগঠকও।

সুশীলদাকে যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিদ্যুৎ বাহিনীর অধিনায়ক বা আর কোন ঋদ্ধ আখ্যায় অভিহিত করেন করুন, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। আমি দাদাকে দেখছি একজন বীর জীবন-সংগ্রামী রূপে। যদি জীবনকে আস্বাদন করতে হয়, করতে হবে সংগ্রাম করেই। জীবন মানেই সংগ্রাম, সংগ্রামের আর এক নাম জীবন। আর সুশীলদার সংগ্রামী জীবনের বাণী হল কর্ম। কর্ম সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।

৫

সাধারণ মানুষের অসাধারণ নেতা

সুশীল কুমার

নিমাই সাধন বসু

যাঁরা ইতিহাস চর্চা ও গবেষণা করেন তাঁদের পক্ষে কোনো সমসাময়িক, মূলতঃ রাজনৈতিক, ব্যক্তি সম্পর্কে লেখা ও তাঁর মূল্যায়ন করার অসুবিধা আছে। আর, যদি ঐ মানুষটি জীবিত থাকেন ও তাঁর সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত পরিচয় থাকে তাহলে কাজটি আরো কঠিন হয়ে পড়ে। সময়ের দূরত্ব সঠিক ঐতিহাসিক মূল্যায়নের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই কারণেই আমার পক্ষে শ্রীসুশীল কুমার ধাড়া সম্পর্কে কিছু লেখা সহজ নয়। শ্রীসুশীল কুমার ধাড়ার খুব কাছের মানুষ আমি নই। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল প্রায় দশ বছর আগে। তারপর দেখা ও কথাবার্তা হয়েছে কয়েকবার। আলোচনা হয়েছে তমলুক তথা মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার এক পরিকল্পনা নিয়ে। তখন তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। কোনোরকম রাজনৈতিক আলোচনা, তর্ক-বিতর্কে তাঁর উৎসাহ নেই। ইতিহাস সচেতন এক মানুষ, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্জ্বল অধ্যায় যাতে না বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষ ভুলে যায় তার জন্যেই তাঁর উদ্বেগ। নিজে তিনি ঐ ইতিহাসের এক বড় নায়ক। কিন্তু কোনো অসতর্ক মুহূর্তেও তাঁকে নিজের কথা, নিজের ভূমিকার কথা উল্লেখ পর্যন্ত করতে শুনিনি। বড় মাপের নেতারা ছাড়াও, অজানা অচেনা প্রায় বিস্মৃত ও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হাজার হাজার সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে যে যে ভাবে যোগ দিয়েছিলো, সবকিছু কষ্ট স্বীকার করেছিলেন, জীবন, মান-সম্মান, সব সুযোগ সুবিধা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক সুখ ত্যাগ করেছিলেন সেই কাহিনী যেন তথ্য ভিত্তিক ভাবে লিপিবদ্ধ হয় এই ছিল তাঁর লক্ষ্য— ধ্যান-জ্ঞান বললেও অত্যুক্তি হবে না।

আমি তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। যতদূর মনে পড়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার সহকর্মী ড. শাশ্বতীপ্রসাদ বাগ আমার সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ করেন। তিনি ইতিহাস রচনার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বলেন যে সুশীলবাবু ও আরো কয়েকজন আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী। তারপর ওঁর

সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ ও কথাবার্তা হয়। স্থির হয় যে, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নিশীথরঞ্জন রায়ের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলা খুবই জরুরি। নিশীথবাবু তখন কলকাতার Institute of Historical Studies-এর Director। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা ও তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে তার আগ্রহ ও উৎসাহ সীমাহীন। এরপর একদিন ওদের নিয়ে গেলাম থিয়েটার রোডে Institute of Historical Studies-এর কার্যালয়ে। নিশীথবাবুর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হল। পরিকল্পনা ও কর্মসূচী এবং পদ্ধতি স্থির হল। সূচনা হল এক বড় পরিকল্পনার। সুশীলবাবুর চোখে মুখে দেখলাম আনন্দ, উত্তেজনা ও স্বপ্ন সফল হবার সম্ভাবনায় গভীর তৃপ্তি। সেদিনের উদ্যোগ আয়োজন কতটা সার্থক হয়েছিল তার প্রমাণ পরবর্তী কালের প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ। ঐ ইতিহাস দীর্ঘায়িত করা অনাবশ্যক। কিন্তু দু'একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়। কেন না, ঐ ছোটখাটো ঘটনাগুলিই আমাকে সুশীল কুমার ধাড়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অসাধারণ মনোবল ও সংকল্পের দৃঢ়তার ইঙ্গিত দিয়েছিল।

যে কোনো পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল অর্থের। স্থির হয়েছিল যে, দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, Indian Council for Historical Research প্রভৃতি সংস্থা থেকে আর্থিক অনুদানের চেষ্টা করতে হবে। তারই সঙ্গে আমি সুশীলবাবুকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, সরকারী অনুদান সংগ্রহ করা খুব সহজসাধ্য নয়। শুনে সুশীলবাবু একগাল হেসে বলেছিলেন, 'ঐ নিয়ে আমি ভাবি না। আমি বারবার যাব। অফিসে ধর্ণা দেব। আমাকে সহজে ফেরাতে পারবে না। আমি কিছু ধরলে হাল ছাড়ি না। আমার পরিচিত সাংসদ যাঁরা আছেন তাদের বলব, ধরব। এই কাজ করতেই হবে। আপনারা শুধু নির্দেশ ও উপদেশ দিন কি করতে হবে না হবে। তারপর আমরা যা করার করব।' আমি জানিনা শেষ পর্যন্ত সুশীলবাবু কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কতটা আর্থিক অনুদান পেয়েছিলেন তমলুকের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা ও তথ্য সংগ্রহের জন্যে। কর্মসূত্রে শান্তিনিকেতনে চলে যেতে হওয়ায় আমি খুব বেশী সহায়তা করতে পারিনি। কিন্তু পরিকল্পনার অনেকটাই রূপায়িত হয়েছিল এবং হচ্ছে তা জেনেছি।

শ্রীসুশীল কুমার ধাড়াকে কিন্তু আমি এরও অনেক আগে একবার দেখেছিলাম। আমাদের হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের বাড়িতে। একদিন সন্ধ্যায় কলেজ থেকে ফিরে দেখি বাড়ির ওপরের বৈঠকখানায় কয়েকজন এসেছেন। আমার মেজদাদা

দেবসাধন বসুর সঙ্গে তাঁরা কোনো বিষয়ে আলোচনা করছেন। আলোচনার মধ্যমণি হচ্ছেন অতিসাধারণ সাজ-পোষাক পরা একজন মানুষ। দেখে মনে হবে গ্রামের মানুষ। শহুরে শিক্ষিত মানুষের ভাষায় মোটেই 'Sophisticated' নন। সে রকম কেউ কেটা বলে মনেই হয় না। একটু পরে মেজদা বাইরে এসে জানাল, 'জানিস কে এসেছেন? সুশীল ধাড়া, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পবাণিজ্য মন্ত্রী!' শুনে কিছুটা অবাক হলাম। একজন ক্ষমতাশালী মন্ত্রী এসেছেন। কিন্তু ঠাটবাটে তো কিছু বোঝা যায় না! তবে খুব বেশি অবাক হইনি। কেননা সুশীল ধাড়া সম্বন্ধে একটা ধারণা আমার জন্মেছিল সেই স্কুল জীবন থেকে। যখন '৪২ এর আন্দোলন হয় তখন আমি নেহাতই কিশোর। তবুও বহু কাহিনী শুনতাম বাড়িতে, বড়দের কাছে, স্কুলে মাস্টার মশাইদের কাছে। কিছু কিছু কাগজ পড়েও। তখনি শুনেছিলাম তমলুক ও মেদিনীপুরের 'স্বাধীন সরকার' গঠনের কথা। অসীম সাহস ও বীরত্বের গল্প, ইংরাজদের অত্যাচারের কথা সেই সময়ই সুশীল কুমার ধাড়ার নামও শুনেছিলাম।

এ তো গেল ব্যক্তিগত আলাপ, পরিচয়, প্রসঙ্গ ও কিছুটা পুরানো দিনের কথা। কিন্তু এর থেকেই মানুষটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যায়। বর্তমান কালে দেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক মানুষদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও আস্থা সাধারণ মানুষের মধ্যে নেই বললেই চলে। কিছু কিছু বিরল ব্যক্তিত্ব ছাড়া জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্তরের রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধে সংশয় ও প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেয়। রাজনীতি করার অর্থই হল নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা এবং আখের গুছিয়ে নেওয়া-এমন একটি বিশ্বাস ব্যাপক হয়ে পড়েছে। এই রকম অবিশ্বাস ও অনাস্থার মনোভাব মোটেই কাম্য নয়। সমগ্র দেশ ও জাতির পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। অনেক ক্ষেত্রেই এই সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। কিংবা চরিত্র হননের চেষ্টা মাত্র। তবুও রাজনৈতিক জীবন, সাফল্য ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নৈতিক আদর্শ ও সততার সম্পর্ক ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়ছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। সুশীল ধাড়ার মতো মানুষ-এর ব্যতিক্রম। যখন তিনি '৪২-এর আন্দোলনের সময় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যখন জনজীবনে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাবান হয়েছেন তখনও ক্ষমতা ও মর্যাদা তাঁর ব্যক্তি-জীবন ও আচার-আচরণকে স্পর্শ করতে পারেনি। একান্তভাবেই তিনি থেকেছেন মানুষের মধ্যে, তাদেরই একজন হয়ে। বিত্ত বা বৈভব তাঁর জীবনে আসেনি। তাঁর সমালোচকরাও এই সত্যটি অস্বীকার করতে পারেন নি। এটি কম কথা নয়।

রাজনীতিতে উচ্চ নৈতিক আদর্শ ও মানের প্রশ্নটি গান্ধীজীর জীবন এবং আদর্শের সঙ্গে জনমানসে যুক্ত। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন আসে—সুশীল কুমার ধাড়া কী প্রকৃত অর্থে গান্ধীবাদী ছিলেন? তঁার সহজ সরল জীবন যাত্রা, মূল্যবোধের উৎস কি ছিলেন গান্ধীজী? প্রশ্নটি জটিল। এর উত্তরও সহজে দেওয়া যাবে না। বৃহত্তর একটি প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্নটি জড়িত। প্রচলিত অর্থে গান্ধীজী ছিলেন অহিংস আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক, সর্বাধিনায়কও বলা চলে। আর বিপ্লবী আন্দোলন ছিল অহিংস আন্দোলনের মত ও পথের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু এরকম একটি মেরুকরণ যে মোটেই সম্পূর্ণ নিভুল নয় তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সুশীল কুমার ধাড়ার রাজনৈতিক আদর্শ ও জীবন তার এক উদাহরণ। ইংরাজীতে বলা যেতে পারে (ঐতিহাসিক বা চিকিৎসকদের পরিভাষায়) 'interesting case study'। আমার মনে হয় বিষয়টি নিয়ে গবেষণার ভাল সুযোগ রয়েছে। সুশীলবাবুর মতো মানুষদের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে ওঁর লেখা আত্মজীবনীমূলক 'প্রবাহ' গ্রন্থটির কথা। এই রকম গ্রন্থগুলি ইতিহাস রচনার মৌলিক উপাদান। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকদের ক'জন এই জাতীয় তথ্য ব্যবহার করেছেন বা করেন? বিদেশে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে যত লেখা হয়েছে তার ক'টির পাদটীকায় প্রবাহ বা ঐ রকম অন্যান্য গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে? এমন কি বাঙালী ঐতিহাসিকদের মধ্যে ক'জন মৌলিক উপাদানরূপে এই তথ্য ব্যবহার করেছেন? ভারতবর্ষের কথা বাদই দিলাম। পশ্চিমবঙ্গের কটি গ্রন্থাগারে (এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে) এই রকম বই পাওয়া যাবে? কিন্তু যখন 'নীচের তলা থেকে' ইতিহাসের অনুসন্ধানের কথা বলা হচ্ছে তখন এই বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

তমলুকের 'জাতীয় সরকার' স্থাপনের তাৎপর্য ও সামগ্রিকভাবে '৪২ এর আন্দোলন তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর এর প্রভাব ও স্থায়ী ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই রকম প্রশ্ন দুঃখজনক। এই নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে আলোচনার অবকাশ নেই। শুধু একটি প্রসঙ্গ তোলা বোধ হয় অসমীচীন হবে না। রবীন্দ্রনাথ যখন শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন, গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বনির্ভরতা-বোধ ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মনোবল সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন তখন অনেকেই পরিহাস করেছিলেন।

তাঁর প্রচেষ্টার গুরুত্ব দেন নি। তাঁদের যুক্তি ছিল ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশের, কোটি কোটি গ্রামের আর্থিক পুনর্বাসন ও উন্নয়নের সমস্যার পটভূমিতে শ্রীনিকেতন পরীক্ষা' (Sriniketan Experiment)-র মূল্য কতটুকু ? কীই বা তার প্রভাব পড়তে পারে ! কিন্তু আজ সারা বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রচেষ্টার গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। উন্নতিশীল দেশগুলির প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদরা যে কথা বলেন রবীন্দ্রনাথ প্রায় একশত বছর পূর্বে তা বলেছিলেন। হাতে-নাতে পরীক্ষা করেছিলেন, তারপর সেই কথাগুলোই বলেছেন। সারা বিশ্ব তা মেনে নিচ্ছে। ঠিক তেমনি রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রেও বিরাট পটভূমিতে বহু দূরাঞ্চলে, প্রচার-মাধ্যমের প্রায় অগোচরে এমন অনেক আন্দোলন, রক্তক্ষয়ী কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রাম শুরু হয়েছিল যা কালক্রমে একটি দেশ ও জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তমলুকের সংগ্রাম সেই আলোকে দেখাই হবে যুক্তিযুক্ত ও বলপ্রসূ।

সুশীল কুমার ধাড়ার অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে যে সংকলন গ্রন্থটি (চির তরুণ বিপ্লবী সুশীল কুমার) প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু কিছু লেখা পড়ে বিস্মিত হতে হয়। প্রায় অর্ধশত বছর পরে তাদের লেখায় '৪২-এর আন্দোলনে তাঁর সহকর্মীরা যেভাবে তাদের 'বড় সাহেব' 'দাদা' বা 'দাদি'র স্মৃতিচারণ করেছেন, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তা চিত্তস্পর্শী। খুব কম জন নেতার ভাগ্যেই এমন অন্তরের শ্রদ্ধা-ভালবাসা জুটবে পঞ্চাশ বছর পরে। সুশীল কুমার ধাড়া সেই বিচারে সত্যিই অসাধারণ।

৬

সুশীল কুমার ধাড়া প্রসঙ্গে ঃ ব্যক্তি বনাম ইতিহাস

গৌতম ভদ্র

সুশীল কুমার ধাড়ার সঙ্গে আমার কোন রকম পরিচয় নেই। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের অনুগামীও আমি নই। তাঁর প্রজন্মের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার প্রজন্মের অভিজ্ঞতার পার্থক্যও প্রচুর। আমার গবেষণার বিষয়ও আধুনিক ভারত বা জাতীয় আন্দোলন নয়। অনেকটা 'নির্ধারিত-শিল্পীর' অনুপস্থিতিতে, প্রবীণ সহকর্মী ও বয়স্ক ব্যক্তিদের অনুরোধে লেখাটি লিখতে হচ্ছে। আমার অধিকার কতটা আছে, সে বিষয়ে আমি নিজেই সংশয়মুক্ত নই। ফলে মূল্যহীন বলে যে কেউ রচনাটি বাতিল করার হক রাখেন।

৪২-এর আন্দোলন নিয়ে এই সময়ে নতুন কিছু লেখার ও প্রয়োজন নেই। তাঁর আত্মজীবনী 'প্রবাহ' (প্রথম খণ্ড), ২য় সংস্করণ কলিকাতা '৯০ এবং প্রয়াত ঐতিহাসিক হিতেশরঞ্জন সান্যাল-এর অনুপম প্রবন্ধ (মেদিনীপুর জেলায় 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' স্বরাজের পথে, কলিকাতা, ১৯৮৪)-তে আন্দোলনের অনুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত লেখা হয়েছে। সুশীল কুমারের অশীতিতম জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত গ্রন্থ 'চির তরুণ বিপ্লবী সুশীল কুমার' কলিকাতা, ১৯৮৪-তেও নানা তথ্য সংকলিত হয়েছে। ফলে কোন কিছুর সংযোজন আমার সাধ্যাতীত। তিনি 'গড়ে-ওঠা মানুষ,' জন্ম প্রতিভাদের নন। 'কাজ আর কাজ'-এতেই তাঁর জীবন আবদ্ধ। এই জীবনকে তিনি দুই ভাগে ভাগ করেছেন, 'রাজনৈতিক ও সেবার জীবন।' (প্রবাহ, ভূমিকা) এই রাজনীতির সূত্র ছড়িয়ে আছে নানা স্তরে ; ৪২-এর আন্দোলনে মেদিনীপুরে 'জাতীয় সরকার পরিচালনায়', ১৯৪৪-তে বাংলা কংগ্রেস গড়ে তোলার উদ্যোগে, ১৯৪৪ সালে জনতা পার্টি তৈরী হবার প্রক্রিয়ায় তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় আছে। অপর পক্ষে তিনি গান্ধীবাদী। ১৯৪৭ সালের পর থেকে বাগদা-তাজপুর-রাজারামপুর অঞ্চলে তিনি গড়ে তুলেছিলেন গ্রামোন্নয়ন-এর জন্য নানা কর্মসূচী। কুটির শিল্পের নানা কর্মকাণ্ডের

পাশাপাশি তৈরী হয়েছিল মাতৃসদন-এর মত কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। অথচ এইসব প্রতিষ্ঠান-এর পরিণতি সম্পর্কে জনৈকের অধুনা মন্তব্য হল 'খাদির সেদিনের রমরমা অবস্থা আজ আর নেই।' পূর্বেই বলেছি মাতৃভবনের কাজ আজ বন্ধ। 'কুটির শিল্পগুলি প্রায় বন্ধ।' (চির তরুণ বিপ্লবী সুশীল কুমার, পৃঃ ১৭৩)। তাঁর শেষ জীবনের প্রকল্প 'তমলুক আন্দোলনের তথ্য ভাণ্ডার'টি আজকে দিল্লীর সরকারী প্রতিষ্ঠানের হেফাজতে রক্ষিত। 'লাইব্রেরী, বিদ্যালয় ও হাইস্কুল চলছে যথাযথ ভাবে কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলি যথারীতি সরকারী সাহায্য পায়।' সরকারী নির্ভরতা থেকে বেরনই স্বরাজের লক্ষ্য অথচ স্বরাজের সব উদ্যমই পর্যবসিত হয় সরকারী আনুকূল্যে, রাষ্ট্রের সর্বময়তায়।

আসলে ক্ষমতার প্রতি নিস্পৃহতা অথচ পরিস্থিতিতে ক্ষমতার প্রয়োগের টানাপোড়েনে আছে সুশীলবাবু অনুসৃত আদর্শের দ্বন্দ্ব। অঞ্চলের নেতা বারবার সর্বভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন, নিজের রাজনৈতিক শিক্ষাদাতাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভয় পান নি অথচ নিজের বক্তব্য আপাতজয়ী হয় নি। অহিংসাবাদী অথচ প্রয়োজনে পরিস্থিতিতে হিংসার আশ্রয় নিয়েছেন। ক্লৈবতা তাঁর কাম্য নয়, কিন্তু এই সমস্তই নিজ অভিজ্ঞতাজাত, ব্যক্তি মননসিদ্ধ। এইসব থেকে প্রবাহের সামগ্রিকতা প্রসঙ্গে কোন ধারণা জন্মায় না। একটি উদাহরণ দেওয়া থাক। আত্মজীবনীতে অবশ্যম্ভাবিরূপে কারাবাসের কথা আছে। ইংরাজ আমলের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে জরুরী অবস্থার কথাও বলা আছে। বার বার ধুয়ার মত এসেছে যে স্বাধীন ভারতেও কারাগারের অবস্থার উন্নতি হয়নি। অথচ স্বাধীনতার পরে ও জরুরী অবস্থার আগে সুশীলবাবু নানা দায়িত্বে ছিলেন, মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তিনি পরে নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জেনেছেন যে 'স্বাধীন' ভারতে বন্দীদের অবস্থার হেরফের হয় নি। এইটুকু জানতে তাঁকে নিজে বন্দী হতে হয়েছিল। 'স্বাধীন ভারতে' তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে কারাগারের অবস্থা নিয়ে আন্দোলন হয়েছে। আজকে সেই আন্দোলন জোরদার। এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতের জাতীয় রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে ওঠার সঙ্গে কারাগারের চরিত্র সংশ্লিষ্ট। এই জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াতে অনলস স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও সক্রিয় রাজনৈতিক সংগঠক হিসাবে গান্ধীবাদী সুশীলবাবুর দান অনস্বীকার্য। এই নিয়ে কোন সমীক্ষা কিন্তু তার আত্মকথায় এখনো নেই।

ফলতঃ ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও জাতীয় রাষ্ট্রের চরিত্রে ফারাক আছে। আধুনিক সমাজে রাষ্ট্র সবকিছু গ্রাস করতে চায়। রাজনীতির আঙ্গিনা থেকে

সেবাকার্যেও তার হাত চলে, তাকে বাদ দিয়ে চলা অসম্ভব। অথচ রাষ্ট্রের কাজের মধ্যে হিংসা ও ক্ষমতার সব দ্যোতনা থাকে, জড়িয়ে পড়লে আর নিস্তার নেই। আধুনিক ভারতে গান্ধীজী তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা এইখানে।

এইসব কথা সুশীলবাবুর অজানা নয়। তাই রাজনীতি থেকে সরে আসা, গঠনমূলক কাজ দানা না বাঁধায় ইতিহাসে অনুসন্ধান-এর মধ্যে আত্ম-সমীক্ষার ভাব, আত্মানুশীলনের সাধনা স্পষ্ট। কিন্তু প্রবাহের শেষ কোথায়? সাগরে না চোরাবালিতে? না কি প্রবাহের শেষ হয় না, কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না, বারবার তাঁকে খুঁজতে হয় নিজের মধ্যেই?

৭

দেশ-বরেণ্য সুশীলদা

শচীন্দ্র কুমার মাইতি

সুশীলদার সাথে প্রথমে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না, তবে আমাদের অধ্যাপক শিবপদ সেন আমাকে মেদিনীপুর কংগ্রেসীদের জীবনী লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'Who's who' ছাপানোর পরিকল্পনায় লিখতে হবে। অন্য সব জেলার ভার অন্য সব অধ্যাপকদের উপর ছিল। সেই প্রসঙ্গে জেলার নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল। আমার সঙ্গী ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী বনবিহারী দাস, যিনি ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক। প্রথমে দাদার সহকর্মী শ্রীগোপীনন্দন গোস্বামীর সাথে মহিষাদলে দেখা করি। তারপর সুশীলদার সঙ্গে কালীঘাটের বাসায় দেখা করি। এরও আগে ১৯৪২-এর আন্দোলনে যোগ দিই কাঁথি কলেজের সামনে আভাদির (মাইতি) জ্বালাময়ী বক্তৃতা শোনার পর। তখন আমি I. A. ক্লাসের ছাত্র ছিলাম। পরে আমরা ১৩ জন বেলবনী Officers' Training Camp-এ যোগ দিই। ক্যাম্পের Director ছিলেন শ্রী বলাই দাস মহাপাত্র ; রামনগর থানার অধিবাসী বলাইদার কাছে সুশীলদার অনেক প্রশংসা শুনেছি। তাঁর মতে সুশীলদার কর্মদক্ষতা ও সংগঠনের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ আমার নিজের অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। কাঁথি শহরের দক্ষিণে বেশ বড় অঞ্চল নিয়ে আমার খলিসাভাঙ্গা কংগ্রেস অফিস ছিল। আমার এক সহকর্মী ছিলেন শ্রী রাখালরাজ নন্দী। কাঁথির কংগ্রেস সংগঠন ও তমলুকের জাতীয় সরকার (দুটোর মধ্যে) অনেক তফাৎ তার একমাত্র কারণ সতীশদা-সুশীলদা-অজয়দার মত নেতার অভাব। বলাইদা সুবক্তা ছিলেন ; ভাল সংগঠক ছিলেন না। এ ব্যতীত অভাদি প্রবীরদার প্রায়ই দেখা পাওয়া যেতনা। তাঁরা জেলার বাইরেই প্রায় সময় ব্যস্ত থাকতেন। সুধীর দাস প্রভৃতির দূরদৃষ্টি ছিল না। যার ফলে সুশীলদা অজয়দার মত কেউই নেতৃত্ব দিতে পারেনি।

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, এ সংগ্রামে মেয়েদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী (যাদের আমি মায়েদের ভূমিকা বলে থাকি)। পেছন থেকে তাঁরাই সব কিছু করতেন, যেমন আমাদের লুকিয়ে রাখা, আহার বাসস্থান এমন কি পুলিশ এলে শতশত শাঁখ বাজিয়ে সাবধান করে দেওয়া ইত্যাদি সব কিছুই তাঁরা করতেন।

১৯৪২-এর বিধ্বংসী ঝড়ের পর দেশবরেণ্য শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এগিয়ে আসেন ও কাঁথিকে বাঁচিয়ে দেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী গ্রামের ভলেন্টিয়ারদের ভল্টু বলা হত। এই ভল্টুদের লেখাপড়ার জন্য কাঁথি শহরের উত্তরে 'শ্যামাপ্রসাদ বিদ্যার্থী' ভবন স্থাপিত হয়। সেখানে নিরাপদ আশ্রয়ে আমরা I. A ও B. A. পরীক্ষা দিতে পারি। এরপর আমি রাজনীতি ছেড়ে দিই।

আমার ধারণা সুশীলদা এতবড় দেশবরেণ্য নেতা হতে পেরেছিলেন তার পেছনে ছিল তাঁর অসীম মাতৃভক্তি, গর্ভধারিণী জননী ও দেশমাতৃকা ভারতভূমি তাঁর কাছে ছিল এক ও অদ্বিতীয়। এ প্রসঙ্গে আমার আর এক মহাপুরুষের কথা মনে পড়ে। তিনি ফ্রান্সের জগদ্বিখ্যাত নেপোলিয়ন (Napoleon, the Great)। সুশীলদাদের মত নেপোলিয়নের মায়েরও আটটি সন্তান ছিল। নেপোলিয়ন ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান। অল্প বয়সে তাঁদের পিতৃবিয়োগ হয় ও ইংরেজ বাহিনী তাঁদের বাসস্থান ক্রিটদ্বীপ অধিকার করে। ছোট এক নৌকাযোগে ওঁরা সব ফ্রান্সে চলে আসেন। ফ্রান্সে এসে নেপোলিয়ন সামান্য এক সৈনিকের চাকুরী নেন। নেপোলিয়নদের সংসারে বড় অভাব। মায়ের মুখে হাসি নেই। এজন্য তিনি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে যান, হঠাৎ তাঁর এক বাল্যবন্ধু তাঁকে বাঁচান। নেপোলিয়নের এই দিকগুলো ভালো করে তুলে ধরেছেন তাঁর এক জীবনীকার Bishop James Abbot—নেপোলিয়নের জীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সেনাবাহিনী গঠন ও পরিচালনা ছিল অপূর্ব। সুশীলদার বিদ্যুৎবাহিনী, গরম দল, ভগিনী সেনা, '৪২-এর মহিষাদল ও সুতাহাটা থানাতে ভল্টু সেনা পরিচালনা আমায় এইসব কথা মনে করিয়ে দেয়। এ ছাড়া সুশীলদা হিটলারের 'ঝটিকা বাহিনী', রোমেলের 'Middle East'-এ আফ্রিকার সৈন্য পরিচালনার আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন। দাদার সংগঠন কৌশল, দেশ শাসন পদ্ধতি আধুনিক জার্মানীর জনক বিসমার্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর লেখা আত্মজীবনীমূলক রচনা 'প্রবাহ' গ্রন্থটি ভাল করে পড়লাম। অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সহজ সরল করে লেখা। পড়ে মনে হ'ল (সাহিত্য চর্চা যদি তাঁর জীবনের স্বদেশ সাধনার মত অন্যতম সাধনা হত) তিনি একজন যশস্বী কথাশিল্পী হতে পারতেন। এখন বলতে হয়, 'প্রতিভা যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই সজীব করিয়া তুলে।'

এই মহৎ মানুষটি যেন একটি বিশেষ মহৎ কাজের জন্য নিবেদিত প্রাণ ও পরাধীন অবহেলিত দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের জেলা মেদিনীপুরে

তাই ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি স্বদেশিকতার মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়। তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় স্কুলের স্কাউট দলে যোগ দেন। কিন্তু বাধ সাধল সুশীলদা ; ব্রিটিশ রাজকে তোষণ করে 'God save the king' সঙ্গীত স্কাউট দলটিকে গাইতে হবে বলে। 'এ গান আমি গাইতে পারি না'—প্রতিবাদ জানিয়ে গানটি না গেয়ে দাদা স্কাউট দল থেকে বেরিয়ে চলে এলেন। কত কত শত ছাত্রের দল এল গেল—সবাই রাজভক্তির গান গাইল, শুধু সবার কণ্ঠে সুর মিলিয় রাজভক্তির গান গাইলেন না তিনি। তিনি স্কাউট দলের শিক্ষক অমৃতবাবু (মাইতি) ও সেকালের এই জেলার সেরা প্রধান শিক্ষক প্রয়াত শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী তাঁর অনমনীয় মনোভাবে হতাশ হলেন ; এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর পরবর্তী জীবনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এক মরণপণ সংগ্রামকে।

তাঁর পিতৃদেব তরেন্দ্রনাথ ধাড়া মহাশয় চাকুরী করতেন সরকারী অফিসে। সেদিনের চাকুরীর সুবাদে উপরওয়ালাদের ভেট দিতেন। কোর্টের মক্কেলদের কাছ থেকে ঘুষ (উপরি) নিতেন। এর ঘোর বিরোধী ছিলেন সুশীলদা। এইসব নানা কারণে তিনি ঘরছাড়া হলেন স্বদেশ জননীকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্যে। তিনি মানব সেবারকাজ শিখেছিলেন তমলুক রামকৃষ্ণ মিশনের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে। ছাত্রাবস্থায়ই মিশনের হয়ে ভিক্ষা করে জনসেবা করা ছিল তাঁর কাজ—যা পরবর্তী পর্য্যায়ে দেশ সেবার অঙ্গ হিসাবে দেখতে পাই। এখানে তিনি নিবেদিত-প্রাণ ছিলেন।

১৯৪২ খৃীষ্টাব্দের 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' আন্দোলন তুফান তুলল জাতীয় জীবনে জাতির জনক বাপুজীর আহ্বানে। ৮ই আগস্টের রাত্রির অন্ধকারে বাপুজী-সহ কারারুদ্ধ হলেন ভারতের সমস্ত জাতীয় নেতা। ভারতের সর্বত্রই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। মরণ পণ করল প্রতিটি ভারতবাসীই। এই চরম মুহূর্তে পিছিয়ে পড়ল না চির-সংগ্রামী মেদিনীপুরবাসী। জেলার নানা স্থানে শুরু হ'ল জন-বিক্ষোভ! সতীশ, সুশীল, অজয়দার নেতৃত্বে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণতি হ'ল তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম থানা। এই 'তাম্রলিপ্তত্রয়ী'র রাতে নিদ নেই, দিনে বিশ্রাম নেই। অত্যন্ত সংগোপনে ইংরেজ গোয়েন্দা বিভাগের চোখে ধূলি দিয়ে প্রতি গ্রামের সহস্র ভণ্টুকে সজাগ, সঙ্ঘবদ্ধ ও সচেতন করে রাখলেন। তাঁদের কাছে এ লড়াই দেশমাতৃকার মুক্তির লড়াই-মরণ-পণ লড়াই। এইভাবে এগিয়ে এল '৪২-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর। ঐ দিনটি হ'ল মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় দিন। অজয়দার

পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক হ'ল ঐ দিন বিকাল ৩টায় তমলুক মহকুমার থানা দখল করতে হবে, সব সরকারী অফিস দখল করতে হবে ও ধ্বংস করে দিতে হবে। তমলুক তথা ভারতের 'জোয়ান অব্ আর্ক' মাতঙ্গিনী দিদি (হাজরা) তমলুকে প্রাণ দিলেন পুলিশের গুলিতে। জাতীয় পতাকা বক্ষে ধরে নিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে শহীদ হলেন তিনি। এদিকে সুশীলদার ভূমিকা ছিল অন্য ধরণের, একটু অন্য ধরণের। তাঁর উপর ভার ছিল মহিষাদল ও সুতাহাটা থানার বাহিনী পরিচালনা। সে বাহিনী ক্লান্তিহীন শ্রম দিয়ে তিল তিল করে গড়ে ছিলেন তিনি। সে ছিল এক অজেয় সত্যাগ্রহী সেনাবাহিনী যা চরম আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল ব্রিটিশ সিংহের বিরুদ্ধে। এতে ছিল সেবা ও চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, নার্স এমন কি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়। বাকী সবাই ছিল অসমসাহসী বিদ্যুৎ বাহিনীর কর্মী দল। মহিষাদল রাজবাড়ীর জি সাহেব রাইফেলধারী সৈনা দিয়ে সুশীলদার পরিচালিত বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুলেটে ১৩ জন শহীদের মৃত্যু হয়। সামান্যের জন্য দৈব কৃপায় বেঁচে গেলেন সুদক্ষ সেনাপতি সুশীলদা।

এরপর অক্টোবরেই এল এক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়। সারা তমলুক ও কাঁথি মহকুমা বাণের জলে ডুবে গেল। বিরাট জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেল সব ঘরবাড়ি-গবাদি পশু-শস্যক্ষেত্র। ভাঙল জুনপুট অঞ্চলের নদী-বাঁধ। চারিদিকে জল-জল-শুধু জল। তমলুকে "মহেন্দ্র রিলিফ সোসাইটি" হল। সুশীলদার বাহিনী বাণে-ডোবা সর্বহারা মানুষের জীবন বাঁচাতে মরণ পণ শুরু করল। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা—শুধু আর্তের সেবা করা ও জীবন রক্ষা করা।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ। প্রতিষ্ঠিত হ'ল মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সরকার। তারই শাখা সরকার তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার—একেবারে জেলার ইংরেজ সরকারের সমান্তরাল সরকার। এই সমান্তরাল সরকারের কর্ণধার হলেন তাম্রলিপ্ত ত্রয়ী 'সতীশদা-অজয়দা-সুশীলদা'—স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও সমর বিভাগের মন্ত্রী হলেন সুশীলদা। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সুশীলদার নিজ হাতে গড়া সুশিক্ষিত বিদ্যুৎবাহিনী জাতীয় সরকারের সেনাবাহিনীরূপে নিযুক্ত হ'ল। এ ছাড়া তাঁর স্বহস্তে গড়া ভগিনী দল ও গরম দল (Action squad) কে জাতীয় সরকার প্রশাসন চালানোর জন্য স্বীকৃতি দিলেন। দাদার ছদ্মনাম হ'ল হীরা সিং; ওয়ার্দাতে শিক্ষণ প্রাপ্ত মণ্টুদি হলেন তাঁর একান্ত সচিব (P. A)। দাদার বহুমুখী প্রতিভার গুণে জনগণের মন কেড়ে নিল জাতীয় সরকার। ফলে ইংরেজ সরকার

হার মানতে বাধ্য হ'ল। সতীশদা-অজয়দা-সুশীলদা হলেন 'Uncrowned KINGS of Tamralipta Jatiya Sarkar'। অবশেষে অবসান হ'ল জাতীয় সরকারের বাপুজীর নির্দেশে। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অবলুপ্তি ঘটালেন নেতারা। পরে বাপুজীর নির্দেশানুযায়ী তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। এই আমাদের দেশ বরেণ্য সুশীলদা। যাঁরা তাঁর আত্মজীবনী 'প্রবাহ' গ্রন্থখানি পড়েছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন তাঁর সঙ্গে আগ্নেয়গিরির তুলনা হতে পারে। তাঁর জীবন সাধনা এক অনুপম দেশনায়কের বর্ণময় জীবন। যার প্রতিপদে বিপদ এমন কি মৃত্যুর সম্ভাবনা। পঁচাশী বছরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ঐ মৃত্যুর সম্ভাবনাকে ফাঁকি দিয়ে তাঁর জলদ গম্ভীর কণ্ঠ আজও যখন ধ্বনিত হতে শুনি "বিপ্লবীর" বাণী—

গৃহে গৃহে আজি দীপমালা জ্বালো,
নিশান উড়ায়ে হাঁক দিয়ে বলো,
'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই
মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই'।"

তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে নম্র প্রণামের নৈবেদ্য নিবেদন করে বলতে হয়
"হে দেশবরেণ্য বীর! লহ প্রণাম।"

৮

ঘরের মানুষ—দাদা

কুমুদিনী ডাকুয়া

প্রথমেই বলে রাখি আমি রোজ-নামচা লিখি না। এখন যা লিখব তা সমস্তই আমার স্মৃতি থেকে। তাই লেখার মধ্যে কিছু অসঙ্গতি থেকে যেতে পারে।

আমার বিবাহের পূর্বে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বা তাঁদের কার্যকলাপের সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় ছিল না। কিন্তু মজার ব্যাপার আমার বিবাহ হ'ল তখনকার দিনে সুতাহাটা থানার প্রখ্যাত এক স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীক্ষুদিরাম ডাকুয়ার সঙ্গে। যিনি স্কুল জীবন থেকে দাদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাঁর মুখ থেকেই প্রথম দাদার চরিত্রের বিস্তৃত বর্ণনা শুনে দেখার আগেই তাঁর প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েছিলাম এবং তাঁকে দেখার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এর অবসান ঘটল ১৯৪১ সালের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য ওঁর জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর। এর আগেই মহকুমার বিশিষ্ট নেতা যথা সতীশদা, কাকাবাবু (নীলমণি হাজরা), বিনয় বেরা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

১৯৪১ সালে একদিন বাড়ীতে খবর এল শ্রদ্ধেয় নেতা কুমারবাবু (কুমার চন্দ্র জানা)-র প্রতিষ্ঠিত গান্ধী আশ্রমে তাঁরই স্ত্রী চারু মাসীমা যেতে বলেছেন। কারণ কিছু বলেননি। আমি সন্ধ্যায় যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে দেখলাম—সুবোধবালা কুইতি, প্রভাবতী সিংহ, বাসন্তীবালা কর, বিধুমুখী বেরা প্রভৃতি আমার মত আরও কিছু কর্মী মহিলা উপস্থিত হয়েছেন। সেই সঙ্গে মহকুমার নেতৃস্থানীয় সতীশদা, কাকাবাবু, দাদা, বিনয়দাসহ সুতাহাটা থানার বিশিষ্ট কিছু কর্মী উপস্থিত হয়েছেন মাসীমার আহ্বানে। তখন সুতাহাটার জননেতা কুমারদা জেলে। এই প্রথম আমি দাদাকে দেখলাম। তখন দাদাও আমাকে চিনতেন না। সকলে বসার পর সকলকে ডেকে একত্র করার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে মাসীমা বললেন—সুবোধ ও প্রভাকে নিয়ে থানার মধ্যে কিভাবে কাজ করা যায় তারই পরামর্শ করার জন্য ডেকেছেন। অন্যান্য মেয়েদের ডাকার কারণ জানতে চাইলেন দাদা, মাসীমা জবাবে কিছু বলতে পারলেন না। মেয়েরা কি চায় তার উত্তরে

আমি বলেছিলাম—দেশকে স্বাধীন করার কাজে আমরা যাতে উপযুক্তভাবে সামিল হতে পারি তারই ব্যবস্থা করার কথা। এই প্রথম দাদার সঙ্গে আমার এক অস্পষ্ট পরিচয় ঘটল। পরের দিন সকালে অপরকে আপন করার অসীম ক্ষমতার পরিচয় পেলাম আমার সঙ্গে আলাপ করার মধ্য দিয়ে। অপরিচয়ের বেড়া কোনদিন ছিল বলে মনে হ'ল না। মনে হ'ল আমার আপন দাদার যে অভাব ছিল তা মুহূর্তে পূরণ হয়ে গেল। বিকালে আমাদের বাড়ী যাওয়ার পালা। এই সময়ে আমার স্বামী আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। আমার ও দাদার যাত্রাপথ একই দিকে হওয়াতে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করলাম। পথে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়াতে তিনি জোর করে দাদাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। দাদার ব্যবহার এত সহজ সরল ও প্রাণবন্ত যে আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী দাদাকে আপন পুত্রের আসনে বসিয়ে ফেললেন। কেবলমাত্র শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীর ক্ষেত্রে নয় আমি বহুবার বহু ক্ষেত্রে দেখেছি এইভাবে প্রবীন প্রবীনাদের কাছে দাদাকে তাঁর নিজ গুণে পুত্রের স্থান অধিকার করতে। সেইদিনই আমার স্বামীর দাবী মেনে নিয়ে দাদা আমাকে পড়ানর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সেদিনই জেনেছিলাম আমিই মহিলা হিসাবে দাদার প্রথম ছাত্রী। সেদিন পর্যন্ত আর কোন মহিলার ছাত্রী হওয়ার সুযোগ হয়নি।

দাদা কোন দায়িত্ব গ্রহণ করলে তা পরিপূর্ণভাবে কার্যে রূপ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। আমার ক্ষেত্রেও দেখলাম দায়িত্ব নেওয়ার পর পরিপূর্ণ কার্যকরী রূপ দেওয়ার জন্য কত পরিশ্রম করেছেন। তখন সুতাহাটা, মহিষাদলে পিচের রাস্তা ছিল না। তবু দাদা সাইকেল করেই সপ্তাহে দু'দিনত বটেই কোন কোন সপ্তাহে তিনদিন পর্যন্তও আসতেন। এছাড়া অনেকবার অনেকভাবে দেখেছি দাদা দায়িত্ব নেওয়ার পর তা সফল করতে না পারলে বুঝতে হবে আর কারো দ্বারা তা সম্ভব হবে না।

আমাকে পড়ানর দায়িত্ব দাদা যখন নেন তখন আমার বিদ্যা ছিল চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। তখন থেকে রাজনৈতিক অনেক উত্থান পতন ও টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে আমার শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সব সময় সম্ভব না হলেও দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর ব্যাপী দাদা চেষ্টা করে গেছেন। এমন কি ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থায় জেলে বসে নোট লিখে পাঠিয়েছেন আমার পড়ার জন্য। দাদা হলেন জাত-শিক্ষক। তিনি ছাত্রকে বই পড়িয়ে ক্ষান্ত হন না, ছাত্রের চরিত্র গঠনের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখেন। পড়ানর পদ্ধতিও এত সুন্দর তাতে পড়ার বিষয় যতই নীরস হোক না কেন তা সরস করে পড়ানর ব্যাপারে তিনি হলেন

অদ্বিতীয়। যাইহোক আমার ক্ষেত্রে দেখেছি আমাকে পড়ানর মধ্য দিয়ে দাদার আসল লক্ষ্য ছিল দেশ সেবিকা তৈরী করা। আমি কতটা হতে পেরেছি জানিনা, তবে যদি কিছু হয়ে থাকি সেটা দাদার অবদান। তাঁর এই লক্ষ্যের কথা অনেক পরে বুঝতে পেরেছি। আজ পর্যন্ত দেখে এসেছি কেবল মাত্র ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে নয়, কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সমাজের ক্ষেত্রে অন্যায় বা ভুল হলে তা সংশোধন করার চেষ্টা করেন।

কেউ তার দাবীর বিষয় বস্তুর গুরুত্ব যদি দাদাকে উপলব্ধি করাতে পারে তাহলে তার কার্য সফল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তিনি আমাদের দাবীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন ও বুঝতে পেরেছিলেন যে ভবিষ্যত স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কাজে লাগবে। তাই দ্রুততার সঙ্গে মেয়েদের জন্য ৭ দিনের শিবির করে আন্দোলনের উপযোগী বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই শিবিরের মেয়েদের নিয়েই 'ভগিনী সেনা' গঠিত হয়েছিল। আজও পর্যন্ত কেউ তার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বোঝাতে না পারলে তাঁকে সেই কাজে যুক্ত করতে পারে না বা পারা যায় না।

গুরু ও নীতির কাছে কিভাবে অনুগত থাকতে হয় তা দাদার কাছে শিক্ষণীয় ব্যাপার। দাদার গুরু সতীশচন্দ্র সামন্ত। তাঁর কথার বিরোধিতা করার কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। এমন কি বিবাহ না করার মূলে আছে সতীশদার অসম্মতি ও নির্দেশ। আর নীতির ব্যাপারে '৪২ সাল পর্যন্ত দাদা অহিংস নীতির অনুসরণকারী ছিলেন। ১৯৪২ সালে আন্দোলনের সময় দেশের স্বার্থে সাময়িকভাবে সেই নীতির থেকে সরে এসেছেন একথা বহুজনই বলেন। তাঁদের অনুরোধ করি দাদার লেখা 'প্রবাহ' গ্রন্থটির ১১১, ১১২ ও ১১৪ পৃঃ অংশটি পড়তে। এগুলি জানার পর তাঁরা দাদাকে ভুল বুঝবেন না। অহিংসা নীতি তাঁর মনের মনিকোঠায় লুকান ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পুনরায় সেই নীতি অনুসরণ করে যে চলছেন তা আমি বিভিন্নভাবে দেখেছি। যেমন যখন কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন তা অহিংস পন্থায় অনশনের মাধ্যমে। অনেকে বলতে পারেন এছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী থাকার সময় জলঢাকায় শ্রমিকদের ঘেরাওর প্রতিবাদে অহিংস পন্থায় অনশনের মাধ্যমে প্রশাসনের সাহায্য ছাড়াই জয়ী হয়েছিলেন। যে সাহায্য সহজেই পেতে পারতেন। এভাবে অনেক উদাহরণ দিতে পারি কিন্তু প্রবন্ধ বেড়ে যাওয়ার ভয়ে সংযত হলাম।

আগষ্ট আন্দোলনের সময় দাদার মধ্যে নেপোলিয়নের সৈন্য পরিচালনার দক্ষতা, শিবাজীর বুদ্ধির চাতুর্য্য, রাণা প্রতাপের দুঃখ বরণের ক্ষমতা ও বিবেকানন্দের ন্যায়-নীতি ও আদর্শের সমন্বয় ঘটতে দেখেছি। সৈন্য পরিচালনার ব্যাপারে দাদা কর্মী সহ দেশবাসীদের এমন সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করেছিলেন যাতে ২৯শে সেপ্টেম্বরের পূর্বের রাত্রি ১০টা থেকে ভোর ৪টার মধ্যে পাঁশকুড়া থেকে সুতাহাটা পর্যন্ত দীর্ঘ পথে বড় বড় খাদ কেটে, বড় বড় গাছ কেটে পথের উপর ফেলে যাতায়াত ব্যবস্থা ও টেলিগ্রামের তার কেটে ও পোষ্ট উপড়ে দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা সব কুশলী কর্মীরা অকেজো করে দিয়েছিল। এটা এত নীরবে হয়েছিল যে সকাল পর্যন্ত প্রশাসন একটুও টের পায়নি। ২৯শে সেপ্টেম্বর যখন তমলুক মহকুমা ব্যাপী বৃটিশের শাসন যন্ত্র দখলের জন্য মহামিছিল শুরু হল তখন পর্যন্ত তমলুক সদর পর্যন্ত রাস্তা ঠিক করতে পেরেছিল বলে তমলুকে সৈন্য পাঠিয়ে মিছিলের উপর গুলি চালান সক্ষম হয়েছিল। আর সুতাহাটায় তা সম্ভব হয়নি তাই সহজে দখল হয়ে গেল। মহিষাদলও হয়ে যেত যদি না রাজবাড়ীর থেকে থানাকে সাহায্য করত। এই সময় দাদার তৈরী বিদ্যুৎ বাহিনীর সৈনিকরা দাদার পরিচালনার গুণে দক্ষ সৈনিকের মত লড়াই করেছিল। সেনাপতি হিসাবে দাদার বৈশিষ্ট্য হ'ল লড়াইয়ের সামনে থাকা। তাছাড়া জাতীয় সরকারের ২১ মাস ব্যাপী কার্যকালে সরকারের স্বার্থে যখনই কোন কঠিন কাজ করতে হয়েছে তখনই দাদা তাদের সঙ্গে থেকেছেন। আবার যাকে যে কাজে পাঠান উপযুক্ত মনে করতেন তাকে সেই কাজে পাঠিয়ে দিতেন। এই নির্বাচনের ব্যাপারে দাদার কোনদিন ভুল হয়নি। ফলে ২১ মাস ব্যাপী জাতীয় সরকারের কোন কাজের সন্ধান সরকার করতে পারেনি। ইংরেজ সরকারের সব রকমের সৈন্য-সামন্ত ও গোয়েন্দা প্রভৃতির বিপুল ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও।

আন্দোলনের সময় খাওয়া, শোওয়া বা থাকার কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। অনেক সময় পান বোরজের মধ্যে বা মাঠের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। খাদ্যের ব্যাপারে দুর্ভিক্ষের জন্য খাদ্যেরও অভাব ছিল বলে কোন প্রকারে জীবন ধারণের জন্য খাদ্য গ্রহণ করতে হয়েছে। তাও আবার সব সময় মিলত না। খাওয়া মিলত তাও পুলিশ এসে গেলে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হয়েছে। এত দুঃখের মধ্যেও কর্মী ভাই-বোনদের গল্পে, গানে ও আবৃত্তি করে এত আনন্দে রাখতেন যে তারাও দুঃখকে দুঃখ বলে অনুভব করতে পারত না। যে শিবিরে সাময়িকভাবে দাদা থাকতেন সেখানেই মায়ের মত রান্নার দায়িত্ব নিতেন এবং রুচি অনুযায়ী

সাধ্যমত সকলের খাদ্যের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতেন। নিজে কিন্তু স্বল্প আহার করতেন। প্রত্যেক কর্মীর স্বাস্থ্যের প্রতি দাদা তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন। কর্মীরা দাদাকে এত ভালবাসত যে দাদার স্পর্শ ছাড়া রাত্রে তাদের ঘুম আসত না। দাদাকে দুঃখ দেওয়ার মত কাজ করার কথা কর্মীরা ভাবতে পারত না। তাই কম বয়সী ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে থাকা সত্বেও কোন অঘটন ঘটেনি, যা অতি সহজে ঘটতে পারত। দাদার স্নেহের টান এমন ছিল কেউ কোনদিন ঘরের কথা মনে করার প্রয়োজন বোধ করেনি।

জাতীয় সরকারের কাজকর্ম এত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতেন যে সহজে তা সকলে জানতে পারত না। যেমন কাউকে যেখান থেকে ধরা হত তাকে সেখান থেকে অনেক দূরে রাখা হ'ত। আর ধৃত ব্যক্তি যাতে ছাড়া পাওয়ার পর সেই স্থানের হদিস না করতে পারে তার জন্য রাস্তায় তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় নানা প্রক্রিয়ার সুযোগ নেওয়া হোত। যেমন চোখ ত বাঁধা থাকতই তাছাড়া কোন পুকুরে কয়েকবার ঘুরিয়ে দেওয়া হোত যাতে তার মনে হোত তাকে নদী পের করান হচ্ছে। সরকারের কোন চরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলে, সে প্রকৃত দোষী কিনা তা স্থির করার জন্য দাদা বিভিন্ন দিন বিভিন্ন পোষাকে গিয়ে থানায় যাওয়ার জন্য ডাক দিয়ে সাড়া মিললে তবে দোষ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হত। তাছাড়া বৃটিশ গোয়েন্দাদের চোখ এড়াবার জন্য বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রয়োজন মত শ্রমিক, কৃষক, চাকর, রাঁধুনী বা পুলিশের পোষাক পরতেন ও পোষাক অনুযায়ী চাল চলন, কথা-বার্তার পরিবর্তন করতেন। এ সম্বন্ধে অনেক ঘটনা আছে। তার মধ্যে একটি না বলে পারছি না। একদিন একটি গ্রামে আমরা আছি জেনে পুলিশ এসেছে সেই গ্রামে। পুলিশ আসছে খবর পেয়ে দাদা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় সরিয়ে দিয়ে নিজে চাষীর পোষাকে হনুমান তাড়ানর অজুহাতে ঘরের চালে উঠে পুলিশ আসছে কিনা দেখে নিয়ে আবার নেমে যে মাঠ দিয়ে পুলিশ ফিরে যাচ্ছে সেই মাঠে গরু নাড়ার ভান করে তাদের আসার উদ্দেশ্য জেনে এলেন। এইরূপে নানাভাবে তাঁর বুদ্ধির চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দের আদর্শ ছিল দেশের মুক্তি ও দেশবাসীর কল্যাণ করা এবং দেশ ও দেশবাসীকে ন্যায় ও সৎ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। দাদাও বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের মুক্তি ও দেশবাসীর কল্যাণ এবং দেশ ও দেশবাসীকে ন্যায় ও সৎ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা সারা জীবন

ব্যাপী করে চলেছেন। কোনভাবে তার থেকে বিচ্যুত হতে তাঁকে দেখিনি। যেখানে এর ব্যতিক্রম দেখেছেন সেখানে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে সরে এসেছেন।

দাদা হলেন ন্যায়ের প্রতিমূর্তি। যেখানে অন্যায় দেখেছেন সেখানে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছেন। তাতে তিনি লাভ ক্ষতির চিন্তা কোনদিন করেন নি। এ আমি কংগ্রেস থেকে শুরু করে জনতা আমল পর্যন্ত দেখে এসেছি। মজা হচ্ছে যাঁরা তাঁকে প্রথমে এই অন্যায় সম্পর্কে সচেতন করেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত পিছনে থাকে না। তাই দাদাকে প্রায়ই এককভাবে লড়াই করে যেতে হয়েছে। দাদার চরিত্র হ'ল যা একবার ধরেন তার শেষ না দেখে ছাড়েন না। প্রায়ই দেখা যায় দাদা যাঁদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন তাঁরা সেই মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়েছেন। যেমন কংগ্রেসের অন্যায়ের প্রতিবাদ করাতে কংগ্রেস তখনকার মত সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি, যা ছিল অসম্ভব। তেমনি এই কথা জনতা দল ও যুক্তফ্রন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দাদা কোন কাজের দায়িত্ব নিলে কোন বাধাই তাঁকে বিরত করতে পারে না। যেমন ১৯৪২ সালে 'ভগিনীসেনা' বাহিনীর উদ্বোধন করার দায়িত্ব দাদার উপর পড়ল। সেই সময় বন্যা হয়ে সমস্ত মাঠ ঘাট জলে ভরে গিয়েছিল। রাস্তা, মাঠ বা পুকুর কোনটা বোঝার উপায় ছিল না। তখন দাদা বৃটিশ সরকারের কাছে গোপনীয়তা অবলম্বন করে চলছেন। তাই দিনের বেলা প্রকাশ্যে চলা ফেরার সুবিধা ছিল না। তা সত্বেও সারা রাত্রি কলা গাছের ভেলায় হয়ে জল ও ধান গাছের সঙ্গে যুদ্ধ করে সকালে আমাদের কাছে যখন পেঁছিলেন তখন দেখলাম দাদার গায়ের স্বাভাবিক রং-এর পরিবর্তে সাদা রং হয়ে গেছে। এতেও তাঁকে ক্লান্ত হতে দেখিনি। অল্প সময় বিশ্রাম নিয়ে ভগিনীসেনা বাহিনীর উদ্বোধন করলেন। অধিনায়িকা করলেন প্রয়াতা সুবোধবালা কুইতিকে। ঐ দিন দাদা ভগিনী সেনানীদের ছোরা চালান ও যুযুৎসু প্যাঁচ শিখতে হবে এবং তিনি শিক্ষকতা করবেন বললেন। পুনরায় ঐ রাত্রে একই ভাবে ফিরে গেলেন। পরে আন্দোলনের সময় বৃটিশ দানবদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দাদার দেওয়া শিক্ষা অনেক কাজে লেগেছে। এখানে তা বলা বাহুল্য বলে মনে করি।

দক্ষ সংগঠক হিসাবে প্রণববাবুর (প্রণব মুখার্জী) মন্তব্য হ'ল ভারতের মধ্যে দুজন দক্ষ সংগঠক তাঁর দৃষ্টিতে পড়েছে প্রথম শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, দ্বিতীয় দাদা। আমি '৪১ সাল থেকে দেখে আসছি, যে কোন কাজ প্রথম

থেকে শুরু করে সুশৃংখল ভাবে একটা বিরাট আকার ধারণ করাতে পারেন। আন্দোলনের সময় দাদার সংগঠন প্রতিভা সর্বজন বিদিত। দাদার সংগঠন শক্তির বলে ২১ মাস নিরবিচ্ছিন্নভাবে ও নির্বীঘ্নে জাতীয় সরকার চালান সম্ভব হয়েছিল। এই সময় সংগঠনের কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে বিছানায় ঘুমানর সময় অল্পই পেতেন। প্রায়ই চলার পথেই ঘুমিয়ে নিতেন। এ সম্বন্ধে অনেক ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা বলছি। একদিন রাত্রে চলতে চলতে দাদার দেহরক্ষী পিছন ফিরে দাদাকে দেখতে না পেয়ে ভয় পেয়ে পিছনে পিছিয়ে দেখে দাদা লাঠির উপর ভর দিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। সেদিন থেকে সামনে ও পিছনে দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। শুধু মাত্র এই সময় নয় স্বাধীনতার পরে মহিষাদলে যত প্রতিষ্ঠান হয়েছে প্রত্যেকটাতে দাদা দক্ষ সংগঠকের পরিচয় দেন।

এই দক্ষতার চরমরূপ দেখেছি বাংলা কংগ্রেস শুরু হওয়ার সময়। ঐ দোর্দণ্ড প্রতাপশালী কংগ্রেসের অতুল্য গ্রুপের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে বেরিয়ে এসে, সাংগঠনিক দক্ষতার গুণে প্রফুল্ল সেন ও অতুল্য ঘোষকে নির্বাচনে হারিয়ে দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র তাই নয়, যে অজয় মুখার্জীকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী করে ছাড়লেন। সেই সময় দেখেছি চলন্ত ট্যাক্সীতে খাওয়া ও ঘুমানর কাজ শেষ করতেন। এরজন্য বেশীর পক্ষে এক ঘণ্টা সময় খরচ করতেন। তাই দাদার গাড়ীতে একজনের জায়গায় দু'জন চালক রাখতে হোত। এইভাবে দাদাকে এক বছর আগে পর্যন্ত দেখেছি। এখন নির্দিষ্ট সময়ে শুতে পছন্দ করেন বেশী। আর দিনের চেয়ে রাত্রের আহারে তৃপ্তি পান বেশী।

দাদা তাঁর নিজের জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন নিজের চেষ্টাতে। কেউ তাঁকে সাহায্য তো করেনি অধিকন্তু টেনে নাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে অনেকবার। এমন কি যাঁদের সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন সেই সতীশদা ও অজয়দা বাংলা কংগ্রেসের পরাজয়ের সব দায় দায়িত্ব দাদার উপর চাপিয়ে দিয়ে দাদাকে ছেড়ে চলে গেলেন। দাদা কিন্তু পূর্বে যেমন শ্রদ্ধা তাঁদের করতেন, তেমনি করে চললেন। দাদা যখন লোকসভা কেন্দ্রে সতীশদার বিরুদ্ধে দাঁড়ান তখন কর্মীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন অজয়দা ও সতীশদার বিরুদ্ধে কোন অশ্রদ্ধের শব্দ যদি তারা প্রয়োগ করে তাহলে দাদা নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াবেন। এই ভাব অজয়দা অসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মধ্যে ছিল। সেই অজয়দার মূর্তি কোলকাতা মহানগরীর ময়দানে যাতে বসে তার জন্য এককভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাতে সফলও হয়েছেন। লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হওয়ার পর প্রথম প্রণাম করার জন্য

ওঁদের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। সতীশদা আনন্দে বুকে টেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু অজয়দা তা পারেন নি। দাদা অনেককে সুযোগ করে দিয়েছেন জীবন পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এখনও পর্যন্ত তা অব্যাহত আছে।

দাদা অতিথি পরায়ন। এক্ষেত্রে মন্ত্রী, রাজ্যপাল থেকে ভিখারী সবাই একই রকম ব্যবহার পায়। অভিজাতদের বেলা কিছু লোক দেখান থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু দরিদ্রের বেলায় অন্তর থেকে করেন। একটি মেথরকে খাওয়ানর পর তার এঁঠো বাসন ধুতে দেখেছি। এভাবে অনেক করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বলেছেন যখন কাউকে খাওয়াবে তাকে অন্তর দিয়ে খাওয়াবে, তার পোষাক দেখে ঘৃণা করবে না। বুঝবে তারই বেশী খাওয়ার প্রয়োজন। সকলকেই ভগবানের প্রতিমূর্তি ভেবে সেবা করবে। এখন কেউ বাড়ীতে এলে বাড়ীতে কিছু না থাকলে অন্ততঃ একটা বিস্কুট না খাইয়ে ছাড়েন না। এজন্য আমাদের অনেক সময় অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। দাদা খাওয়ার চেয়ে খাওয়াতে বেশী ভালবাসেন। আগে নিজে রান্না করে খাওয়াতেন। রকমারী রান্নাও করতে জানেন এবং রান্না করতে ভালও বাসেন। আজকাল সময়ের অভাবে তা আর সম্ভব হয়না। যেখানে স্নেহ, ভালবাসা ও আন্তরিকতার স্পর্শ থাকে সেখানে দাদা খেতে পছন্দ করেন তা যতই সাধারণ হোক। মোট কথা দাদার খাওয়া পরা শরীর রক্ষার জন্য।

দাদা মাতৃ ও পিতৃ ভক্ত। দাদার মুখে শুনেছি মা বাধা দিলে সে কাজ করতে পারতেন না। তাই কোন কাজ করতে চাইলে মা কিছু বলার আগে মায়ের সামনে থেকে সরে যেতেন। এখনও পর্যন্ত কোন কাজে যাওয়ার আগে মা বাবার ছবিটিকে নম্র প্রণাম নিবেদন করে যান। বাড়ীতে থাকলে স্নান করার পর প্রণাম করে তবে খান।

দাদা ঠাকুরের উপরে নির্ভরশীল। দাদা যখনই কোন কাজে হাত দিতে গেছেন তখন আমি বাধা দিলে বলেছেন—ঠাকুরের কাজ তাঁর ইচ্ছা হলে হবে নচেৎ হবে না, আমি নিমিত্ত মাত্র। যেমন ১৯৪৭ সালে জেল থেকে বেরিয়ে লোকসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় বা স্মৃতি সৌধের পরিকল্পনার কথা শুনে আমি বাধা দিয়েছিলাম অর্থের কথা চিন্তা করে। তখনই উপরোক্ত মন্তব্য শুনেছি। এই মন্তব্য শুনে মনে হয়েছে তাই বোধ হয় কোন বিফলতা দাদাকে দুঃখ দিতে পারে না।

দাদা অল্প সময়ে অনেক কাজ করতে পারেন। তার মূলে আছে গোছ গাছ

থাকার অভ্যাস, কাল কি করবে আজ থেকে তার তালিকা করে রাখা ও সেই অনুযায়ী কাজ পুরো মাত্রায় হ'ল কিনা তা মিলিয়ে দেখে নেওয়া। এইভাবে মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলে আসছে। কাজের আগে পরিকল্পনা করে নেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী মিলিয়ে মিলিয়ে কাজ করেন। কাউকে কোন কথা দিলে তা রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

দাদাকে সহজে কোন বন্ধনে বন্দী করা যায় না। এ সম্বন্ধে একটা মজার ঘটনা আমার জানা আছে। মন্ত্রী থাকার সময় গ্র্যান্ড হোটেলে কিছু অভিজাত মহিলা দাদাকে ঘিরে বলেছিল মন্ত্রী মহোদয়কে আমরা আমাদের জালে বন্দী করে ফেলেছি। উত্তরে দাদা বলেছিলেন—এ মন্ত্রীর জানা আছে এ জাল কেটে বেরিয়ে যাওয়ার বিদ্যা। দাদা সত্যি বন্ধনহীন মুক্ত পুরুষ। কোন ব্যাপারে সাময়িক মোহগ্রস্থ হলেও সেই মোহ কাটতে বেশী সময় লাগে না।

দাদা নিজে কোন গন্ডীবদ্ধ সংসারে আবদ্ধ হন্‌নি ঠিকই, কিন্তু সমস্ত দেশ জুড়ে তাঁর সংসার। আর বিরাট সংসারের কর্তা হিসাবে তাদের বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠান দাদাকে সামলাতে হয়। এমন কি তাদের গৃহ বিবাদের মীমাংসা করতেও দাদার প্রয়োজন হয়। এই ত সেদিন অধ্যাপক বিমলেন্দুবাবুর পারিবারিক জীবনে নেমে এসেছিল চূড়ান্ত দুর্য্যোগ। সেখানেও অযাচিতভাবে উপস্থিত শুধু সান্ত্বনার বাণী নিয়ে নয় সমাধানের পথ বাতিলে দিয়ে তাঁদের মুখে হাসি ফুটিয়ে দেন।

দাদা হলেন কর্মী দরদী। যা সমস্ত নেতাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। আমি দেখেছি যে সব কর্মী দাদাকে ভুল বুঝে সরে গেছে বা দাদার দুঃসময়ে দাদাকে চরম আঘাত দিয়েছে তারাও যখন তাদের অসুবিধার কথা জানিয়ে সাহায্য চেয়েছে তখনই দাদা অতীতের কথা মনে না রেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। জনতা সরকারের সময় এরূপ ঘটনার আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাছাড়া আন্দোলনের সময়ের একটি ঘটনার কথা আমার মনে আছে। তখন দাদার মাথার মূল্য দশ হাজার টাকা। একটি গোপন জায়গায় আমরা দাদার সঙ্গে আছি। খবর এল এক কর্মী মৃত্যু শয্যায় দাদাকে শেষ দেখা দেখতে চায়। ধরা পড়ার সমস্ত সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে দাদা সেখানে গিয়েছিলেন। আজও পর্যন্ত কোন কর্মীর অসুখের কথা শুনলে স্থির থাকতে পারেন না দেখতে ছুটে যান।

দাদা কোমলে কঠোরে মিশ্রিত স্বভাবের মানুষ। অন্যায়ের প্রতিকারে দেশের স্বার্থে তিনি বজ্রের ন্যায় কঠোর। কোন কিছুই তাঁকে নরম করতে পারে না।

তখন যেন "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন" হয়ে যান। তাই দেশের স্বার্থে বৃটিশের দালালদের ইহজগৎ থেকে অবলীলা ক্রমে সরিয়ে দিয়ে নির্বিকার থাকতে তাঁকে দেখেছি। সেই মানুষের মধ্যে দেখেছি সমাজের অবহেলিতদের প্রতি দরদী মনের প্রকাশ। কোন অন্ধ, খঞ্জ বা কুষ্ঠ রোগী দেখলেই খুব কষ্টবোধ করেন। নিজে তো তাদেরকে সাধ্যমত সাহায্য করেন তাছাড়া অন্যভাবে কিছু করা যায় কিনা তার জন্য খুব চিন্তা ভাবনা করেন। নারীরা সমাজে অবহেলিত বলে তাদের প্রতি সীমাহীন দরদী মনের প্রকাশ দেখেছি। তাদের যে কোন প্রকারে সাহায্য করতে পারলে খুব আনন্দ পান। পশু পক্ষীর ক্ষেত্রেও দেখেছি তাদের কষ্ট হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। বাড়ীর কুকুর বিড়ালকে যথা সময়ে খেতে না দিলে নিজে খেতে চান না। অনেক সময় নিজের বিছানার মধ্যে লেপ চাপা দিয়ে শুইয়ে রাখেন, তাদের শীত থেকে রক্ষা করার জন্য। আর মশার কামড় থেকে রক্ষা করার জন্য মশারীর মধ্যে রাখেন। অসুখ হলে সারা রাত্রি-দিন ধরে নিজের হাতে তাদের সেবা করেন। তাঁর কোমলতম হৃদয়ের কোমলতম দিকটির পরিচয় পাই এইভাবে আজও।

দাদার অন্তর বাহির সমান। ধোঁকা দেওয়ার কারবার তাঁর মধ্যে নেই বা স্তোক বাক্য দিয়ে ভাঁওতা দিতে পারেন না। কোন অন্যায় কাজ তাঁকে দিয়ে করান যায় না। শত প্রলোভনে প্রলুব্ধ করেও এর থেকে তাঁকে বিচ্যুত করা যায় না। দাদা এম. পি. থাকার সময় এক ভদ্রলোক এসে দাদাকে দিয়ে অনেক অর্থের বিনিময়ে একটা অন্যায় কাজ করিয়ে নিতে চাইলেন। এমন পরিমাণ অর্থ যা তাঁর সারা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। তা সত্বেও দাদা নীতিহীন কাজ করতে অস্বীকার করলেন। ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা হয়ে কাজটা হাতে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। আমি দাদাকে তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য "চেষ্টা করব" কথাটা বলতে বলেছিলাম বলে দাদা আমার উপর রাগ করে বললেন—যা আমার দ্বারা করা সম্ভব নয় তা চেষ্টা করব বলে ভাঁওতা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এইভাবে এক সাংবাদিকের বেলা করেছিলেন বলে সে ভদ্রলোক দাদার বিরুদ্ধে পত্রিকাতে অন্যায় করে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

দাদার নিজের জীবন যাত্রা খুব সাদাসিধে। মোটা খদ্দরের জামা কাপড় পরেন। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পছন্দ বেশী। খাওয়া—ডাল, আলুসেদ্ধ বা শাকসব্জী বেশী পছন্দ। আজকাল শারীরিক কারণে তা আর সহ্য করতে পারেন না। সাধারণ কর্মীজীবন থেকে মন্ত্রী বা এম. পি.'র জীবন পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম

ঘটেনি। আমি একবার একটা পাউডার এনেছিলাম অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় বা গায়ে দেব বলে। দাদা সেটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে বললেন, জীবনের মানকে কখনও বাড়াতে নেই। বাড়ালেই ওর শেষ সীমা টানতে পারবে না। দাদার সাদাসিধে জীবন সম্পর্কে সি. পি. আই এর নেতা ভূপেশ গুপ্তের মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। ভূপেশ গুপ্তের উপস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে দাদার অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে কৃষ্ণ মেননের নালিশের বিরুদ্ধে ভূপেশবাবুর মন্তব্য হল সুশীলবাবু টাকা সংগ্রহ করেন পার্টির জন্য, নিজের জন্য এক পয়সাও খরচ করেন না। কারণ সুশীলবাবুর সাধারণ কর্মীজীবন থেকে মন্ত্রীর জীবন পর্যন্ত আমি তাঁর জীবন যাত্রা দেখে এসেছি, তার কোন পরিবর্তন দেখিনি। পার্টির জন্য কে টাকা সংগ্রহ করেনা, আমরা সকলে তা করে থাকি। সত্যি দাদা এক আত্মভোলা স্বার্থশূন্য মানুষ। নিজের সুখ সুবিধা দেখার সময় বা ইচ্ছা কখনই দাদার হয়নি। সর্বক্ষণ কর্মব্যস্ত।

দাদা অত্যন্ত সময় নিষ্ঠ মানুষ। যে সময়ের যে কাজ হওয়ার কথা সে সময় তা না হলে খুব অস্বস্তিবোধ করেন। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে যান। প্রতিটি সেকেণ্ড কাজের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। নিজে তো সময় রক্ষা করেন, অন্যে সময় রক্ষা না করতে পারলে বিরক্তি প্রকাশ করেন। সময় রক্ষা সম্পর্কে এত সচেতন যে মন্ত্রী থাকার সময় ক্যাবিনেট মিটিং-এ দাদা উপস্থিত হলেই মন্ত্রীরা তাঁদের ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়ার কথা বলতেন। এই অবস্হা আজও পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

দাদার মন এত সংযত যে কোন কিছু শুনতে না চাইলে নিকটের ভীষণ শব্দও তাঁকে বিচলিত করতে পারে না বা দেখতে না চাইলে অনেক সুন্দর দৃশ্যও তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে না। অনেক দুঃখ যন্ত্রনার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। যেমন ১৯৪৭ সালের বিধানসভার নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়ে গেছে। হেরে গেছেন শুনেই সহজভাবে গিয়ে ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। অথচ আমরা ঐ পরাজয়ের যন্ত্রনায় ছট্‌পট্‌ করতে লাগলাম। এই সমান অবস্থা লোকসভার নির্বাচনে হেরে যাওয়ার সময় দেখেছি। এই ভাব তাঁর জীবন যাত্রার সর্ব ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করেছি।

দাদা মাঝে মাঝে অল্পতে ভীষণ রেগে যান। যদিও তা বেশী সময় স্থায়ী হয় না। কিন্তু তাঁর রাগ সহ্য করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাঁর নির্দ্ধারিত

কাজ সময় মত না হলে অসুবিধার কথা বুঝতে চান না, রেগে যান। তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে তাঁকে নড়াতে পারে না কেউ, যেখানে তিনি এক নায়ক।

দাদা স্পষ্ট কথা বড় শক্ত করে বলেন। এর ফলে অনেক কাছের লোক পর হয়ে গেছে। অনেকে দাদার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি অনমনীয়। তাঁর স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি আজও পর্যন্ত।

দাদা স্বেচ্ছায় কোন জিনিষ গ্রহণ করতে না চাইলে তাঁকে তা গ্রহণ করান সাধ্যাতীত ব্যাপার। যদি কোন বিশেষ চাপে তা নিতে বাধ্য হতে হয় তাহলে খুব কষ্ট পান। যেমন বর্ত্তমানে সম্বর্ধনা দেওয়ার একটা হিড়িক পড়েছে। মনের দিক দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে কোন সম্বর্ধনা নিতে কষ্ট পান। কারণ যাদের সাহায্যে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন তাঁদের বাদ দিয়ে কোন সম্বর্ধনা নেওয়ার কথা ভাবতে পারেন না। কেউ যদি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য শ্রদ্ধার্ঘ দাদার হাতে তুলে দেন তা খুশী মনে গ্রহণ করেন এবং তা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে যে স্মৃতি সৌধ সেখানে সংরক্ষিত করে রাখছেন। ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার্ঘগুলিও সেই সৌধে রাখা আছে।

দাদা দুঃখজয়ী মানুষ। জানি সুখেই মানুষের আনন্দ। দুঃখ বরণের মধ্যে যে আনন্দ আছে এই সত্য দাদাকে না দেখলে তা বুঝতে পারতাম না। দেশের স্বার্থে দুঃখ বরণ তার অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু যখন জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করলেন, সেই সময় অজয়দা, সতীশদা ভুল বুঝে দাদাকে ছেড়ে চলে গেলেন, এমনকি এম. এল. এ.ও হতে পারলেন না। সেই সময় শিখেছি কেমন করে দুঃখকে জয় করতে হয়। তখন অনেকে মনে করতেন দাদার কাছে অনেক টাকা আছে। কিন্তু আমি জানি দাদা তখন ছিলেন কপর্দক শূন্য। ফলে সকালে খাওয়ার পর বিকালের খাওয়ার ব্যবস্থা থাকত না। তবুও এই দুঃখের কথা ঘুনাক্ষরে কাউকে জানতে না দিয়ে নিজেই দুঃখের সঙ্গে লড়াইয়ে নেবে গেলেন চানাচুর তৈরীর মধ্য দিয়ে। পরে পিয়ারলেসের এজেন্সী নেওয়ার ফলে রক্ষা হয়ে গেল। সেই দুঃখের সময় যারা দাদার সাহায্যে অনেক উপরে উঠার সুযোগ করে নিয়েছে তারাই কূট চাল দিয়ে দাদার কাছ থেকে অজয়দা ও সতীশদাকে সরিয়ে নিয়ে কঠিন আঘাত দিল দাদাকে। কিন্তু দাদার মুখে আজও পর্যন্ত কোন অভিযোগ শুনিনি। বরং আমরা কিছু অভিযোগ করলে বলেছেন—আমার নির্বাচনে তো কোন ভুল নেই। প্রতিদানে কিছু করতে না পারলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ সকলের সব গুণ থাকে না বা থাকতে পারে না।

তেমনি '৪৭ সালে হেরে যাওয়ার পর আমি বলেছিলাম—যাদের জন্য মন্ত্রীত্ব ছাড়লে তারাতো তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। জবাবে বললেন—প্রতিদান পাব বলে পদত্যাগ করিনি। বিবেকের কাছে জবাব দিতে করতে পারব, ঠিক কাজ করেছি বলে। সত্যি প্রতিদানের লোভে কোন দিন কোন কাজ করতে দেখিনি।

দাদা জীবনকে সচল রাখার পক্ষে দুঃখকে সহায়ক বলে মনে করেন। এই সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। এম. পি. হওয়ার পর সতীশদাকে প্রণাম করতে সতীশদা আশীর্বাদ করেছিলেন—"তোমার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক।" দাদা তার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন—"কুসুমাস্তীর্ণ" না হয়ে "কণ্টকাকীর্ণ" হোক এটাই আমার কাম্য। কারণ প্রথমটা হলে জীবনে চলার গতি হারিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। আর দ্বিতীয়টাতে জীবনের চলার গতিশীলতা বজায় থাকবে। এই গতিশীলতা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত থাকুক এটাই আমি চাই। বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে গতি হবে ধীর অথচ দৃঢ়। দাদার জীবনে বাংলার এই প্রবাদ বাক্যের স্থলে হবে গতিবে দ্রুত অথচ দৃঢ়। দাদা সারা জীবন সমস্ত ব্যাপারে দ্রুত গতিতে চলনার সাধনা করে এসেছেন। এরজন্যই দুঃখ তাঁর কাছে এত কাম্য বস্তু।

দানশীলতা দাদার একটা বিশেষ গুণ। ভবিষ্যতের কথা কখনই চিন্তা করেন না। টাকা এলেই কেমন করে নিঃশেষে জনসেবায় লাগাতে হবে তার তালিকা তৈরী হয়ে যায়। তাই ১৯৪৭-এ জরুরী অবস্থায় জেলে বসে পিয়ারলেসের কমিশন জমা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই জনকল্যাণ ট্রাষ্ট তৈরী করলেন। কেবল অর্থের ব্যাপারে নয় মৃত্যুর পর নিজের দেহটাকেও জনসেবায় উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

আর একটা দেখেছি দাদা নতুন নতুন কাজ সৃষ্টি করে নেন বা কাজের স্রোত এলে ঝুঁকি নিয়ে তাতে গা ভাসিয়ে দেন এমনভাবে যে নিজেকেও ভুলে যান। নিজের ক্ষতি বৃদ্ধি দেখার সুযোগ পান না। যেমন বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় সেখানকার নেতারা যখনই সাহায্য চেয়েছেন, তখনই কারো সাহায্য যাওয়ার আগেই অস্ত্র, খাদ্য, অর্থ, আশ্রয় ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাতে অনেক আর্থিক ক্ষতি ও ঋণ হয়েছে। যে ঋণ পিয়ারলেসের কমিশন থেকে অর্থ দিয়ে শোধ করেছেন। এই সময় বাংলা দেশীয় নেতাদের আহ্বানে একদল যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক যুবকদের কাছে এমন জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন যাতে তাদের মধ্যে একজনও জীবিত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসে নি। তেমনি দাদার

এই কর্ম পাগলভাবের সঙ্গে পরিচিত এক সময়ের রাজনৈতিকভাবে বিরূপ নেতা শ্রদ্ধেয় কুমারচন্দ্র জানা মহাশয় বিনোবাজীকে যখন তমলুকে আনেন তখন তিনিই দাদাকে ভার দিয়েছিলেন বিনোজীকে নিয়ে তাঁর ধারা অনুযায়ী কাজ করার জন্য। দাদা সেই কর্মভার নিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে গেলেন যে অন্য কাজ-কর্ম ও খাওয়া-দাওয়া ভুলে একমাত্র সেই কাজ হয়ে উঠল ধ্যান জ্ঞান। পরিপূর্ণভাবে সফলও হলেন। তেমনি চীন যুদ্ধের সময় ও দেখেছি অর্থ সংগ্রহ করে রাজ্যপালের তহবিলে জমা দিলেন। তাছাড়া নিজে সৈনিকের পোষাক পরতেন ও ছেলেমেয়েদের আগ্নেয় অস্ত্রে শিক্ষিত করে তোলার জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এভাবে আরও অনেক ঘটনা আছে। কোনদিনই বিশ্রাম নিতে দেখিনি। আমরা এত কাছে থেকেও তাঁকে ঐ কর্ম থেকে বিরত করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ। অধিকন্তু আমাদেরও সেই স্রোতে ভেসে যেতে বাধ্য হতে হয়।

দাদা কোন কাজের দায়িত্ব কারো হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। ফলে দাদার অবর্তমানে দাদার সংগঠনের দায়িত্ব নেওয়ার লোকের অভাব দেখা যাচ্ছে বর্তমানে কিছুটা সাবধান হয়েছেন মনে হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার তীব্র অনুভূতি বা স্পর্শকাতরতা আছে। গোছ গাছ থাকা বেশী পছন্দ। কোথাও অপরিচ্ছন্নতা দেখতে পারেন না বা সহ্য করতে পারেন না। বাড়ীতে তো বিরক্ত হয়ই। বাড়ীতে অন্য কেউ স্নানের ঘর বা পায়খানা পরিষ্কার করলে পছন্দ হয় না যতক্ষণ না নিজ হাতে পরিষ্কার করতে পারেন। কোন হোটেলে থাকলেও তার পায়খানা নিজ হাতে পরিষ্কার না করা পর্যন্ত স্বস্তি পান না। এমন কি হাসপাতালের বেডপেনটাও নিজ হাতে পরিষ্কার করতে দেখেছি।

দাদার মধ্যে বাঙ্গালীদের প্রতি দরদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালী কোথাও লাঞ্ছিত হলে সহ্য করতে পারেন না। তাই আসামে যখন বাঙ্গালীদের প্রতি অত্যাচার শুরু হয়েছিল তার প্রতিবাদ করার জন্য একদল সহকর্মী নিয়ে কলিকাতা থেকে আসাম পর্যন্ত পদযাত্রা করেছিলেন। আসামে প্রবেশ করতে গিয়ে আসাম পুলিশের হাতে বন্দী হয়ে জেলে গিয়েছিলেন। জেলে একরাত্রি রাখার পর পরের দিন পশ্চিমবঙ্গের সীমানায় ছেড়ে দিয়ে আসামের সীমানায় পুলিশ দিয়ে ঘিরে দেয়। ফলে আসামের মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ না পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সীমারেখার মধ্যে অনশন করতে সুরু করে দেন। প্রায় তিনদিন অনশন করার পর আসামের বাঙ্গালী সমাজের নেতৃস্থানীয়গণ

এসে অনেক অনুনয় করে বুঝিয়ে দাদাকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হন।

দাদা অসুস্থ হলে একদম ছোট শিশুর মত স্বভাবের হয়ে যান। শিশুরা অল্পেতে কাতর হয়ে মাকে বা বাবাকে তার অসুবিধার কথা বারে বারে জানাতে থাকে, দাদাও তেমনি সেবক সেবিকাদের কাছে তার অসুবিধার কথা জানান ও তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। যা সুস্থ অবস্থায় কিছুতেই সম্ভব হয় না।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি এত দরদী মনোভাব দেখেছি যে যাঁরা যথা সময়ে দরখাস্ত করেননি অথচ তারা প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়াই করেছেন, তাদেরকেও পেনশন পাইয়ে দেওয়ার জন্য নিজ খরচায় ও পরিশ্রমে পেনশনের জন্য চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টার ফলে তাঁরা সকলে পেনশন পেয়েও গেছেন। যা কোনদিন সম্ভব হত না। তার প্রতিদানে দাদার পাওনা হল অকৃতজ্ঞতা সূচক সমালোচনা। অর্থাৎ দাদার এতে কোন কৃতিত্ব নেই সরকার তাদের গুরুত্ব বুঝে দিতে বাধ্য হয়েছে।

দেশবাসী কোন বিপদে পড়লে তাদের পাশে ছুটে যান সেই বিপদের অংশীদার হওয়ার জন্য। তাতে কোন বাধাই তাকে বিরত করতে পারে না। যেমন এম. পি. থাকার সময় ময়নাতে বন্যা হয়ে গেল। দাদা ময়নাতে যাওয়ার জন্য কলিকাতা থেকে রওনা হলেন। সরকার থেকে বাধা দেওয়া হল যাওয়ার রাস্তায় অসুবিধা আছে বলে। কিন্তু দাদা এ সম্পর্কে অনমনীয়। সরকার দাদার দৃঢ়তার কাছে হার স্বীকার করে একটা ট্রাকের ব্যবস্থা করে দিল। সেই ট্রাক কোলাঘাট পর্যন্ত এসে আর এগোতে পারল না। আমি সঙ্গে ছিলাম। তখন ট্রাক থেকে পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। মেছেদা পর্যন্ত আসার পর আর রাস্তা নেই। সমস্ত পথ জলমগ্ন। সেই জলের মধ্য দিয়েই যাত্রা শুরু করলেন, জলের কি স্রোত। এখানেও সরকারী কর্মচারীরা বাধা দিয়ে পরের দিন নৌকার ব্যবস্থা করে দেবেন বলা হলেও তিনি মনে প্রাণে তা স্বীকার করলেন না। তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। সেখান থেকে কার্কটিয়া পর্যন্ত বুক ভরা জলের মধ্য দিয়ে স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে কার্কটিয়ায় যখন পৌঁছিলেন তখন অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। সৌভাগ্যক্রমে একটা বাস তখনও ছিল বলে প্রায় ১১টার সময় তমলুকে পৌঁছিলাম। তারপর ভোরে ময়না চলে গেলেন। কোন ক্লান্তি আছে বলে মনে হোল না।

দেশের স্বার্থে দাদার মধ্যে দুটি রূপের প্রকাশ ঘটতে দেখেছি। একটি ধ্বংসাত্মক অপরটি সৃজনাত্মক। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে যা আগষ্ট আন্দোলন নামে খ্যাত, সেই সময় দেখেছি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সেই আন্দোলনের পথে বাধা স্বরূপ মনে করলেই তাকে নির্মমভাবে সরিয়ে দিতে এতটুকু কুণ্ঠা বা কষ্টবোধ করেননি। তেমনি আবার দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশবাসীকে আদর্শবান, সুখী ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য কিছু সৃজনশীল কাজে হাত দিয়েছিলেন। দাদা মনে করতেন মানুষের প্রাথমিক যে প্রয়োজন খাওয়া ও পরা তা যদি প্রত্যেকে করে নিতে পারে তাহলে দেশে অনেকখানি সুখ ফিরে আসবে। তাছাড়া ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা অনুপাতে কুটির শিল্প ছাড়া অধিকাংশের কর্মসংস্থান করা অসম্ভব বলে দাদা মনে করেন। দাদা এই মানসিকতা থেকে খাদি গ্রামোদ্যোগ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ছিলেন। সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামবাসীকে অন্ন ও বস্ত্রে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়াগুলি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা। এই পরীক্ষা চালাতে গিয়ে দেখেছি দাদা প্রতিষ্ঠানের পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের নিয়ে কৃষি ও সুতোকাটার কাজ করতেন। কৃষির কাজ করতে গিয়ে নিজে লাঙ্গল ও কোদাল চালাতেন। ফলে প্রতিষ্ঠানের পুরুষ ও মহিলা কর্মীগণ যার যেমন ক্ষমতা সেইভাবে কৃষি কাজে স্বেচ্ছায় অংশ নিত। একইভাবে সকলে নিয়ম করে সুতোকাটার কাজে অংশ নিত ও নিজেদের উৎপাদিত সুতার কাপড় নিজেরা ব্যবহার করত। তেমনি কৃষির উৎপাদিত ফসল দিয়ে প্রতিষ্ঠানবাসীদের খাদ্যের সংস্থান হয়ে যেত, বাইরের থেকে কোন কিছু আনার প্রয়োজন হ'ত না। ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে ঘানি, সাবান তৈরী, টালি ভাটা (এখনও তা আছে) ইট ভাটা, কাঠের কাজ প্রভৃতি হ'ত।

অনুরূপভাবে শিক্ষার ব্যাপারে দাদা বর্তমানের শিক্ষার ধারার সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। কারণ তিনি মনে করতেন এই শিক্ষার দ্বারা সৎ ও আত্মনির্ভরশীল নাগরিক গড়ে উঠতে পারে না। তাই ভারতের বৈদিক যুগের শিক্ষা ছিল কর্ম ও ধর্মভিত্তিক। যে শিক্ষা রাজার ছেলে ও চাষার ছেলে সমভাবে একসঙ্গে থেকে গ্রহণ করত, যাকে মহাত্মাজী বুনিয়াদী শিক্ষা আখ্যা দিয়েছিলেন। সেই শিক্ষাই আদর্শ নাগরিক গড়ে উঠার পক্ষে সহায়ক বলে মনে করতেন। তাই তিনি তাজপুর গ্রামে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন শুধু একটি মাত্র কারণে যে এই শিক্ষার পাঠক্রমে জীবন ও জীবিকার সম্পর্ক অঙ্গাঅঙ্গিভাবে যুক্ত রয়েছে।

আগেই বলেছি মেয়েদের জন্য কিছু করতে পারলেও দাদা খুশি হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দাদা অনুভব করেছিলেন গ্রামের প্রসূতিদের হাতুড়ে দাইদের হাতে খুব বিপদে পড়তে হয়। অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুও ঘটে। তাই তার প্রতিকার করার জন্য 'মাতৃভবন' নামে একটি প্রসূতিগার করেছিলেন। এর কমিটির সদস্যগণ প্রায় সকলে ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। সভানেত্রী ছিলেন জোড়া পুকুরের ইন্দুমাসীমা (ইন্দুমতী ভট্টাচার্য), আর সম্পাদক ছিলেন দাদা নিজে। এখানে অনেক দূরে দূরে থেকে প্রসূতিরা এসে থাকত। সন্তান প্রসব করার পর সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে যেত। এখানে কাউকে কোন খরচা দিতে হোত না।

এর সবগুলিই প্রশাসনিক বাস্তব জ্ঞানের অভাব ও হৃদয় হীনতার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যাঁরা প্রশাসনের দায়িত্বে এলেন তাঁরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শহুরে মানুষ। তাঁরা প্রধানতঃ ভুলেই গেলেন বাপুজীর বাণী "গ্রামে ফিরে যাও।" ফলে গ্রামের জীবন ধারা সম্পর্কে তাঁদের কোন ধারনা বা অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁরা এসবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে সক্ষম হন নি। তাই গ্রাম্য জীবন গড়ে তোলার পক্ষে যা প্রয়োজন তাকে কোন রকম গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হলেন। ফলে দেশের অবস্থা বহু বিষয়ে ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাচ্ছে। একে রোধ করার ক্ষমতা প্রশাসন হারিয়েও ফেলেছে। দাদা দেশের এই অবস্থা দেখে কষ্টবোধ করছেন। এর থেকে দেশকে মুক্ত করার কোন পথ যতই খুঁজে না পাচ্ছেন দাদা ততই যন্ত্রণায় ছটপট করছেন।

কিছুদিন যাবৎ একটা বিষয়ে যন্ত্রণায় দাদাকে কাতর হতে দেখেছি, তাহল রাষ্ট্রের ও সমাজের ক্ষেত্রে যে অবক্ষয় চলছে সেই বিষয়ে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক নেতারা গদি বা পদ মোট কথা ব্যক্তি স্বার্থ ঠিক রাখার জন্য যে যেভাবে পারছে জনমানসে সুড় সুড়ি দিয়ে নিজ নিজ কার্য উদ্ধার করে নিচ্ছে। যেমন কোথাও ধর্মের, কোথাও জাতপাত, কোথাও প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা আবার কোথাও বা অর্থের সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তাতে যে বিচ্ছিন্নতা বেড়ে গিয়ে দেশ যে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পুনরায় পরাধীনতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ও দেশবাসীর মাথায় দুঃখের বোঝা নেমে আসছে সেদিকে কোন দৃষ্টি নেই। গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হয়েছে। আরও যন্ত্রণা পাচ্ছেন এই ভেবে যে দেশকে বিদেশীর শোষণ ও শাসনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য কতজন প্রাণ দিয়েছে। কতজন কত প্রকারের যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে সেই দেশকে একদল স্বার্থান্বেষী দেশবাসী আরও খারাপভাবে শোষণ ও শাসন করে যাচ্ছে। অথচ এর বিরোধিতা করবে যে

যুব সমাজ তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ও চোখ অন্ধ করে পঙ্গু করে দিয়েছে জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা জগতে অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাছাড়া শিক্ষা জগতে অব্যবস্থার ফলে যুব সমাজ বাঁচার কোন পথ খুঁজে না পেয়ে সমাজ বিরোধী হয়ে যাচ্ছে বা তাদের হতে বাধ্য করা হচ্ছে। তার ফলে সমাজেও অবক্ষয় শুরু হয়ে গেছে। নারী ধর্ষণ, বধূহত্যা, ডাকাতি, ছিনতাই বা হত্যা প্রায়ই লেগে আছে। আইন ও প্রশাসনের সাহায্য থেকে মানুষ বঞ্চিত। মানুষ নির্ভয়ে রাস্তায় চলতে পারে না। এক কথায় সর্বদিক দিয়ে মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিসহ। এর থেকে মুক্তির কোন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। এইসব দেখে দাদা প্রায়ই বলেন উত্তর সূরীদের জন্য কি রেখে যাচ্ছি বা দিয়ে যাচ্ছি। তাই যুবক-যুবতীদের কাছে পেলেই আকুলভাবে তাদের কাছে বলতে শুনেছি, তোমরা মাইক, লাইট, মালা বাদ দিয়ে পাঁচজন যদি বস তাহলে আমি আমার প্রাণের কথা বলে যাব যতক্ষণ তোমাদের ধৈর্য্য থাকবে। অর্থাৎ দাদা চাইছেন একদল তরুণ-তরুণী তৈরী করতে যারা ভবিষ্যতে দুর্দিনের মোকাবিলা করতে পারবে। এটা যতই হচ্ছে না ততই যন্ত্রণায় ছটপট করতে দেখছি।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার বংশ কৌলিন্যের তালিকায় দাদা না জন্মালেও তিনি ব্রাহ্মণের ন্যায় সূচী শুদ্ধ ন্যায় ও সত্যপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি সারা জীবন অপরের কল্যাণ করতে গিয়ে অনেক সময় লাঞ্ছনা সহ্য করে চলেছেন। তবু তাঁর তিনি চলার পথ পরিবর্তন করতে সম্মত নন। এখন এই ৮৫ বৎসর বয়সেও তাঁর একই ধারা চলছে। পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

দাদার ন্যায় উৎসর্গীকৃত দেশপ্রেমীগণ ছিলেন বলেই দেশের বা জাতির একটা চরিত্র ছিল। কারণ এঁদের প্রভাবে দেশ ও জাতি প্রভাবিত হত। আজ অত্যন্ত দুঃখ লাগে এইরূপ আত্মত্যাগী দেশপ্রেমী দেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। সেই জায়গায় স্বার্থান্বেষীরা স্থান করে নিচ্ছে। তাই আশঙ্কা দেশের বুকে যে ঘোর দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে, জানিনা ভবিষ্যতে দেশের বা জাতির জীবনে কি ঘটবে বা কি আছে।

৯

বিরল ব্যক্তিত্ব

শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত সুশীল কুমার ধাড়া মহাশয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত তেমন কোনও পরিচয় নেই। কর্মজীবনের প্রারম্ভে তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ে ১৯৫৩ সালের আগষ্ট মাসে দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের অন্যতম অধ্যাপক হিসেবে আমি তমলুক গিয়েছিলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হিসাবে শ্রদ্ধাপদ শ্রী শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী—তিনি তখন কলেজের পরিচালন সমিতির সম্পাদক – সম্ভবতঃ তাঁর প্রিয় দর্শনের ছাত্র এবং অধ্যাপক শ্রী জগদীশ দাশ মহাশয়ের কাছ থেকে আমার নাম শুনেছিলেন। আমি তখন পরীক্ষার ফল বেরুবার পরে হলেও স্কটিশ চার্চ কলেজের ডাফ্‌লিং ছাত্রাবাসে ছিলাম। জুলাইতে একদিন শ্রী শ্রুতিনাথ চক্রবর্তীর কাছ থেকে একটি পোষ্টকার্ড পেলাম। এক নির্দ্ধারিত দিনে তাঁর তমলুক বাসভবনে মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ। বয়স তখন ২২ বা ২৩ ছুঁই ছুঁই করছে। খেলাধুলায় পারদর্শী হিসেবে বেশ নামও ছিল, বেশ মজা লাগল —যেন আর একটি খেলা। বলে রাখা ভাল তখন আমি বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক পদে মনোনীত— তবু দেখিই না কি হয় বলে চলে গেলাম। তখন পাঁশকুড়ায় নেমে ১৬ মাইল বাসে গিয়ে তমলুক পৌঁছতে হ'ত। ভোরের একটি ট্রেন ধরে—ইলেকট্রিক ট্রেন তার বহু পরে চালু হয়েছে—পাঁশকুড়া পৌঁছলাম—তারপর বাসে তমলুক। বাসস্ট্যান্ডে নেমে যাকেই জিগেস করি সেই সসম্ভ্রমে শ্রুতিনাথবাবুর বাড়ীর হদিশ দেয়। হেঁটেই চলে গেলাম। শ্মশ্রুমণ্ডিত আকৃতি এক ঋষিতুল্য ব্যক্তিকে দেখে বুঝতে কষ্ট হ'ল না যে তিনিই শ্রুতিবাবু। খুব আদর আপ্যায়ণ করে খেতে বসালেন। খাওয়ার মধ্যেই নানা রকমের প্রশ্ন—কখনও বাংলায়, কখনও বা ইংরাজীতে। তখন বুঝতে পারিনি যে এটাই আমার ইন্টারভিউ। খাওয়ার পরে বললেন যে তুমি আজই নিয়োগ পত্র নিয়ে যাও। আমি সভাপতি (এস. ডি. ও) শ্রী রামপ্রসাদ গাঙ্গুলীর কাছে সই করতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। নিয়োগ পত্র কিছু পরেই পেয়ে গেলাম। বিকালের দিকে রওনা হয়ে রাতে কলকাতায় ফিরে এলাম।

উভয় সংকটে পড়ে গেলাম। ভারত সরকারের সদ্য স্বীকৃতি প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে যাই, না স্বাধীনতা সংগ্রামে গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি খ্যাত তমলুকে যাই। পূজনীয় পিতৃদেবকে জিগ্যেস্ করায় তিনি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের পরামর্শমত কাজ করতে বল্লেন, তবে নিজে বিপ্লবী হিসেবে তমলুকের প্রতি তাঁর দুর্বলতার কথাও গোপন রাখলেন না। গোপীনাথবাবু বিনা দ্বিধায় তমলুক যাবার কথা বল্লেন। আগষ্টের প্রথমেই সেখানে গিয়ে কাজে যোগদান করলাম।

বেশ কিছুদিন ধরে—স্কুলের ছাত্র হিসাবেই—তমলুকের জাতীয় সরকারের কথা জেনে শিহরিত হতাম আনন্দে। তখনকার সব ছাত্রদের মধ্যেই ব্রিটিশ বিদ্বেষ এবং দেশপ্রেম যেন সহজাত ছিল। মেদিনীপুরে যে গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়েছিল তার নায়ক হিসাবে তিন প্রধানের কথা শুনেছিলাম—পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রী সতীশচন্দ্র সামন্ত ও শ্রী সুশীল কুমার ধাড়া। এঁদের চাক্ষুষ দেখার এবং তাঁদের মুখ থেকে কিছু শোনার অদম্য বাসনা ছিল। পুরোপুরি মনবাঞ্ছা পূর্ণ না হলেও এঁদের দর্শন পেয়েছিলাম। তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ে যাবার সময়ে সেই প্রাচীন তাম্রলিপ্তর কথা আর অধুনাখ্যাত স্বাধীন জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্র তমলুকের কথা—সেখানে যাবার জন্যে মনকে আন্দোলিত করেছিল। ১৯৫৩ সালের আগষ্টের প্রথমদিকে কলেজে যোগদান করলাম।

ওখানে গিয়ে জাতীয় সরকার গঠন এবং বিদ্যুৎবাহিনী সম্বন্ধে নানা কথা—কিছু বাস্তব, কিছু কাল্পনিক—শুনেছিলাম, কিন্তু তাদের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল। সম্প্রতি শ্রী সুশীল কুমার ধাড়ার 'প্রবাহ' পড়ে সত্য-মিথ্যায় মেশানো অর্ধজানা মানসিক অবস্থা থেকে পূর্ণ সত্য জানতে পারলাম। সাধারণভাবে আমরা যতটা ভাবতে পারি তার থেকে অনেক বেশী শৃঙ্খলা, কৃচ্ছ্র সাধন, শারীরিক নির্যাতন ভোগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সততা এবং সর্বোপরি নিষ্কলুষ দেশপ্রেম দেখিয়েছেন এই বীর বিপ্লবী যোদ্ধারা। 'প্রবাহ' শুধু উচ্চমানের সাহিত্যই নয়, জাতীয় জীবনের, স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বরূপ সম্বন্ধে এ এক উচ্চস্তরের ইতিহাস। 'প্রবাহ' পড়লে অনুভব করা যায় গতিই জীবন এবং এ গতির কোনও বিরাম নেই। চির বিপ্লবী সুশীল কুমার তাই যেন চির পথিক, আদর্শের পথে, সত্যের সন্ধানে, মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যের রূপায়ণে তাঁর যাত্রার শেষ নেই। ব্যক্তি মানুষের জীবনের অন্ত একদিন আসে, কিন্তু আদর্শ

নিষ্ঠ, সৎ, নির্ভীক বিপ্লবীর দেশপ্রেমের এবং আদর্শনিষ্ঠার কোন মৃত্যু নেই। তার কোনও ক্ষয় নেই—সে অক্ষয়, অব্যয়। ভবিষ্যতের দিশারী হিসেবে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রভাবিত করলেই স্বাধীন দেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

গ্রামেগঞ্জের বহু অতি সামান্য ব্যক্তি কি অসামান্য দেশপ্রেম দেখিয়েছেন 'প্রবাহ' পড়লে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। তমলুকে দোদণ্ড প্রতাপ বৃটিশ সরকারের নাকের ওপর দিয়ে কিভাবে স্বাধীন জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছিল এবং কিভাবে তা সপ্তাহের পর সপ্তাহ সাফল্যের সংগে কাজ দেখিয়েছিল তার রোমাঞ্চকর তথ্য 'প্রবাহ' থেকে পাওয়া যায়। এই রোমাঞ্চকর গৌরবময় ইতিহাসে বহু ব্যক্তি নিজেদের জীবনপণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য সব ত্যাগ করেছেন, আর এঁদের নেতৃত্ব দিয়েছেন মহান্ ত্রয়ী শ্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রী সতীশচন্দ্র সামন্ত আর শ্রী সুশীল কুমার ধাড়া। এই ইতিহাস রচনায় মুখ্য ভূমিকায় থেকেও প্রবাহের লেখক নিজের শিক্ষায়, ভদ্রতায়, রুচিশীলতায় নিজেকে নাট্যমঞ্চ থেকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করেছেন। তা অবশ্য সম্ভব নয়। আজ তাঁর ৮৫ বৎসর পূর্তিতে যখন সমস্ত পশ্চিমবাংলায় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের আয়োজন হওয়া উচিত ছিল, তখন অন্ততঃ যে তমলুকবাসীরা তা করেছেন তাতে ক্ষোভের মধ্যেও কিছু আনন্দ পেয়েছি। আর এ বিষয়ে আমার প্রথম জীবনের তমলুক কলেজের ছাত্র অধ্যাপক বিমলেন্দু চক্রবর্তী অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন বলে গর্ববোধ করছি। প্রধানতঃ তারই স্নেহের দাবীতে আমার এই দারুণ সঞ্চয় - মনোযোগ দিয়ে দুখানি বই পড়া—'চির তরুণ বিপ্লবী সুশীল কুমার' আর শ্রীযুক্ত ধাড়ার নিজের অনবদ্য সৃষ্টি 'প্রবাহ'। সত্যিই অনেক কিছু জেনেছি, অনেক কিছু শিখেছি।

আমার মনে বাল্যকাল থেকে যে দুটি প্রশ্ন কখনও প্রচ্ছন্নভাবে কখনও বা স্পষ্টভাবে জেগেছিল তার যেন উত্তর পেয়ে গেলাম। জাতীয় সরকার স্থাপনে যে বিপ্লব হয়েছিল তার প্রকৃতি কি—অহিংস না সহিংস। আমি এর সদুত্তর পেয়ে গেছি। দ্বিতীয় যে প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে এ সময়ে এই বিপ্লবে কম্যুনিস্টদের সত্যি সত্যি কি অবদান ছিল, এরও পরিষ্কার উত্তর পেয়েছি।

স্বাধীনতার পরে প্রায় অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত। বাল্যকালে যে স্বপ্ন দেখতাম, যে দেশ গড়ার জন্য শ্রী সুশীল কুমার ধাড়ার মত অসংখ্য বিপ্লবী তাঁদের সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, সে সাধের স্বপ্ন কি সফল হয়েছে? এর উত্তরও পরিষ্কার।

ব্যক্তিগত কথা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম, ব্যক্তিগত কথা দিয়েই তা শেষ

করি। ১৯৪৬ সালে যখন ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করি তখনও মাতৃভূমি ছিল বৃটিশের পদানত, কিন্তু আকাশে বাতাসে স্বাধীনতার বাতাস বইছিল অবিরত, আমাদের কাঙ্খিত শুভ লগ্নের প্রতীক্ষায় আমরা অধীর। স্বামীজী নেতাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত শ্রী সুশীল কুমার ধাড়ার মত বহু বিপ্লবীর মত আমরাও স্বপ্ন দেখেছিলাম যে স্বাধীন ভারতভূমি জাতিপুঞ্জে নিজের আদর্শের জোরে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে, দর্শন সংস্কৃতিপুষ্ট কর্মযোগে নিজের মর্য্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। পনের বছর বয়সে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তা নিদারুণ হতাশায় পর্য্যবসিত হয়েছে। কিন্তু কেন? সুশীল কুমারের মত সৎ, আদর্শবাদী, সত্যনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক যাঁরা নিজেদের সর্বস্ব দেশের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন তাঁরা দেশ গড়ার মহান্ ব্রতে সক্রিয় অংশ নিতে ত পারলেনই না, স্বাধীন ভারতে তাঁদের অনেকেই কারারুদ্ধ হয়ে কাটালেন—এমন ঘটনা কেন ঘটল, কার স্বার্থে ঘটল? দেশবাসী সমস্বরে এ প্রশ্ন তুলে যাঁরা দেশ পরিচালনা করছেন তাঁদের কাছ থেকে সদুত্তর দাবী করুন। ভবিষ্যৎ ইতিহাস নিশ্চয়ই এ রহস্যের উদ্ঘাটন করবে।

তবুও নেতাজীর মত বলতে ইচ্ছা করে 'I am an incurable optimist'। আজকের সর্বথা কলুষিত। অসততার গভীরে নিমজ্জিত সমাজে থেকেও আশার আলোক বর্তিকা দেখতে পাই সুশীল কুমারের মত নির্মল চরিত্র, সৎ, সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিকের জীবনাদর্শে। এঁরা চির পথিক—সত্যের পথে, আদর্শের পথে। এঁরা আদর্শ শিক্ষক—নিজের জীবনের প্রতিটি কর্মের ভেতর দিয়ে দেশবাসীকে শিক্ষা দিচ্ছেন নিরন্তর—এঁদের জীবনই বাণী, বাণী সর্বস্ব জীবন নয়। এঁদের জীবন ও ত্যাগ আমাদের কাছে প্রকৃত দেশপ্রেমের আদর্শরূপে ভাস্বর হয়ে থাকবে এই আশা নিয়েই বেঁচে থাকব আর আশা করব ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এ থেকে যথোপযুক্ত শিক্ষা নেবে।

১০

'গ্রামীণ অর্থ-নীতি'

সন্তোষ ভট্টাচার্য

ভারতের আর্থিক দৈন্য নিরসনের জন্য দেশের যেসব চিন্তানায়ক ও কর্মযোগী চিন্তা-ভাবনা করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই গ্রামীণ অর্থ-নীতিকে উন্নত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সেটাই স্বাভাবিক। যে দেশের আর্থিক উৎপাদন প্রধানতঃ গ্রাম-ভিত্তিক, এই শতাব্দীর প্রারম্ভে তো বটেই, সেই দেশের গ্রামীণ অর্থ-নীতি উন্নত না হলে, দৈন্য ঘুচবে কি করে?

গ্রামের আর্থিক অবস্থা উন্নত করার পন্থা নিয়ে দু' ধরণের চিন্তাধারা আছে। প্রথমটির মতে, গ্রামের আর্থিক উন্নতি আনতে হলে, গ্রাম-ভিত্তিক গঠনমূলক কাজ কর্মের পথেই করতে হবে। দ্বিতীয়টির মতে, গ্রামের উন্নতিও আধুনিক শিল্প-ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার পথেই করতে হবে। প্রথমটির প্রবক্তাদের মধ্যে আছেন, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ও জাতির গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয়টির প্রবক্তাদের মধ্যে আছেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ। এই দুইটি চিন্তাধারা কিন্তু সর্বাঙ্গীণ পরস্পর-বিরোধী নয়। যাঁরা গ্রামে গঠনমূলক কাজে জোর দেন, তাঁরা আধুনিক শিল্পের সাহায্য পরিহার করার কথা বলেন না। অন্যদিকে, যাঁরা আধুনিক শিল্প ও পরিকল্পনার উপরে জোর দেন, তাঁরাও গ্রামীণ উৎপাদন ও সংগঠনের গুরুত্ব অস্বীকার করেন না। এই দুই চিন্তাধারার প্রধান তফাৎ, উৎপাদনের লক্ষ্যের প্রশ্নে। প্রথমটির মতে, উৎপাদনের লক্ষ্য হবে গ্রামের নিজস্ব প্রয়োজন-ভিত্তিক স্বনির্ভরতা। শ্রী সুশীল ধাড়া প্রণীত 'গ্রামীণ অর্থনীতি' পড়ে মনে হয়, তিনি আদর্শগতভাবে প্রথমোক্ত চিন্তাধারায় বিশ্বাসী।

গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি যেহেতু কৃষি, কৃষির উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিই গ্রামের আর্থিক উন্নতির চাবিকাঠি, শ্রী ধাড়ার রচনার মুখ্য অংশ তাই, কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা, যেটা তাঁর কথায় 'বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত।' তবে, তাঁর পরিকল্পনায়, উচ্চ ফলনশীল ধান, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, ডিজেল পাম্পসেট ইত্যাদিরও স্থান আছে। গোঁড়া গান্ধীবাদী,

যাঁরা কেবলমাত্র স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারে বিশ্বাসী তাঁদের থেকে শ্রী ধাড়ার পথ তাই স্বতন্ত্র, যদিও তাঁদের মতই তিনি চরকা, ঢেঁকি এবং গো-পালনের পক্ষে অর্থনৈতিক সওয়াল করেছেন. গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির জন্য শ্রী ধাড়ার মতামত তাই অনেকটাই বাস্তব-ধর্মী, যার সঙ্গে বর্তমানের সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টার বেশ মিল আছে।

বইটি ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত। তারপর, সারা বিশ্বে এবং আমাদের দেশেও, আর্থিক উন্নতির পথ নিয়ে চিন্তাধারার অনেক ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। আধুনিক মত হলো, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি ত্বরান্বিত করতে হলে, গ্রামীণ উৎপাদনের বাজারে বিক্রী লাভজনক করতে হবে। সামর্থ্য অনুযায়ী, সেটা কোথাও খাদ্যশস্য, কোথাও ফল বা ফুল, কোথাও ডেয়ারী, আবার কোথাও বা চা-পাট-তুলো। প্রত্যেক গ্রামকেই যে খাদ্যে, বস্ত্রে এবং গো-পালনে স্ব-নির্ভর হতে হবে, তার কোনও যুক্তি নেই।

তবে, এই সর্বাধুনিক মত অনুযায়ী সারা দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি করতে এখনও অনেক দশক লাগবে। ইতিমধ্যে, যেসব গ্রাম বা অঞ্চল দেশব্যাপী বাজারের সুযোগ নিতে অপারগ হবে, তাদের আর্থিক স্ব-নির্ভরতা আনতে শ্রী ধাড়ার গ্রামীণ অর্থনীতি বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

'গ্রামীণ অর্থনীতি'—শ্রী সুশীল কুমার ধাড়া
প্রকাশক ঃ জনকল্যাণ ট্রাষ্ট, মহিষাদল, মেদিনীপুর, ১৯৫৫

১১

বড় সাহেব

রাধাকৃষ্ণ বাড়ী

প্রথম দৃশ্য

সময় ১৯৪৩-এর এক বর্ষণমুক্ত রাত্রি, দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত। স্থান তমলুক মহকুমার মহিষাদল ও সুতাহাটা থানার সীমান্তবর্তী একটি গ্রামের একটি বাড়ীর পিছনে ঢেঁকিশাল।

কয়েকজন যুবকের একটি ছোট দল বিশ্রামরত। তাঁদের সঙ্গে আছেন এক সুবেশ সুদর্শন ভদ্রলোক, একটু দূরে সালোয়ার-কামিজ-ওড়না পরিহিতা এক তরুণী দলেরই একজনের সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা বলছেন। পোষাকে চেহারায় তরুণীকে অবাঙালী বলেই মনে হয়। একটু পরেই ঐ তরুণী ঐ সুবেশ ভদ্রলোকের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"Why your father did not obey the orders of our Bara Saheb?"

সঙ্গীদের মধ্যে একজন তরুণীর পরিচয় দিয়ে বললেন—ইনি মিস সিং—লাহোর ইউনিভারসিটির ছাত্রী। এখন আমাদের 'গরম দলের' বড় সাহেবের পি.এ.। তবে হিন্দী বা ইংরেজী ছাড়া কিছু বোঝেন না বা বলতে পারেন না।

মিস সিং-এর পরিচয় পেয়ে দীর্ঘকায় ঐ ভদ্রলোক নতজানু হ'য়ে মিস সিং-এর পা জড়িয়ে ধরে বললেন—"Madam, you are my mother. I am your son. Please reduce the amount Please do not make me poorer. পাঞ্জাবী মহিলার উপযুক্ত জোরের সঙ্গে মিস সিং বললেন—"No, that can't be, you must pay." ভদ্রলোক কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি অনুরোধ করেই চলেছেন, মিস সিং বোধ হয় কিছুটা নরম হ'লেন। বললেন—"All right, you may try before Bara Saheb."

দলের লোকেরা উঠে পড়লেন, দুজন নিঃশব্দে একটু আগে এগিয়ে গেলেন, দুজন রইলেন পিছনে। বাকী কয়েকজনকে মাঝখানে রেখে দলটি চলতে শুরু করল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান ঃ গরম দলের কারাগার ভবন। অবশ্য কারাগার বলতে যে সুউচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত সুদৃঢ় অট্টালিকার কথা আমাদের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে তার চিহ্নমাত্র নাই। গ্রামের আর পাঁচটা সাধারণ মেটে বাড়ীর মত এটি একটি মাটির দোতলা বাড়ী খড় দিয়ে ছাওয়া। এই বাড়ীরই দ্বিতলের একটি ঘরে আমাদের পূর্ব পরিচিত ভদ্রলোককে রাখা হ'য়েছে। এই পরিবেশের মধ্যে যতটা সম্ভব তার সুখ-সুবিধা, আহারাদির ব্যবস্থা করা হ'য়েছে।

ভদ্রলোক সুতাহাটা থানার এক ধনী জোতদার পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান, এম. এ বি. এল তমলুকে ওকালতি করেন। তিনি খবর পেয়েছিলেন যে দেশদ্রোহিতামূলক কাজকর্মে যুক্ত থাকার অভিযোগে 'গরম দল' তার পিতার চল্লিশ হাজার টাকার অর্থদণ্ড করেছিল। ঐ টাকা আদায় না দেওয়ায় তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র কয়েকদিন আগে 'গরম দল' এর হাতে বন্দী হয়েছিলেন। বন্দী ভ্রাতা তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য দাদাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। দেখা করতে গিয়ে পথে তিনিও গরম দলের হাতে বন্দী হয়েছেন।

একটু পরেই দ্বারপ্রান্তে আমাদের পূর্ব পরিচিত পাঞ্জাবী তরুণী মিস সিংকে দেখা গেল। তিনি এগিয়ে এসে বন্দীকে জানালেন—যে 'বড় সাহেব' তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন—কুর্তা-পাঞ্জাবী পরিহিত, শ্মশ্রু-গুম্ফ-শোভিত অনতিদীর্ঘ এক নওজোয়ান। মিস সিং হিন্দীতে উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বন্দী মুখ তুলে আগন্তুকের দিকে চেয়ে রইলেন—ইনিই তবে 'গরম দলের' সেই বিখ্যাত 'বড় সাহেব'—যিনি ইতিমধ্যে চোর, ডাকাত, সমাজ বিরোধী এবং বৃটিশ সরকারের সহযোগী ব্যক্তিদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছেন! কেউ বলেন উনি পাঞ্জাবী—নাম হীরা সিং। আবার কেউ বলেন—না, উনি পেশোয়ার থেকে এসেছেন। তাঁর তরুণী পি. এ 'র মত ইনিও বাংলা বিশেষ বোঝেন না—হিন্দি বা ইংরাজীতে কথা বলেন।

মিস সিং বন্দীকে দেখিয়ে বললেন যে উনি অর্থদণ্ডের পরিমাণ কিছু কমিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন। বন্দীও আবার সেই আবেদন জানালেন। বড় সাহেব বললেন—"ঠিক হ্যায়, আধা কর দিজিয়ে। পুরা বিশ হাজার। লেকিন তিন দিনকে অন্দর মিলনা চাহিয়ে।"

বন্দী রাজী হ'লেন এবং সেই মর্মে তাঁর পিতার কাছে চিঠি পাঠালেন। তৃতীয় দিনেই ঐ টাকা আদায় হল। সেই দিনই সন্ধ্যায় বন্দী পালকি করে বাড়ী

ফিরলেন। বাড়ী এসে শ্বনলেন—যে তিনি যেদিন বন্দী হয়েছিলেন সেইদিনই সন্ধ্যায় তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাড়ী ফিরে এসেছেন।

* * * * * * * * *

এটি একটি ঘটনার অংশবিশেষ মাত্র। এ রকম বেশ কয়েকটি নাটকীয় ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। প্বলিশের গোয়েন্দা বলে সন্দেহভাজন কয়েকজন লোককে কারা যেন ডেকে নিয়ে চলে গেছে। তাদের আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। সবই নাকি এই 'বড় সাহেব' আর তার 'গরম দল'-এর কীর্তি। কিন্তু কেই বা এই 'বড় সাহেব' কেই বা তাঁর এই রহস্যময়ী পি. এ.—এ সম্বন্ধে অনেকদিন পর্যন্ত সঠিক কিছ্বই জানা যায়নি। যেমন প্বলিশ, তেমনই সাধারণ মান্বষ অনেক কিছ্ব সন্দেহ করেছে, অনেক গ্বজব শ্বনেছে। কিন্তু সত্যি কথাটা তখনও পর্য্যন্ত কেউ জানতে পারেনি।

ইতিমধ্যে গান্ধীজির নির্দেশমত আন্দোলন প্রত্যাহার করে জাতীয় সরকারের অবল্বপ্তি ঘোষণা করা হ'ল। পাঁচ শ'-এরও বেশী কর্মী সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করলেন। তারপর থেকে 'গরম দল' বা তার 'বড় সাহেবে'র কথা আর শোনা যায়নি।

আরও এক বৎসর কেটে গেল, ১৯৪৫-এর ২৫শে গান্ধীজি মহিষাদলে এলেন। তাঁর কাছে কিছ্ব লোক অভিযোগ করেছেন যে তমল্বকে তাঁর অন্বগামীরা হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

জাতীয় সরকারের র্পকারদের মধ্যে অজয়বাব্ব তখন জেলে। প্রথম সর্বাধিনায়ক সতীশ সামন্ত মশায় সবে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। গান্ধীজি তাঁর কাছে জানতে চাইলেন—যে হিংসাশ্রয়ী কাজকর্মের অভিযোগ সত্য কি না? সহকর্মীদের সম্মতি আদায় করে নিয়ে সতীশবাব্ব গান্ধীজির কাছে অকপটে সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেন। গান্ধীজি স্তম্ভিত হলেন। কিন্তু সতীশবাব্বর কাছে মনোযোগ দিয়ে শ্বনলেন যে কি অবস্থায় পড়ে তাঁরা হিংসার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সতীশবাব্বর ম্বখের কথাই বিশ্বাস করলেন না। নিজের বিশ্বস্ত অন্বচরদের পাঠিয়ে সরজমিনে তদন্ত করে নিঃসন্দেহ হ'লেন। তারপর তাঁর ঐতিহাসিক রায় দিলেন। কর্মীদের সমস্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে তিনি বললেন—"তোমাদের বীরত্ব, তোমাদের সহিষ্ণ্বতার আমি প্রশংসা করছি। তবে তোমরা অহিংসার আশ্রয়ে থাকলে আমি আরও খ্বশী হতাম।"

ক্রমশঃ মান্বষ জানল যে 'গরম দল' তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারেরই স্বষ্টি

এবং এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আশ্চর্য্যের কথা যে জাতীয় সরকারের কর্ণধারগণ প্রায় সবাই জীবনব্যাপী অহিংসা-মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। অথচ কি এমন ঘটল যাতে ঐ অহিংসাব্রতী ত্যাগীশ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ হিংসার আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন!

সে কথা জানতে হ'লে আমাদের আরও একটু পিছিয়ে যেতে হবে।

* * * * * * * * *

আগষ্ট আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে '৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সরকার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভাবাবেগ প্রশমিত হওয়ার পর সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে জাতীয় সরকারের কর্মকর্তাগণ কয়েকটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হলেন। সবচেয়ে বড় গ্রামাঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলার সমস্যা। বিশ্বযুদ্ধে হতমান বৃটিশ সরকার যেন তেন প্রকারেন শোষণ করে নিয়ে তাদের যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগাতেই বেশী ব্যস্ত। পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তর তাদেরই সৃষ্টি। এদিকে আবার বিপ্লবী দলকে শায়েস্তা করার জন্য দাগী চোর ডাকাতকে ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে এই চুক্তিতে যে তারা বিপ্লবীদলকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশকে সাহায্য করবে---বিনিময়ে তাঁদের কাজকর্মে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। ফলে গ্রামাঞ্চলে তারা ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। অল্প কয়েকদিন আগের (১৬ই অক্টোবর, ১৯৪২) প্রলয়ঙ্কর ঝড় বন্যায় ঘরবাড়ী, গরু মানুষ তো গেছেই-কৃষি প্রধান এই অঞ্চলের প্রধান উপজীব্য—ধান ও পান—একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ হ'য়ে গেছে। এই ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে আর একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ। ঝড় বন্যার পর বৃটিশ সরকারের দেওয়া টেষ্ট রিলিফের কাজে এবং দুর্ভিক্ষের মধ্যে নঙরখানা খোলার জন্য যে ছিটে ফোঁটা সাহায্য পাওয়া গেছল। এই স্বার্থান্বেষী দল কিছু কিছু অসাধু সরকারী কর্মচারীর সহায়তায় মুমূর্ষু মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে নিজেদের স্ফীতোদর স্ফীততর করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

এছাড়া সাংগঠনিক দিক থেকে জাতীয় সরকারের একটি বড় দুর্বলতা ছিল আর্থিক অসচ্ছলতা। মূলতঃ স্থানীয় সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এই আন্দোলনে এই দুর্ভিক্ষের মধ্যে যেটুকু স্থানীয় সাহায্য পাওয়া যাচ্ছিল তার মধ্যে হৃদয়ের যোগ থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। বাইরে থেকে কোন সাহায্য পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে পাছে বিপ্লবীদল কোন ধরণের সাহায্য পায়। সেইজন্য ১৬ই অক্টোবরের বিধ্বংসী সাইক্লোন ঝড় বন্যার খবর যুদ্ধকালীন সেন্সর ব্যবস্থার মহিমায় পুরো দুই

সপ্তাহ চেপে রাখা হয়েছিল। যুগান্তর পত্রিকা, মেদিনীপুরের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল বলে সম্পাদককে তিরস্কার করা হয়েছিল। আর দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোন বে-সরকারী সাহায্য-সংস্থাকে মেদিনীপুরে ঢুকতে দেওয়া হয় নাই। কাজেই জাতীয় সরকারের কর্মী বাহিনী এবং সরকারের অন্যান্য কাজের জন্য খরচ তো ছিলই।

রাষ্ট্রে এবং সমাজ জীবনে শান্তি স্থাপন এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে যারা সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত তাদের শাস্তি দিতে হবে। আর যারা শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাতীয় সরকারের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে—তাদের রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কাজকর্ম চিরতরে বন্ধ করে দিতে না পারলে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব নয়।

এই সঙ্গে একটা নতুন মাত্রা যোগ করল জাতীয় সরকারের বিচার বিভাগ। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর অল্প কিছুদিনের মধ্যে বিচার বিভাগ আশাতীত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই প্রকার মামলাই বিচারের জন্য আসত। এখন প্রশ্ন দাঁড়াল বিচারকের রায় মানার জন্য অনিচ্ছুক পক্ষকে কিভাবে রাজী করান যাবে। এছাড়া জাতীয় সরকারের প্রশাসনিক বিভাগ কর্তৃক আনীত চোর, ডাকাত সমাজদ্রোহী ও দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের জন্য প্রদত্ত শাস্তি স্বীকার বা কিভাবে কার্য্যকর হবে।

এই প্রশ্নের সহজ সরল উত্তর হ'ল যে পৃথিবীর আর পাঁচটা দেশের সরকার যেভাবে তাঁদের আদেশ বা নির্দেশ কার্যকর করে থাকেন—জাতীয় সরকারকেও তাই করতে হবে—অর্থাৎ প্রয়োজনে হিংসার আশ্রয় নিতে হবে।

কিন্তু জাতীয় সরকারের কর্মকর্তাগণের পক্ষে কিন্তু এই সহজ সমাধানটা এত সহজে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। সারা জীবন তাঁরা গান্ধী নির্দেশিত অহিংস সংগ্রামের পথেই জীবন উৎসর্গ করে এসেছেন। আজ তাঁদের পক্ষে চট করে এই সমাধান গ্রহণ করা সহজ ছিল না। অথচ বিকল্প কোনও পথের সন্ধানও তাঁরা দিতে পারছিলেন না।

বিরুদ্ধ পক্ষের বক্তব্যও কিন্তু উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। শক্তিমদমত্ত শত্রুর বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ গড়ে তোলার যে পথ গান্ধীজি দেখিয়েছেন—নিপীড়িত, নিরস্ত্র মানুষের কাছে তা চিরদিনই আশার আলো দেখাবে। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠিত সরকারের পক্ষেই পরিপূর্ণ অহিংস থেকে শাসনকার্য্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ভারত একদিন স্বাধীন হবেই। সেদিনের সেই স্বাধীন ভারতবর্ষে

কি পুলিশ বাহিনী ও সৈন্য বাহিনী থাকবে না। না হ'লে সেই নবীন রাষ্ট্র কিভাবেই বা বহিঃশত্রু এবং গৃহশত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করবে ?

হিংসা-অহিংসার এই টানাপোড়েনের মধ্যে কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া একটি মর্মান্তিক ঘটনা সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ৯ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ প্রায় ছয়শত সেনার একটি দল মহিষাদল থানার চণ্ডীপুর, মাশুড়িয়া, ডিহি মাশুড়িয়া এই তিনটি গ্রাম ঘিরে ফেলে গ্রামের সমস্ত পুরুষদের ধরে বাঁধের উপর নিয়ে গিয়ে বেত্রাঘাত ও নানাভাবে শারীরিক নির্য্যাতন করতে থাকে তারপর শুরু হয় এক অভূতপূর্ব নারী নির্য্যাতন—যার তুলনা সভ্য জাতির ইতিহাসে বিরল। ঐ একই দিনে প্রকাশ্য দিবালোকে ৪৬ অসহায় নারী ধর্ষিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক নরপশু একটি নারীর উপর উপর্য্যুপরি আক্রমণ চালায়।

নারী নির্য্যাতন এদেশে নতুন কোনও ঘটনা নয়। এর আগেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অসহায় নারীদের উপর ধর্ষণ বা অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সেই সবই ছিল সুযোগ সন্ধানী কাপুরুষদের দ্বারা সংঘটিত বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। মেদিনীপুরবাসীর সৌভাগ্য যে এইসব মা বোনদের নিয়ে কোনরূপ পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। পরিবারের লোকজন এবং বৃহত্তর সমাজ এইসব নারীদের রক্ষা করতে তাঁদের অক্ষমতা নতমস্তকে লজ্জার সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ৯ই জানুয়ারীর ঐ ঘটনা কোন কামোন্মত্ত নরপশুর উন্মাদ আচরণ নয়। বিপ্লবী দলের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে এই নারকীয় চক্রান্ত করা হয়েছিল।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরে আজও এই ঘটনার উল্লেখমাত্র করতে গিয়ে রক্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। আর বিয়াল্লিশের সেই আগুন ঝরা দিনগুলিতে বিপ্লবী কর্মী ও নায়কদের মনের আবেগ ও উত্তেজনা সহজেই অনুমান করা যায়। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে বাংলার তৎকালীন ফজলুলহক মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী সদস্য প্রাতঃস্মরণীয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই ঘটনায় বিশেষভাবে বিচলিত হয়েছিলেন। অল্প কয়েকদিন পরে তিনি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন—তাতে মেদিনীপুরের এই ঘটনা তাঁর পদত্যাগের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছিলেন।

এইসব ঘটনা পরম্পরা জাতীয় সরকারের কর্ণধারগণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁদের সামনে তখন দুটি মাত্র পথ খোলা। জাতীয় সরকারকে

একটা প্রতিষ্ঠিত সরকারের মর্য্যাদায় উন্নীত করতে হ'লে হিংসা-অহিংসার কূটতর্ক দূরে রেখে সরকারের কাজকর্ম তার নিজস্ব ছন্দ ও গতিতে চলতে দিতে হবে—যাতে দেশের মানুষের আশা আকাঙ্খা জাতীয় সরকারের কাজের মধ্যে সার্থকভাবে রূপায়িত হয় এবং এই সরকার সত্যিকারের জনগণের সরকার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অন্যথায় জাতীয় সরকার এবং সমস্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে সত্যাগ্রহের মাধ্যমে আত্মসমর্থন করতে হত।

অনেক বিচার বিবেচনা, চিন্তাভাবনার পর জাতীয় সরকারের উচ্চতম স্তরে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল যে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন তুলে জাতীয় সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত করা হবে না। প্রয়োজন হ'লে সরকারের বিচারালয় দোষী ব্যক্তিদের কারাদণ্ড, আর্থিক বা সামাজিক শাস্তিদান, দৈহিক শাস্তি বিধান—এমন কি চরম দেশদ্রোহিতার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত দিতে পারবেন। ঐ সঙ্গে আরও একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল যে কামোন্মত্ত নরপশুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য গ্রামের মেয়েদের হাতে ছোরা তুলে দেওয়া হবে। ভগিনী সেনার সেনানীবৃন্দ নিজেরা ছোরার ব্যবহার শিখে নিয়ে গ্রামের মেয়েদের শেখাবেন।

এই সঙ্গে স্থির হ'ল যে এইসব দণ্ডাদেশ কার্য্যকর করার ভার থাকবে বিশেষভাবে নির্বাচিত একদল সীমিত সংখ্যক বাছাই করা সৈনিকের উপর। শত্রুপক্ষের অর্থাৎ বৃটিশ রাজকর্মচারী এবং অপরাধীদের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য এই নতুন দলের নাম দেওয়া হ'ল 'গরম দল'।

স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যুৎ বাহিনীর জি. ও. সি. এন. সি. সুশীল কুমার ধাড়ার উপর এই দল সংগঠনের ভার পড়ল। উচ্চতম স্তরে তার প্রধান পরামর্শদাতা হ'লেন অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়। সুশীলবাবুর সংগঠন প্রতিভা সর্বজন বিদিত। খুব অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম এই চারটি থানায় গরম দলের সংগঠন গড়ে তুললেন। সাহস, স্নায়ুবল, শৃঙ্খলাবোধ এবং মন্ত্রগুপ্তির ক্ষমতা এইসব বিচার করে প্রতি থানায় ১০।১২ জন করে কর্মী বেছে নেওয়া হ'ল। এঁরাই হ'লেন গরম দলের action squad মূল কর্মী বাহিনী। তাছাড়া ছিলেন সহায়ক কর্মীদল এবং গরম দলের নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনী।

স্থির হয়েছিল গরম দলের একজন প্রধান পরিচালক বা সর্বাধ্যক্ষ থাকবেন। যাঁর নির্দেশ এবং পরামর্শমতই সমস্ত থানায় গরম দলের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে। স্বতঃসিদ্ধভাবেই সুশীলবাবুর উপর সেই দায়িত্ব এসে বর্তাল এবং একথা বললে

বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে শুধু বিদ্যুৎ বাহিনী বা ভগিনী সেনা সংগঠনই নয়—গরম দলেরও তিনিই ছিলেন প্রাণ পুরুষ। কর্মীরা আদর করেই তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'বড় সাহেব'। গোপনীয়তার জন্য এবং শত্রুপক্ষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াসে সেই নামটা ক্রমশঃ রাষ্ট্র হ'য়ে যায়। আর শালোয়ার কামিজ পরিহিতা হিন্দী ভাষিণী তাঁর P. A-র ভূমিকায় যিনি সার্থকভাবে রূপদান করেছিলেন তাঁর পিতৃদত্ত নাম হ'ল গিরিবালা দাস—আন্দোলনের সময় নাম বদলে রাখা হ'ল জ্যোৎস্না দাস। সেই নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। '৪২-এর আন্দোলনের প্রারম্ভকালে তিনি ওয়ার্ধায় মহিলাশ্রমে পাঠরতা ছিলেন। বেশ কয়েক বছর ওয়ার্ধায় থাকার ফলে হিন্দী ভাষাটা প্রায় মাতৃভাষার মতই আয়ত্ব করেছিলেন। আন্দোলনের প্রথম যুগে তিনি ওয়ার্ধাতেই গ্রেপ্তার হ'ন। পরে ছাড়া পেয়ে সোজা তমলুকে চলে আসেন এবং ভগিনী সেনা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁর ভাষাজ্ঞান, বুদ্ধি, সাহস ও কর্মক্ষমতা দেখে বড় সাহেব তাঁকে দলের অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং 'বড় সাহেবে'র 'পি. এ.'-র ভূমিকায় তিনি প্রায় কিংবদন্তীসুলভ প্রখ্যাতি অর্জন করেন।

১২
'ভগিনী সেনা'র রূপকার সুশীল কুমার
রীণা পাল

আমরা প্রায় সকলেই জানি 'ভগিনী সেনা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর। আজ থেকে ৫৩ বছর পূর্বে তমলুকের কিশোরী ও যুবতীগণের মধ্যে এমন কি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল যাতে তারা ভগিনী সেনার মত একটি প্রতিষ্ঠানে নিজেদের সামিল করেছিলেন – সেই প্রেক্ষাপট তুলে ধরাই আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃই ভগিনী সেনার কথা বলতে গেলে প্রথমে যে ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করতে হয় তিনিই হলেন ভগিনী সেনার প্রাণ পুরুষ প্রতিষ্ঠাতা স্বদেশ-সাধক সুশীল কুমার।

সত্যি কথা বলতে কি---মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান পাঠ্য পুস্তকের মধেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আমার গবেষণার বিষয় হিসেবে যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের মহিলাদের ভূমিকা স্থিরীকৃত হল তখনই আমাকে পুঁথিপড়া বিদ্যের বাইরে আসতে হ'ল। এতদিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জেনেছি বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের বই পড়ে (অবশ্যই শিক্ষক অধ্যাপকদের ক্লাস বক্তৃতার মাধ্যমেও কিছু জেনেছি)। এবারে এসে পড়লাম একেবারে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সান্নিধ্যে। তাঁদের সঙ্গে থেকে তাঁদের মুখে শুনে এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে যেন প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের পরিচয় পেতে থাকলাম।

আমি একদিন বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করলাম---কেমন করে যেন পেঁছে গেছি জীবন্ত কিংবদন্তী, এক সময়ে ইংরেজ সরকারের চোখে 'ডেঞ্জারাস পারসন', তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সমর ও স্বরাষ্ট্র সচিব, বিদ্যুৎ বাহিনীর জি. ও. সি. এবং ভগিনী সেনার প্রতিষ্ঠাতা সবার সুশীলদার কাছে। মুখে মুখে শুনে আমার অবচেতনে তাঁর অবয়ব সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে কোনভাবেই বাস্তবের সুশীল কুমারকে মেলাতে পারলাম না। মনে মনে কল্পনা করেছিলাম এক দীর্ঘদেহী পালোয়ানী অবয়ব যিনি শুধু দেশদ্রোহীদের ধরেন

আর প্রয়োজনে কঠোর দণ্ড দেন। কিন্তু সে জায়গায় প্রত্যক্ষ করলাম ছিপ ছিপে গড়নের শিশুর সারল্য মাখা মুখ মণ্ডলের অধিকারী এক সহজ ব্যক্তিত্ব; যিনি যাবতীয় সুকোমল বৃত্তির অধিকারী। অন্তরের এই সুকোমল বৃত্তি না থাকলে তো তিনি ভগিনী সেনার মত সংগঠন গড়ে তুলতে পারতেন না। যা হোক্ হুক চাকিয়ে তার হাতে তুলে দিলাম একটি চিরকুট, যেটি আমার পরিচয় পত্র হিসেবে দিয়েছিলেন আর একজন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়। মনে মনে ভয়ানক দুশ্চিন্তা—কি জানি কি হয়। উনি চিঠি পড়ছিলেন; তার মধ্যেই স্মার্ট হয়ে (ভেতরে বুকের দুরু দুরু কাঁপুনি থাকা সত্ত্বেও) বলে ফেললাম, "আমি আমার থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছি; হোটেলেই থাকব।" স্নেহশীল কণ্ঠে উত্তর হলো, 'তুমি আমার এখানেই থাকবে।' তারপর দীর্ঘদিন তার ওখানে তাঁরই সান্নিধ্যে থেকেছি; তিনিই সঙ্গী ঠিক করে দিয়েছেন (তাঁরাও এক সময়ের স্বাধীনতা সংগ্রামী) আমাকে গ্রামে গ্রামে সঠিক স্থানে পেঁাছে দেওয়ার জন্য। তথ্য সংগ্রহ করে কখনও কখনও অনেক রাত্রিতে ফিরেছি। তিনি সস্নেহে সংগৃহীত তথ্য শুনে প্রয়োজন মত নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও তিনি সারাদিন নানা সমাজসেবামূলক কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং কঠোর পরিশ্রম করতেন (এখনও করেন), তবুও তিনি কখনও বিরক্ত হতেন না। এমনিভাবেই কখন যে তিনি আমার পরম শুভাকাঙ্খী 'জ্যেষ্ঠু' হয়ে গিয়েছেন এবং আমি হয়েছি তাঁর স্নেহাস্পদ 'রীণুমা' (তিনি এভাবেই আমায় সম্বোধন করেন) টের পাইনি।

বস্তুত ভগিনী সেনা বাহিনী প্রতিষ্ঠার পূর্বে তমলুকের নারী জাগরণের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের যাত্রাপথে এগিয়ে আসতে তমলুকের নারী সহজে বা হঠাৎ পারেনি। প্রথম দিকে বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে পুরুষকর্মীগণ মেয়েদের কাছে সভা সমিতির খবর ও আন্দোলন সংক্রান্ত খবর পেঁাছে দিতেন। বিশিষ্ট নারী কর্মীগণকে সভা সমিতিতে বক্তৃতার জন্য আনা হত এবং বিশেষভাবে মহিলা শিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হত। এ ব্যাপারে তমলুকের সুতাহাটা থানার বাসুদেবপুর গান্ধী আশ্রম এবং মহিষাদলের সুন্দরা শিক্ষণ শিবির উল্লেখের দাবি রাখে।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তমলুকের মহিলারা সামনে এসে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগদান করেননি। নেপথ্যে থেকে ভাইদের-স্বামী-পুত্রদের দুঃসাহসিক যাত্রায় অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ জোগিয়েছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হ'ল আইন

অমান্য আন্দোলন। লবণ সত্যাগ্রহের সূচনা লগ্ন থেকে তমলুকের মহিলাদের পর্দার আড়াল সরে গেল। মহিলারা বাঁধ ভাঙা স্রোতের বেগে এগিয়ে আসতে লাগলেন এবং আইন অমান্য করে দলে দলে গিয়ে জেলখানা ভর্তি করে ফেললেন। ১৯৩০-এর এপ্রিল থেকে ১৯৩৪-এর মে মাসের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তমলুক মহকুমার বহু মহিলা আইন অমান্য করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

মেদিনীপুরে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূত্র ধরে সরকারী অফিস, আদালত, থানা ও কোর্ট ইত্যাদি দখল করার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাতে দেখা যায় জেলার মধ্যে কেবল তমলুক মহকুমার মহিলারা দখল অভিযানে অংশ নেওয়ার সুযোগ লাভ করেন। ঐ অভিযানে (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২) নেতৃত্ব দিয়ে শহীদ হন ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী দেবী। এই মহীয়সী শহীদের রক্তে ধন্য হ'ল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। সেই দখল অভিযানেরই চূড়ান্ত পরিণতি হ'ল ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর সুতাহাটা থানার দ্বারিবেড়্যা গ্রামে ভগিনী সেনা বাহিনীর প্রতিষ্ঠা।

থানা, সরকারী অফিস-আদালত ইত্যাদি দখল অভিযানের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসেবে নেমে এল সমগ্র তমলুক মহকুমায় ব্রিটিশের অত্যাচার। আর তার সহায় হয়েছিল মুষ্টিমেয় দেশদ্রোহী। এই সমস্ত দেশদ্রোহীদের সহায়তায় গ্রামে গ্রামে শুরু হয়েছিল পরিকল্পনা মাফিক মহিলাদের উপর শারীরিক অত্যাচার ও নির্যাতন। এই নির্যাতন ও অত্যাচারের মোকাবিলা করার জন্যই অপেক্ষাকৃত দক্ষ মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের নিয়ে ভগিনী সেনা বাহিনী সৃষ্টির পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। আর এই সংগঠনের মূল রূপকার ছিলেন ব্রিটিশের মনে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী নড় সাহেব এবং ভগিনী সেনানীদের অধিকাংশের আদরের দাদা সুশীল কুমার।

১৭ই অক্টোবর ১৯৪২ সুতাহাটা থানার দ্বারিবেড়্যা গ্রামে ভগিনী সেনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন ধার্য হয়েছিল। কিন্তু ১৬ই অক্টোবর এক প্রলয়ংকর বন্যা এবং সাইক্লোন সব কিছু ওলটপালট করে দেয়। এই আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে তাঁদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অগ্রজকে তাঁর অভীষ্ট কর্মসূচী রূপায়ণে বিরত রাখতে পারবে না সে সম্পর্কে সেনানীরা কিন্তু নিশ্চিত ছিল। তাই চরম প্রতিকূলতা ঠেলে উদ্বোধক যখন কলার ভেলায় করে ১৮ই অক্টোবরের ঊষাকালে ঐ নির্দিষ্ট গ্রামে উপস্থিত হলেন তখন কিন্তু ভগিনীরা মোটেই বিস্মিত হননি।

১৭ই অক্টোবরের স্থলে ১৯শে অক্টোবর, ১৯৪২ বিকেলে ভগিনী সেনা

বাহিনীর উদ্বোধন হল। ভগিনীদের এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। সুশীল কুমার এই বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করলেন শ্রীমতী সুবোধবালা কুইতিকে। ভগিনী সেনানীরা যুযুৎসুর কিছু প্রয়োজনীয় প্যাঁচও সুশীলবাবুর নিকট শিক্ষা করেছিলেন। উদ্দেশ্য হ'ল ব্রিটিশ পশুদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা। তাছাড়া গ্রাম্য যুবতীরা যাতে আত্মরক্ষা করতে পারে সেজন্য ভগিনী সেনা বাহিনীর পক্ষ থেকে গ্রাম্য যুবতীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল দশ হাজার শানিত ছোরা। ভগিনী সেনা বাহিনীর এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র কংগ্রেস প্রচারপত্র লিখলো : "দুর্বৃত্তের হাত হইতে নিজেদের ইজ্জত বাঁচাইবার জন্য মহিলারা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সমীচীনই হইয়াছে। সাবাস মেদিনীপুরের নারী শক্তি।"

পরবর্তীকালে ভগিনী সেনা বাহিনীকে তমলুকে যে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল (১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২) সেই সরকারের জাতীয় সৈন্য বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ২১ মাস জাতীয় সরকার চলাকালীন ভগিনী সেনানীরা যে অত্যাচার সহ্য করেছেন তার আদি অন্ত নেই। এই সেনা বাহিনীর যে সকল সেনানী তাদের সরকার বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের তালিকা দেওয়া হল।

	নাম	গ্রাম	থানা	কারাদণ্ডের মেয়াদ
১।	কুমুদিনী ডাকুয়া	বরোদা	সুতাহাটা	দেড় মাস
২।	লক্ষীমণি হাজরা	রাজারামপুর	মহিষাদল	ছ' মাস
৩।	চারুশীলা জানা	বাসুদেবপুর	সুতাহাটা	ছ' মাস
৪।	মাখনবালা দাস	রাজারামপুর	সুতাহাটা	ছ' মাস
৫।	মেনকা ভৌমিক	চণ্ডীপুর	মহিষাদল	তিন মাস
৬।	প্রভাবতী সিংহ	সলাট	সুতাহাটা	ছ' মাস
৭।	গিরিবালা দে	নোয়াখালি তবে তমলুকে দাদার সঙ্গে বাস করতেন	মহিষাদল	সাত মাস
৮।	জ্যোৎস্না দাস	দুর্গাপুর	নন্দীগ্রাম	কয়েকদিনের হাজত বাস
৯।	রেণুকা পতি	গুয়াবেড়িয়া		এক বছর হাজত বাস

	নাম	নাম	থানা	কারাদণ্ডের মেয়াদ
১০।	সুশীলা বেরা	বাসাবেড়িয়া	সুতাহাটা	কয়েকদিনের হাজত বাস
১১।	বিভারাণী চক্রবর্তী	কোলাঘাট	পাঁশকুড়া	তিন মাস জেল

উপরোক্ত সেনানীদের মধ্যে কুমুদিনী ডাকুয়া, গিরিবালা দে এবং জ্যোৎস্না দাস জাতীয় সরকারের যে 'গরম দল' ছিল তার সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

এছাড়া কারারুদ্ধ হননি কিন্তু ভগিনী সেনা বাহিনীর সুতাহাটা থানার অন্যান্য সক্রিয় সেনানীরা হলেন চারুশীলা কুইতি (বাড় বাসুদেবপুর) বিধুমুখী বেরা (দ্বারিবেড়্যা), গৌরীবালা দলুই (অদুলিয়া), বিরজাবালা প্রামাণিক (বাড় ঘাসিপুর), মঙ্গলা জানা (দেউলপোতা), বাসন্তীবালা কর (শ্রীকৃষ্ণপুর), বাসন্তীবালা মাইতি (রাজারামপুর), চারুশীলা বেরা (দ্বারিবেড়্যা), ভগবতী দাস মহাপাত্র (গুয়াবেড়িয়া) এবং মহিষাদলের শান্তবালা ধাড়া।

ভগিনী সেনা বাহিনীর শৌর্য ও জনপ্রিয়তা প্রবাদ কাহিনীতে পরিণত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ভগিনী সেনা বাহিনীকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছিল এবং তার কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করতে বাধ্য হয়েছিল।

উপরে উল্লিখিত কারারুদ্ধ সেনানীদের অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখনই অনুভব করেছি এত বছর পরেও ভগিনী সেনানীরা আজও অগ্রজ প্রতিম জ্যেঠুকে (সুশীলবাবুকে) তাঁদের পথ প্রদর্শক বলেই জ্ঞান করেন; তিনিই তাঁদের সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেন। আবার ভগিনী সেনা বাহিনী বে-আইনী ঘোষিত হলে তিনিই সেনানীদের আত্মগোপন ও নিরাপত্তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও করে দেন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হবার পর স্বাভাবিকভাবেই সুশীল কুমার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে স্বাধীন ভারত গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর জীবনের পথ দিয়ে বহুজল গড়িয়ে যায়। ১৯৪২ থেকে তিনি অবসর নেন সক্রিয় রাজনীতি থেকে। এখনও জীবিত ভগিনী সেনানীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। তাঁদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার (পেনশনের ব্যবস্থা ইত্যাদি) জন্য আজও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন যেটা সচরাচর অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। সুতরাং 'ভগিনী সেনা' প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলেই তাঁদের প্রেরণা দাতা এবং প্রতিষ্ঠাতার প্রসঙ্গ অবিচ্ছেদ্যভাবে এসে যাবেই।

১৩

এক অবিস্মরণীয় মানুষ সুশীল কুমার

প্রদ্যোত কুমার মাইতি

দেশবরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনীতিবিদ, বহু গঠনমূলক কাজের প্রবক্তা ও সারস্বত সাধক শ্রী সুশীল কুমার ধাড়া (জন্ম ২রা মার্চ, ১৯১১) যে এক অবিস্মরণীয় মানুষ তা বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তাঁর বিচিত্র ও বহুবিধ কর্মময় জীবনের রূপরেখা আমরা কয়েকটি ভাগে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১

স্বাধীনতা সংগ্রামী সুশীল কুমার

লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০-৩২) অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সুশীল কুমারের স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনের সূত্রপাত ঘটে এবং বিয়াল্লিশের আন্দোলনের মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই সব আত্মত্যাগী মহান নেতাদের নেতৃত্বের ফলেই সম্ভব হয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনীপুর জেলার এক বিশেষ স্থান অধিকার করা। বিভিন্ন সময় মেদিনীপুরের জনগণ স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে নানাভাবে নিগৃহীত হলেও তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে কোনভাবেই নষ্ট করা সম্ভব হয়নি। জেলার অধিবাসীদের এই স্বাধীনচেতা মনোভাবের পশ্চাতে যে ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি কারণ বর্তমান ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।[১] মেদিনীপুরবাসীর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে ঐতিহাসিকরা যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনীপুর জেলার এক স্বতন্ত্র ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে।[২] আবার এই জেলার তমলুক মহকুমা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের ঝটিকা কেন্দ্র। আইন অমান্য ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সুশীল কুমারের কি ভূমিকা ছিল তা আমরা এই পর্বে আলোচনা করছি।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে (১২ই মার্চ, ১৯৩০) বে-আইনী লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে মেদিনীপুর জেলা বাংলা তথা ভারতবর্ষের যে শীর্ষস্থান অধিকার করে তা গান্ধীজী ও নেহেরুর লেখা থেকে জানা যায়।[৩] তমলুক

মহকুমার নরঘাট এবং কাঁথি মহকুমার পিছাবনী লবণ আইন ভঙ্গ করে লবণ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। হলদী নদীর তীরে অবস্থিত নরঘাট হয়ে ওঠে তমলুক মহকুমার ডান্ডী। এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য মহকুমা আইন অমান্য সমিতি ১৯৩০-এর ৩০শে মার্চ থেকে মহকুমার সর্বত্র সভা উদযাপনের ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাসেবক ও রসদ সংগ্রহ করতে থাকে। তমলুক শহরের উপর তমলুক রাজবাটীর এক আধা পরিত্যক্ত অংশে সত্যাগ্রহীদের অবস্থানের জন্য একটি শিবির স্থাপিত হয়। এখানে অবিভক্ত বাংলার নানাস্থান থেকে যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল মানুষেরা এসে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগ দেন।[৪] এই শিবির পরিচালনার জন্য আচার্য ও উপাচার্য পদে যথাক্রমে সতীশচন্দ্র সামন্ত ও সুশীল কুমার নিযুক্ত হন।

সুশীল কুমারের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সুগায়ক ভবতোষ দাস মহাশয়ের সংস্পর্শে এসে। উনি নিমতৌড়ী গ্রামে অবস্থিত দেশবন্ধু জাতীয় বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওঁর সঙ্গে আলাপের সূত্র ধরেই স্বাধীনতা সংগ্রামী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সামন্ত ও ধীরেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। কারণ এরা সবাই নিমতৌড়ীতে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৫] ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ঐ সময় তমলুক শহরে এক বড় জনসভার আয়োজন করা হয় যাতে করে জনগণকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত করা যায়। অজয়বাবুর নির্দেশে ঐ সভার কাজ শুরুর প্রথমেই সুশীল কুমার নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করেন এবং শ্রোতাদের মন জয় করে নেন। ঐ সভায় ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়ের ওজস্বিনী বক্তৃতা সুশীল কুমারকে ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে উঠতে যে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তা তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়।[৬] গান্ধীজীর নেতৃত্বে প্রস্তাবিত লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য ঐ দিন স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। নাম তালিকাভুক্তির সময় দেখা গেল প্রবীনদের সঙ্গে তরুণ সুশীল কুমারও এগিয়ে এসে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করার জন্য নাম লেখান। তা দেখে অজয়বাবুরা খুশীই হন।[৭] জাতীয় আন্দোলনের সেনারূপে এই হল সুশীল কুমারের প্রথম স্বীকৃত পদক্ষেপ।

এরপর ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ করে অজয়বাবুর পরিচালনাধীনে আসন্ন আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য গ্রামগুলিতে ঘুরে বেড়ান।

তাছাড়া ঐ সময় থেকে অজয়বাবু প্রমুখ মহকুমার কংগ্রেস নেতাদের পরিচালনাধীনে যে সব সভা সমিতি হত তাতে সুশীলবাবু সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে শুরু করেন এবং ঐ সব সভা সমিতিতে 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করে[৮] তিনি জনগণকে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠতে সহায়তা করেন এ অনুমান করা চলে

লবণ সত্যাগ্রহ চলাকালীন চার-পাঁচদিনের মধ্যে শিবিরের আচার্য সতীশচন্দ্র গ্রেপ্তার হলে শিবির পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে সুশীল কুমারের উপর। বয়স তখন তাঁর মাত্র কুড়ি বছর। অথচ তাঁরই পরিচালনাধীনে বহু বয়স্ক সত্যাগ্রহী ঐ শিবিরে অবস্থান করতেন। সুশীলবাবুর ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক মাধুর্য এমনই ছিল যে বয়স্করাও শিবির শৃঙ্খলা মেনে চলতেন। সংগঠকরূপে এটি তাঁর দক্ষতার নিদর্শন। দেড়মাস এভাবে শিবির পরিচালনার পরে একদিন তিনি গ্রেপ্তার হলেন এবং বিচারে এক বছর কারাদণ্ড হয়। মেদিনীপুর ও রাজশাহী জেলে তাঁকে কাটাতে হয় এবং উভয় জেলেই তাঁর সঙ্গী ছিলেন সতীশবাবু।[৯]

রাজশাহী জেলে থাকাকালীন 'অনুশীলন সমিতির'র বহু নেতার সঙ্গে সুশীলবাবুর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে এসে তাঁর যে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে তা তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায়।[১০] রাজশাহী জেলের যে ওয়ার্ডে সুশীলবাবু থাকতেন সেই ওয়ার্ডের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব তাঁর উপরে অর্পিত হলে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করতে সমর্থ হন। জানা যায়, সতীশবাবুর ব্যবস্থাপনায় এই দায়িত্ব ভার তাঁর উপর চেপেছিল এবং এর উদ্দেশ্য ছিল কাজের মধ্য দিয়ে সুশীলবাবুকে গড়ে তোলা।[১১]

রাজশাহী জেল থেকে অনেককে দমদম স্পেশাল জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা হতে থাকে। ওখান থেকে আগে সতীশবাবুকে পাঠানো হয়। কিছুদিন পরে সুশীলবাবুকেও ওখানে পাঠানো হল। ওখানে জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানতে পারেন তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। দমদম জেলে সতীশবাবুর পাশেই সুশীলবাবুর থাকার ব্যবস্থায় তিনি যে বিশেষভাবে উপকৃত হন তা তাঁর উক্তি থেকে বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন ঃ "মুক্তি পর্যন্ত প্রায় ৩। ৪ মাস ঐভাবে পাশে পাশে বাস করায় জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। এ তো জেল নয়, প্রশিক্ষণ আশ্রম। স্বল্পভাষী, সুদৃঢ় চরিত্রের এই মানুষটির নৈকট্য ক্রমশঃ আমাকে দুরূহ কাজে ব্রতী করতে লাগল। তাঁর বুক-ভরা স্নেহ অনুভব করতাম যখন মাঝে মাঝে

আদর করে আমার গলা জড়িয়ে নিতেন ও উভয়ে ঘুমোতাম। এটাকে ঠিক জেলখানা বলা চলে না। একটা শিবির।"[১২]

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে সমস্ত সত্যাগ্রহীদের কারামুক্তি ঘটলে সুশীলবাবুও মুক্তি পান। এরপর কংগ্রেস সংগঠনের কাজে তিনি লিপ্ত হন। কর্মক্ষেত্র সমগ্র মহিষাদল থানার অন্তর্গত ১২টি ইউনিয়নব্যাপী। এভাবে বেশী দিন চলল না কারণ গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে গান্ধীজী-সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা গ্রেপ্তার হতে থাকেন। তমলুক মহকুমা কংগ্রেসের নির্দেশে সুশীলবাবু গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য গা-ঢাকা দিয়ে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। পূর্বের ন্যায় তার কর্মকেন্দ্র ছিল সমগ্র মহিষাদল থানাব্যাপী এবং দেখা গেল অবিভক্ত তমলুক মহকুমার মধ্যে এই আন্দোলন সবচেয়ে বেশী সফলতা অর্জন করে মহিষাদল থানায়। ট্যাক্স বন্ধ করায় ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারীরা গ্রামবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাতে থাকে। তথাপিও সুশীলবাবুদের প্রচার ও পরিচালনার ফলে এই অত্যাচার তারা সহ্য করতে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে ওঠেন। এ প্রসঙ্গে সুশীলবাবুর নেতৃত্ব সম্পর্কে মহকুমার নেতাদের বলতে শোনা যেত: "সুশীল সাহসী, নির্ভীক, দুঃখজয়ী, পরিচালনা জানে। ছোট বড় সকলকে নিয়ে কাজ করতে ও করাতে পারে, ভাল ভাষণ দেয়, কাজ আদায়ের কৌশলও জানে।"[১৩]

ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের সংগে যুক্ত থাকায় সুশীলবাবুর আড়াই বছর কারাদণ্ড হল। প্রথমে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে এবং পরে হিজলী স্পেশাল জেলে তাঁকে রাখা হয়। প্রায় দেড় বছর কারাবাসের পর তাঁর মুক্তি হয় এবং তাঁর উপর গৃহে অন্তরীণের সরকারী নির্দেশ জারি হয়। পূর্বের ন্যায় জেল জীবনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পথে যে সহায়ক হয়েছিল তা তাঁর পরবর্তীকালের কার্যাবলী থেকে জানা যায়। তিনি লিখেছেন: "বাইরে গান্ধীজীর আন্দোলনের কর্মী হয়েও অন্তরে সযত্নে লালন পালন করেছিলাম ১৯৩০-এর রাজশাহী জেলের বিপ্লববাদের শিক্ষা আর ১৯৩১-এর দমদম অ্যাডিশনাল স্পেশাল জেলের লাঠি, ছোরা, যুযুৎসুর প্রশিক্ষণ।"[১৪] আবার ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলে কাঁথির স্বাধীনতা সংগ্রামী বলাই দাস মহাপাত্রের কাছে কুচকাওয়াজ শিখেছিলেন।[১৫] জেল জীবনের এসব শিক্ষা বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় সুশীলবাবু বিশেষভাবে কাজে লাগিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। বিপ্লববাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা তিনি স্বীকার করেছেন।

"সুযোগ পেলেই ঐ বিপ্লবের পথই ধরব মনের সে বাসনাকেও সদা জাগ্রত রাখার চেষ্টা করতাম। মেদিনীপুরের তিন জেলা শাসক হত্যার পর প্রতিবার আমি অন্তরে উৎফুল্ল হলেও অজয়দার নির্দেশে মুখ মন কিছুই খুলতাম না এ বিষয়ে। এছাড়া বীনা দাসের সাহসিকতা, শান্তি-সুনীতির দুর্ধর্ষ ও অতুলনীয় কৃতিত্ব আমার মনকে বিপ্লববাদের দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল।"[১৬]

সরকারের বিশেষ অনুমতিক্রমে সুশীলবাবু কোলকাতায় থেকে পড়াশুনা শুরু করেন (১৯৩৫-১৯৩৯)। ঐ সময় আই. এ. পাশ করে বি. এ. পড়া শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে বি. এ. পাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কোলকাতায় থাকাকালীন তিনি দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের কর্মসঙ্ঘের সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রভাবিত হন।[১৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে (১৯৩৯ খ্রীঃ) ভারতবাসীদের মধ্যে এক প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সুশীলবাবু ঐ সময় কোলকাতা থেকে মহিষাদলে ফিরে এসে কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঐ সময় সুতাহাটা থানার বাসুদেবপুর গ্রামে অবস্থিত কুমারচন্দ্র জানা প্রতিষ্ঠিত গান্ধী আশ্রমে সত্যাগ্রহী প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়। সারা ভারতবর্ষে নির্বাচিত সত্যাগ্রহীর সংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজার; তারমধ্যে সুশীলবাবু অন্যতম। এইসব সত্যাগ্রহীদের কাজ ছিল গ্রামে ঘুরে ঘুরে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সব রকম অসহযোগিতার কথা প্রচার করা। ইংরেজ সরকার এসব আদৌ সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলনা তাই সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার শুরু হয়। সুশীলবাবুও গ্রেপ্তার হলেন এবং এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করলেন। মুক্তি হল ১৯৪১ এর গোড়ার দিকে।[১৮]

কারামুক্তির পর সুশীলবাবু মহিষাদলে ফিরে এসে থানা কংগ্রেস কমিটির সহ-সম্পাদকরূপে কাজ শুরু করেন। এদিকে যুদ্ধ ও দেশরক্ষার অজুহাতে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারমূলক বিধি ব্যবস্থা এবং বঞ্চন নীতি (denial Policy) জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলে। সমুদ্র পথে জাপানী আক্রমণের ভয়ে ভীত ব্রিটিশ সরকার যখন এতদঅঞ্চলের জনগণের নৌকো ও বাইসাইকেল ধ্বংস করতে এবং এতদঅঞ্চলের মানুষদের মুখের অন্ন চুরি করতে শুরু করল তখন স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা অবস্থার মোকাবিলার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মহিষাদল থেকে এক মাইল দূরে সুন্দরা গ্রামে কংগ্রেস অফিস স্থানান্তরিত করে (১৯৪২ এর এপ্রিলের মাঝামাঝি) কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। এই

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্বভার পড়ল সুশীলবাবুর উপর।[১৯] সুতাহাটা এবং আরও কিছু পরে তমলুক থানায়ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে উঠল। স্বেচ্ছাসেবকদের শৃঙ্খলা ও প্রাথমিক রণকৌশল শেখাবার জন্য কতকগুলি শিবির খোলা হল।, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পাশাপাশি সুতাহাটার বাসুদেবপুর আশ্রমে একটি স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীও গড়ে তোলা হল যার নাম দেওয়া হয় "ভগিনী সেনা শিবির"।[২০] বাসুদেবপুর গান্ধী আশ্রমের প্রাণ পুরুষ কুমারচন্দ্র জানার ইচ্ছানুসারে সপ্তাহে নির্দিষ্ট দুটি দিন বিকালে ওখানে স্বেচ্ছাসেবিকাদের প্রশিক্ষণ দিতে যেতেন সুশীলবাবু। এই প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত ছিল "সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তার ২য় বিশ্বযুদ্ধজনিত পরিণতি, বিশ্বের বিবদমান দুটি প্রধান শিবিরে বিভক্ত শক্তিসমূহ এবং তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভৃতি" সম্পর্কে অবহিত করা এবং সেই সঙ্গে "জনসভায় ভাষণ দেওয়ার" কৌশল ইত্যাদি। সুশীলবাবুর একনিষ্ঠ প্রয়াসের ফলে বেশ কয়েকজন মহিলা কর্মী ভাষণদানে বিশেষ দক্ষ হয়ে ওঠেন। এঁরা হলেন সুবোধবালা কুইতি, কুমুদিনী ডাকুয়া, গিরিবালা দে প্রমুখ।[২১] ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, পঞ্চানন বসু প্রমুখ শীর্ষ স্থানীয় নেতারা এইসব স্বেচ্ছাসেবক / স্বেচ্ছাসেবিকা শিবির পরিদর্শন করতেন ও উৎসাহ দিতেন।[২২]

আগষ্ট বিপ্লবকে সফল করা এবং ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের হাত থেকে মহিলাদের আত্মরক্ষার জন্য মেদিনীপুর তথা সমগ্র বাংলার আর কোথাও এরূপ মহিলা বাহিনী গড়ে ওঠেনি। অবশ্য এই বাহিনী গঠন করার অনুপ্রেরণা মূলতঃ সুশীলবাবুর কাছ থেকেই আসে এবং তাই তিনি তাদের আত্মরক্ষার জন্য প্যারেড, যুযুৎসু, ছোরাখেলা, আক্রমণ প্রতিরোধ কৌশল ও নার্সিং শিক্ষা দেন।[২৩] এই বাহিনীতে প্রায় পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছাসেবিকা যোগ দেন এবং এরাই পরে 'ভগিনী সেনা'রূপে পরিচিত হন। এই 'ভগিনী সেনা'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় সুতাহাটা থানার দ্বারিবেড়্যা গ্রামে ১৯শে অক্টোবর, ১৯৪২। যদিও পূর্ব নির্দ্ধারিত দিনটি ছিল ১৭ই অক্টোবর। তা সম্ভব হয়নি ১৬ই অক্টোবরের বন্যা ও সাইক্লোনের জন্য। উদ্বোধক ছিলেন সুশীলবাবু। উদ্বোধনের সময় তিনি যে তেজোদীপ্ত বক্তৃতা দেন তাতে ভগিনীরা ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বকিছু ত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর হন। সুশীলবাবু 'ভগিনী সেনা'র অধিনায়িকা পদে সুবোধবালা কুইতিকে নিয়োগ করলেন। তাঁদের

সবাইকে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। কিছুপরে মহিষাদলেও 'ভগিনী সেনা' গড়ে ওঠে।[২৪] অপরদিকে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্য থেকে পরীক্ষিত বাছাই করা স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ইতিপূর্বে 'বিদ্যুৎ বাহিনী' গড়ে তোলা হয়েছে। বিদ্যুৎ বাহিনীর সদস্যদের এক বিশেষ প্রতিজ্ঞ পত্রে স্বাক্ষর করতে হত। এদের সব রকম প্রশিক্ষণ দিতেন সুশীলবাবু। এই বাহিনী প্রথম মহিষাদল থানায় গড়ে ওঠে এবং আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৯৪২ এর ২৬শে সেপ্টেম্বর। প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী বরদাকান্ত কুইতি এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন। এই বাহিনীর প্রথম জি. ও. সি. হলেন সুশীলবাবু এবং কম্যাণ্ডেণ্ট হলেন গোপীনন্দন গোস্বামী। পরে পরে সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম ও তমলুক থানায় বিদ্যুৎবাহিনী গড়ে ওঠে। অবিভক্ত তমলুক মহকুমার বাকী দুটি থানায়—পাঁশকুড়া ও ময়না তা গড়ে ওঠেনি।[২৫] বিদ্যুৎ বাহিনী গঠন অনুষ্ঠানে সুশীলবাবু জি. ও সি পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যে ভাষণ দেন তার কিছু অংশ হল : "বিদ্যুতের শক্তি ও গতিবেগ নিয়ে এই বাহিনী ব্রিটিশ বিতাড়ন করে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের কাজের উপযোগী হবে। এই আশায় এর এই নামকরণ হল। গণদেবতার আশীর্ব্বাদ-এর শিরে বর্ষিত হোক।"[২৬]

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখতে হবে যে "এই 'বিদ্যুৎ বাহিনী ও ভগিনী সেনা'র একমাত্র সংগঠক, পরিকল্পনা ও পরিচালনাকারী ছিলেন শ্রী সুশীল কুমার ধাড়া। সব থানাতে[২৭] গিয়ে তিনি সঠিক রূপদান ও সংগঠন গড়ে তোলেন। ঐ সময় থেকে সুতাহাটায় গড়ে ওঠা বাহিনীর নাম হ'ল 'বিদ্যুৎ বাহিনী ও ভগিনী সেনা' এবং এই বাহিনীর নারী-পুরুষ সেনানীরা ঝড় বন্যায় বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে ও সেবাকার্যে ব্রতী হন।"[২৮]

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ তমলুকের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রক্তে রাঙা একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। এটি ছিল ব্রিটিশ শক্তির ঘাঁটি—থানা, আদালত ও অন্যান্য সরকারী অফিস আদালত—আক্রমণ করে দখল করার নির্দ্ধারিত দিন। অবিভক্ত তমলুক মহকুমার বিভিন্ন থানা দখলের জন্য জনগণের মিছিল পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল মহকুমার বিভিন্ন নেতাদের উপর। সুশীলবাবুর উপর পড়ল মহিষাদল ও সুতাহাটা। আগষ্ট আন্দোলনের পূর্ব থেকেই সুতাহাটার অবিসংবাদী জননেতা কুমারচন্দ্র জানা কারারুদ্ধ থাকায় সুশীলবাবুকে সুতাহাটা থানার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। মহিষাদল সুশীলবাবু নিজ পরিচালনাধীনে রেখে সুতাহাটার জন্য একদল মরিয়া কর্মী বাহিনী গঠন করে

তাদের উপর থানা দখলের ভার দেবেন স্থির করেন এবং ২৭শে সেপ্টেম্বরের ২।৩ দিন পূর্বে তিনি গান্ধী আশ্রমে গিয়ে পরিকল্পনার ছক এঁকে দেন। প্রতিটি ইউনিয়নের অতি বিশ্বস্ত কর্মীদের উপর এই অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করার গুরু দায়িত্ব দেন।[২৯] সুতাহাটার সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন ডাঃ জনার্দন হাজরা।[৩০]

থানা, সরকারী অফিস আদালত দখল অভিযানে মহকুমার প্রথম সারির কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কেবলমাত্র সুশীলবাবু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে একটি বিশাল মিছিল মহিষাদল থানার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এই মিছিলে বিদ্যুৎ বাহিনীর প্রাধান্য ছিল। এই শোভাযাত্রার মধ্যে সামরিক পোষাক পরা বিদ্যুৎ বাহিনীর সৈনিক ছিল ৩০ জন। এঁরা সবাই সুশীলবাবুর কাছ থেকে গেরিলা পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। বিদ্যুৎ বাহিনীর জি. ও. সি. সুশীলবাবুর বাঁশীর সংকেতে বাহিনীর সৈনিকরা কখনো শুয়ে পড়ল, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে এগোল, আবার কখনও পিছু হটার সংকেত পেয়ে পিছু হটল। কিন্তু সরকার পক্ষের বেপরোয়া গুলি চালনার ফলে ১৩ জন শহীদ হন। সুশীলবাবুকে লক্ষ্য করে কমপক্ষে পাঁচবার রাইফেল চালান হয়, কিন্তু ব্যক্তিগত কৌশল এবং সহ-সৈনিকের ইঙ্গিতে (সম্ভবতঃ ঈশ্বরের কৃপায়) প্রতিবারই এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।[৩১] এক্ষেত্রে সুশীলবাবু যে অভাবনীয় সাহসিকতা ও তেজদীপ্ত বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তা ইতিহাস কখনও বিস্মৃত হতে পারবে না।

সমগ্র মহকুমায় থানা ইত্যাদি দখল অভিযানের পর সরকারের দমন নীতি চরম আকার ধারণ করে। শুরু হয় সন্ত্রাসের রাজত্ব—জনজীবন দুবিসহ হয়ে ওঠে। আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করার জন্য সরকার স্থানে স্থানে সৈন্যদের বসবাসের ছাউনির ব্যবস্থা করে। সেই সকল ছাউনি থেকে সৈন্যরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে হানা দিয়ে অত্যাচার যেমন প্রহার, লুঠপাট, ঘর পোড়ান, গ্রেপ্তার, নারীধর্ষণ ইত্যাদি চালিয়ে যেতে লাগল। সরকার ঐ সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য গোয়েন্দা নিয়োগ করে।

এরূপ পরিস্থিতি থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য মহকুমা কংগ্রেস নেতৃত্ব যখন এক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশ সরকারের শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়ার পরিকল্পনার কথা ভাবছে সেই সময় ১৬ই অক্টোবর (১৯৪২) এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার ফলে তা আপাততঃ বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হয়ে

উঠল না। তাই জাতীয় সরকার ১৯৪২ এর ১৭ই ডিসেম্বরের পূর্বে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মহকুমা সংগ্রাম কমিটির সভায় (তমলুক থানার দক্ষিণ নারিকেলদা গ্রামে) জাতীয় সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সরকার গঠনের 'রূপকার ও চিন্তানায়ক' তথা 'প্রাণ পুরুষ' ছিলেন অজয়বাবু (যিনি পরবর্তীকালে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন)। ঐ সভায় ঠিক হয় ঐ সরকারের প্রথম 'সর্বাধিনায়ক' (ডিকটেটর) হবেন সতীশচন্দ্র সামন্ত এবং ঐ সরকারের একটি মন্ত্রীসভা থাকবে। অর্থমন্ত্রী হবেন অজয়বাবু এবং স্বরাষ্ট্র ও সমর মন্ত্রী হবেন সুশীলবাবু। অন্যান্য বিভাগের মন্ত্রীও স্থির হয়। ঐ সভায় 'বিদ্যুৎ বাহিনী ও ভগিনী সেনা'কে ঐ সরকারের জাতীয় বাহিনী (ন্যাশনাল মিলিশিয়া) রূপে গ্রহণ করা হয় এবং সুশীলবাবুকে তার সি-ইন-সি (কম্যান্ডার-ইন চিফ) পদে নির্বাচিত করা হয়। অবশ্য ১৯৪৩ এর ২৬শে জানুয়ারী তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্ত এই 'বিদ্যুৎ বাহিনী ও ভগিনী সেনা'কে জাতীয় সরকারের অধীন জাতীয় সৈন্য বাহিনীরূপে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন।[৩১]

দক্ষিণ নারিকেলদা গ্রামের সভার সিদ্ধান্তের কয়েক দিনের মধ্যেই ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ মহকুমার অধিকাংশ স্থানে জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হল। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহিষাদল থানার সুন্দরা শিবিরে যেভাবে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছিল তার বিবরণ সুশীলবাবু দিয়েছেন। "এই উপলক্ষে জাতীয় পতাকা অভিবাদন ও কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হ'ল—পোষাক পরে এবং বাদ্যভাণ্ড বাজিয়ে। ....২৯শে সেপ্টেম্বরের পর প্রায় আড়াই মাস পরে সামরিক পোষাক পরে বাদ্যভাণ্ডে বাজনার তালে তালে কুচকাওয়াজ করার নির্দেশ দিতে খুবই ভাল লাগছিল।"[৩২] যাহোক্ জাতীয় সরকার যতকাল চালু ছিল সুশীলবাবু অত্যন্ত নিপুণভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। এটা সম্ভব হয়েছিল সুশীলবাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর জন্য কারণ তিনি বয়স্কদের যেমন স্নেহভাজন ছিলেন তেমনি অনুজপ্রতিমদের বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন। তাই গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অথবা কর্তৃত্বপূর্ণ পদ লাভের ক্ষেত্রে কোন রকম ব্যক্তিত্বের সংঘাত বা বিরোধ দেখা দেয়নি। সবাইকে নিয়ে মানিয়ে চলার ক্ষমতা তার ছিল বলেই তিনি এতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর তিনি জাতীয় সৈন্য বাহিনীর প্রধান এবং

স্বরাষ্ট্র ও সমর মন্ত্রীরূপে তাঁর কাজ শুরু করে দেন। প্রথমেই তিনি মন্ত্রীসভার অনুমতিক্রমে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সেনা বাহিনীকে সম্প্রসারিত করেন। তাই তিনি সুতাহাটা, তমলুক ও নন্দীগ্রামে অবস্থিত স্বেচ্ছাসেবক / বিদ্যুৎ বাহিনীগুলির জি. ও. সি. পদে যথাক্রমে বিশ্বভূষণ কুইতি, নরেন্দ্রনাথ জানা ও ফণীভূষণ ভক্তাকে নিযুক্ত করে জাতীয় সরকারের সেনা বাহিনীকে শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হন। প্রতিটি থানার বাহিনীর জন্য কম্যাণ্ডাণ্ট ও সহকারী কম্যাণ্ডাণ্ট প্রভৃতি পদ সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় নির্দেশও তিনি পাঠান।[৩৩]

ব্রিটিশ সৈন্য ও দেশীয় পুলিশরা দিবালোকে নারীদের উপর অত্যাচার এমন কি ধর্ষণ করতে শুরু করলে, তখন সরকারের স্বরাষ্ট্র ও সমর বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে এবং জাতীয় সেনা বাহিনীর প্রধান হিসেবে সুশীলবাবু ভগিনী সেনাদের হাতে ছোরা যেমন তুলে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করলেন তেমনি ছোরা চালাবার শিক্ষাদানের উপর জোর দিলেন। ইতিপূর্বে সুতাহাটার গান্ধী আশ্রমে স্বেচ্ছাসেবিকাদের তিনি ছোরা চালানোর শিক্ষা ইত্যাদি দিতে যেতেন তা আমরা পূর্বেই জেনেছি। এখন আরও পরিকল্পিতভাবে নিজেই উদ্যোগী হয়ে বেশ কয়েকজন অগ্রণী মেয়েদের শেখালেন যাঁরা আবার অন্যান্য মেয়েদের যুযুৎসু ও ছোরা চালানো শেখাতে লাগলেন। অগ্রণীদের মধ্যে ছিলেন সুবোধবালা কুইতি, কুমুদিনী ডাকুয়া, গিরিবালা দে, চারুশীলা জানা প্রমুখ।[৩৪] ফলে মেয়েরা আক্রান্ত হলেও ছোরার মহিমায় অত্যাচারিত হননি।[৩৫] তাছাড়া পরবর্ত্তীকালে জাতীয় সরকারের নির্দেশে "ভগিনী সেনা" বিভাগ মহকুমার তরুণীদের হাতে ৬। ৭ হাজার ছোরা তুলে দিয়েছিলেন তাদের সতীত্ব রক্ষার শেষ অস্ত্ররূপে। এসব ছোরার শতকরা ৯৫ ভাগ মহকুমার কামারদের তৈরী ও যথেষ্ট ধারালোও। ফল শুভ হয়—নারীদের উপর অত্যাচার কমে যায়।[৩৬]

নারীদের উপর অত্যাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থার পাশাপাশি গ্রামবাসীদের উপর পুলিশী সবরকম নিপীড়ন-অত্যাচার যাতে হ্রাস পায় তার দিকেও জাতীয় সরকার দৃষ্টি দেয়। তাই যারা ব্রিটিশের কোনভাবে সহায়তা করত, যারা গ্রামে গ্রামে তাদের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করছে, কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছে বা করছে, যারা পুলিশের সঙ্গে গিয়ে গ্রামে গ্রামে অত্যাচারে সাহায্য করেছে বা করছে, যারা সরকারী টেস্ট রিলিফ, কণ্ট্রোল ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে ঠকিয়ে মুনাফা করছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই 'বিদ্যুৎ বাহিনী ও ভগিনী সেনা'র একটি অতি গোপন সংস্থা 'গরম দল' নাম নিয়ে সুশীলবাবুর নেতৃত্বে

গড়ে ওঠে।[৩৭] ১৯৪৩-এর জানুয়ারীর পূর্বে এটি যে গড়ে ওঠে তা বোঝা যায় কারণ ঐ মাসেই প্রথম গরম দলের কাজ শুরু হয়।[৩৮]

অবিভক্ত তমলুক মহকুমার খুব বাছাই করা তরুণ-তরুণীরাই এই সংস্থার সদস্যপদ লাভে সমর্থ হয়েছিলেন যাঁদের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশী নয়। এরমধ্যে তিনজন মহিলা সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন গিরিবালা দে (ছদ্মনাম ঊষা চৌধুরী), কুমুদিনী ডাকুয়া ও জ্যোৎস্না দাশ (বর্তমানে তমলুক সান্ত্বনাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী)। এটি তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সেনা বাহিনীর হাডকোর বা এ্যাকসান স্কোয়াড বা মৃত্যু বাহিনীরূপে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু কেউ এর পরিচয় জানত না। এই সংস্থার বা দলের সদস্যদের কাছে এর স্রষ্টা ও পরিচালক 'বড় সাহেব' ছদ্ম নামে পরিচিত ছিলেন।[৩৯] লক্ষণীয় এই যে কারা এই গরম দলের সেনানী, আবার কেই বা পরিচালক সুনির্দিষ্টভাবে কেউই তা জানত না। যাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য এই দলটি গড়ে ওঠে তাদের বা তাদের ছেলেদের গ্রেপ্তার করে অর্থ আদায়েরও চেষ্টা করা হত। অংশ গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি স্বরূপ প্রাণদণ্ডও দেওয়া হয়েছে।[৪০] সমগ্র মহকুমায় এরূপ শতাধিক শাস্তি গরম দলের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। সুশীলবাবু লিখেছেন: "এইরূপ একশতটিরও বেশী হত্যা ও চরম কায়িক শাস্তি দান সংঘটিত হয়েছে গরম দলের হাতে যার ৯০-৯৫টি আমার হাতে বা আমারই পরিচালনায় ও আমারই উপস্থিতিতেই হয়েছে—একথা স্বীকার করতে আজ আর আমার দ্বিধা নেই।"[৪১]

গরম দলের কাজ কর্ম সম্পর্কে সুশীলবাবু লিখেছেন: "মজার কথা, এই যে ব্রিটিশের গোয়েন্দা বিভাগ সম্পূর্ণ অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত দেশদ্রোহীদের সন্ধান করতে বা আমাদের কারাগারে বন্দী একজনকেও উদ্ধার করতে। কোন কারাগারের সন্ধানও করে উঠতে পারেনি..........জাতীয় সরকারের নিয়ম শৃঙ্খলা ও গোপনীয়তা ছিল দুর্ভেদ্যবর্মে মোড়া এটা তার প্রমাণ। প্রেম, প্রীতি, স্নেহ ও ভালবাসার অচ্ছেদ্য বন্ধনে কয়েক সহস্র সেনানী ও সরকারের পরিচালকবৃন্দ এমনভাবে আবদ্ধ ছিল যে এই সুকঠিন শৃঙ্খলা কোন সময় তাদের কাছে শৃঙ্খল বা বন্ধন হয়ে ওঠেনি।"[৪২] আবার এই গরম দল ছিল "দুষ্টের আতঙ্ক, শত্রু সরকারের ত্রাস ও তাদের গোয়েন্দা বিভাগের বিস্ময় ও নাগরিকবৃন্দের শান্তি, তৃপ্তি ও ভরসার বস্তু।"[৪৩]

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের আমলে গরম

দলের দ্বারা যে সব হিংসাত্মক কাজ হয়েছিল তা জাতীয় সরকারের সাফল্যের সহায়ক ছিল। প্রকৃতপক্ষে যারা ইংরেজ শাসনের সহায়ক বা পৃষ্টপোষক ছিল তাদের বিরুদ্ধেই মূলতঃ গরম দলের জেহাদ। এদিক থেকে গরম দল তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছিল তা অনস্বীকার্য এবং এরজন্য সিংহভাগ কৃতিত্বের দাবীদার হলেন সুশীল কুমার।

তমলুক মহকুমায় বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় সীমার মধ্যে সুশীলবাবু একবার ইংরেজ সরকারের হাতে ধরা পড়েন (২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩)। ইতিপূর্বে জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক সতীশবাবু ধরা পড়ে গেছেন। প্রথম শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে রয়েছেন অজয়বাবু ও রমেশবাবু। অজয়বাবু রমেশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে সুশীলবাবুর টাউন বেলের ব্যবস্থা করেন। টাউন বেলের জন্য যে মোক্তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি হলেন বিভূতি ভট্ট। সুশীলবাবু ও বিভূতিবাবু উভয়েই টাউন বেলের দিন থেকেই আত্মগোপন করেন। পুলিশের নির্যাতন এড়াবার জন্য বিভূতিবাবু স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে সুন্দরবনে (২৪ পরগণা) আত্মগোপন করে বসবাস করতে শুরু করেন। এদিকে সুশীলবাবুকে ধরার জন্য পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তাঁর মাথার দাম সরকার দশ হাজার টাকা ঘোষণা করে অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় যে সুশীলবাবুকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবে সে সরকার ঘোষিত ঐ টাকা পাবে।[৪৪] কিন্তু সরকারের সে আশা পূরণ হয়নি। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর নির্দেশে আন্দোলন স্থগিতের প্রেক্ষাপটে তিনি পরে আত্ম সমর্পণ করেন। এই হ'ল সুশীল কুমারের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের কাহিনী।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার অবিভক্ত তমলুক মহকুমার জনগণের সার্বিক সহযোগিতার ফলে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ভারতবর্ষের ঐ সময়কার অন্যান্য স্থানের জাতীয় সরকারের তুলনায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।[৪৫] সরকারী ও বেসরকারী প্রতিবেদনে এখানকার সমান্তরাল সরকারের ভূয়সী প্রশংসার কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৪৬] বাংলার তদানীন্তন প্রিমিয়ার (মুখ্যমন্ত্রী) মিঃ ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন: "মেদিনীপুরে একটি সমান্তরাল সরকার স্থাপিত হয়েছিল যার অধীনে সৈন্য, পুলিশ বাহিনী ও গুপ্তচর বিভাগ ছিল; যার ছিল নিজস্ব জেলখানা যেখানে অপরাধীদের রাখা হত। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণ (ব্রিটিশ) সরকারকে অচল করে দিয়েছিল।" (বঙ্গানুবাদ)[৪৭] মেদিনীপুরে সমান্তরাল সরকার বলতে এখানে

দীর্ঘস্থায়ী তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের (১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২—৩১শে আগষ্ট, ১৯৪৪) কথাই বলা হয়েছে। এখানকার আন্দোলনের সাফল্যের মূলে ছিল জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা এবং এই সহযোগিতা লাভ সম্ভব হয়েছিল মহকুমার কংগ্রেস নেতাদের নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য। আবার এখানকার কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর জনগণের ভরসা ও বিশ্বাস ছিল অনেক বেশী। ১৬ই অক্টোবরের বিধ্বংসী ঝড় ও বন্যার পর সরকারী অসহযোগিতা যখন চরম পর্যায়ে তখন কংগ্রেস নেতৃত্ব মহেন্দ্র রিলিফ কমিটি গঠন করে জনগণকে সাহায্য করতে শুরু করে। তাছাড়া বিপদগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য ও সেবাকার্যের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বাহিনী ও ভগিনী সেনার ভূমিকা কংগ্রেস নেতৃত্বকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে থাকে। তমলুক মহকুমায় কংগ্রেস সংগঠনকে সর্বশক্তিমান করে গড়ে তুলতে ছোট বড় সব স্তরের কংগ্রেস নেতার ভূমিকা যে ছিল তা আমাদের অজানা নয়। তথাপিও বিয়াল্লিশের আন্দোলনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কোন একক মানুষের অবদান বিচার করতে হলে সুশীলবাবুর কথাই মনে আসা স্বাভাবিক। কারণ তাঁর দায়িত্ব প্রাপ্ত বিভাগগুলিই প্রধানতঃ জাতীয় সরকারের সাফল্য এনে দিতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছিল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুশীলবাবুর একনিষ্ঠ ও নিখাদ স্বাধীনতা সংগ্রামীর চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ করে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষের যে সব আত্মগোপনকারী স্বাধীনতা সংগ্রামী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়রূপে চিহ্নিত করলে খুব ভুল হবে মনে হয় না। তমলুক মহকুমার বিভিন্ন থানায় স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দান করে এবং তাদের নিয়ে বিদ্যুৎ বাহিনী ও ভগিনী সেনা গঠন করে, 'গরম দল' সৃষ্টি করে। সি-ইন-সি-এর দায়িত্ব গ্রহণ করে, জাতীয় সরকারের সমর ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব পালন করে, সম্মুখ যুদ্ধে অর্থাৎ থানা দখল অভিযানে অংশ গ্রহণ করে এবং সর্বোপরি মহকুমার শতকরা ৯০ ভাগ জনগণকে জাতীয় কংগ্রেসের কর্মধারার সঙ্গে একাত্ম করে তুলতে তিনি যে কর্মদক্ষতা ও সাংগঠনিক যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা থেকে আমরা তাঁকে সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় নেতারূপে চিহ্নিত করতে পারি।

২

রাজনীতিবিদ সুশীল কুমার

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সুশীলবাবুর কারা মুক্তি ঘটে এবং মহকুমার জনগণ কর্তৃক বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হন। মহিষাদলে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা সভায় তিনি ভাষণ দান কালে জনগণের শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ কামনা করে বলেছিলেন যেন কোন লোভ, কোন মোহ, কোন দুর্ব্বলতা তাঁকে পথ ভ্রষ্ট করতে না পারে।[৪৮] অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি যে আদর্শ, নিষ্ঠা ও সততার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করেছিলেন ঠিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী জীবনে যেন তিনি অনুরূপভাবে পরিচালিত করতে পারেন এই শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ তিনি জনগণের কাছে কামনা করেছিলেন। তিনি যে প্রকৃত দেশ সেবকের মহান আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন তা তাঁর কারামুক্তির পর মহিষাদলের ভাষণ থেকে সহজে উপলব্ধি করা যায়।

কংগ্রেস রাজনীতির পাশাপাশি দেশ গঠনের কর্মকাণ্ডে সুশীলবাবু জড়িয়ে পড়লেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে তিনি নির্দল প্রার্থী মহিষাদলের রাজা দেবপ্রসাদ গর্গের কাছে পরাজিত হন। তমলুক মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্রয়ীর মধ্যে বাকী দুজন শ্রী সতীশ চন্দ্র সামন্ত এম. পি. (সাংসদ) এবং শ্রী অজয় কুমার মুখার্জী বিধানসভার সদস্য পদে নির্বাচিত হন। এমন কি অজয়বাবু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের মন্ত্রী সভায় স্থান পান। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নিয়ে সুশীলবাবু বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ এর মধ্যে কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে নামমাত্র যুক্ত থেকে গান্ধীজির প্রদর্শিত পথে অর্থাৎ শ্রেণীহীন, শোষণহীন সর্বোদয়ী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নানা গঠনমূলক কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে কাজ করে যেতে থাকেন।[৪৯]

ইতিমধ্যে কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে দুর্নীতি স্বজনপোষণ ও ক্ষমতা দখলের লড়াই ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায়। এর থেকে কংগ্রেস সংগঠনকে রক্ষা করার জন্য ১৯৫২-তে 'কামরাজ পরিকল্পনা' অনুসরণ করে কেন্দ্র ও রাজ্যে মন্ত্রী সভার সদস্য সংখ্যা হ্রাস করা এবং প্রভাবশালী নিষ্ঠাবান কংগ্রেস সদস্যদের সংগঠনের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। তাই ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী অজয়বাবুকে এই পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসায় তিনি

মন্ত্রী সভা থেকে বাদ পড়েন। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় মারা যান (১লা জুলাই, ১৯৬২) এবং তাঁর স্থলে মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্ল সেন যিনি তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা অতুল্য ঘোষের একান্ত অনুগত ছিলেন। অজয়বাবু মন্ত্রীসভা থেকে বাদ পড়লেন কিন্তু প্রায় ৯ মাস কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ পেলেন না। সুশীলবাবু অজয়বাবুর প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বের এই আচরণ আদৌ মেনে নিতে পারলেন না। কংগ্রেসের তদানীন্তন গোষ্ঠীতন্ত্র তাঁকে ভীষণ ভাবে পীড়িত করতে লাগল।

অজয়বাবুর প্রতি এই আচরণের ফল ভাল হবে না বুঝতে পেরে অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেন গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ এর জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদে অজয়বাবুকে নির্বাচন করলেন। অজয়বাবু এই দায়িত্ব খুশী মনে গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হলেন। এতে কংগ্রেসের কায়েমী ক্ষমতা ভোগীদের অসুবিধে দেখা দিতে লাগল এবং তারা গোষ্ঠীতন্ত্র কায়েম করে অজয়বাবুর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে সভাপতির পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা করল।

সুশীলবাবু তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরু এবং একান্ত শ্রদ্ধাভাজন অজয়বাবুর উপর পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস নেতৃত্বের এই অবিচার নীরবে মেনে নিলেন না। তিনি পুরাতন আদর্শবাদী, সৎ ও নিষ্ঠাবান কংগ্রেসীদের নিয়ে গড়ে তুললেন 'বাংলা কংগ্রেস।' অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি জেলায় জেলায় সংগঠন গড়ে তোলেন। অজয়বাবুর ভাবমূর্তি ও সুশীলবাবুর সংগঠন প্রতিভার সমন্বয়ে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে বাংলা কংগ্রেসের সৃষ্টি হ'ল। গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথে বাংলা কংগ্রেসের কর্মসূচী গৃহীত হ'ল। অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেন পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস গোষ্ঠীর প্রভাব প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার জন্য সুশীলবাবু ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনকে বেছে নেন। ঐ নির্বাচনে অজয়বাবু বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে তমলুক ও আরামবাগ উভয় কেন্দ্র থেকেই দাঁড়ান। অজয়বাবু উভয় কেন্দ্রেই জয়লাভ করেন। আরামবাগ কেন্দ্রে তিনি তদানীন্তন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে পরাজিত করেন। এমন কি বাঁকুড়ায় অতুল্য ঘোষও পরাজিত হন এই নির্বাচনে। বাংলা কংগ্রেসের রাজনীতিতে আবির্ভাবের ফলে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় কংগ্রেস সেই প্রথম সংখ্যা গরিষ্ঠতা হারায়। ফলে ঐ সময় বাংলা কংগ্রেস ও বামদলগুলি যৌথভাবে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন করে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ

নেন অজয়বাবু। ঐ মন্ত্রীসভায় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীরূপে নির্বাচিত হন সুশীলবাবু। বাংলা কংগ্রেস গঠন করে সুশীলবাবু বুঝিয়ে দিলেন নিষ্ঠা ও সততার জয় তখনও সমাজে স্বীকৃত হত। তাই তাঁর কঠোর শ্রম ও নিষ্ঠা তাঁকে সাফল্য এনে দিয়েছিল এবং অজয়বাবুকে যে অপমান পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হয়। কিছুকালের জন্য পশ্চিমবাংলার রাজনীতি থেকে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের অবসান ঘটে।

এরপর পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়ে যায়। বামদলগুলি বাংলা কংগ্রেসকে ভাঙ্গার খেলায় সচেষ্ট হয় এবং সফলও হয়। বাংলা কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয় (৬ই জুন, ১৯৫২)। সুশীলবাবুর একান্ত কর্ম প্রচেষ্টার ফলে যে বাংলা কংগ্রেস গান্ধীজীর আদর্শকে সামনে রেখে চলার শপথ নিয়েছিল সেই দলের অধিকাংশ কর্মী ও নেতা স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে ওঠায় সুসংহত রাজনৈতিক দলের মর্যাদা হারাল। সুশীলবাবু রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থ কেন্দ্রিক আচার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন।"

ঠিক ঐ সময় জয়প্রকাশ নারায়ণ সার্বিক বিপ্লবের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন। সৃষ্টি হ'ল জনতা দলের। সুশীলবাবু এই দলে যোগ দিলেন। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার আতঙ্কিত হয়ে জয়প্রকাশসহ তাঁর অনুগামীদের যেমন সুশীল কুমার ধাড়া, গৌরকিশোর ঘোষ, হরিপদ ভারতী, সাংবাদিক বরুন সেনগুপ্ত প্রমুখদের কারারুদ্ধ করলেন। কিছুকাল পরে ছাড়া পেয়ে ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের লোকসভা নির্বাচনে জনতা দলের প্রার্থীরূপে সুশীলবাবু অংশ নেন এবং তাঁরই দীর্ঘ দিনের সংগ্রামী জীবনের সহকর্মী ও অন্যতম গুরু কংগ্রেস প্রার্থী সতীশচন্দ্র সামন্তকে তমলুক কেন্দ্র থেকে পরাজিত করেন। এবার তিনি রাজ্যস্তর থেকে সর্বভারতীয় স্তরের রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে নেন এবং তিনি পশ্চিমবঙ্গের জনতা দলের কর্ণধাররূপে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা পান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় লোকসভা বেশী দিন স্থায়ী হ'ল না। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় লোকসভা নির্বাচনে অংশ নিয়ে তিনি পরাজিত হন। সেই থেকে রাজনীতিতে অবসর নিয়ে তিনি গঠনমূলক কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেন এবং আজও তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি যে যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন তা তাঁর উপরোক্ত রাজনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টা তথা কর্মধারার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। পশ্চিমবাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে বাংলা কংগ্রেস সৃষ্টি করে সাময়িকভাবে

পশ্চিমবাংলার দুর্নীতিগ্রস্ত জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বকে পর্যুদস্ত করে তিনি যোগ্য রাজনীতিবিদের পরিচয় দিয়েছিলেন। আবার জয়প্রকাশ নারায়ণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি দুর্নীতিমুক্ত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জনতা দলের প্রার্থী হতেও দ্বিধা করেন নি। এই দল বদলের মূল লক্ষ্য ছিল তাঁর একটাই — সেটি হ'ল দুর্নীতিমুক্ত সরকার তথা সমাজ গড়ে উঠুক। তারজন্য দল বদলেও তিনি দ্বিধা করেননি। দুর্ভাগ্যের বিষয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস বর্তমান কালের ন্যায় তখনও যথেষ্ট ছিল তাই শেষ পর্যন্ত তিনি রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত রকম সংস্রব ত্যাগ করে সমাজ সেবার কাজে এগিয়ে আসেন।

৩

সাংগঠনিক ও গঠনমূলক কাজের প্রবক্তা সুশীল কুমার

সাংগঠনিক ও গঠনমূলক কাজের প্রবক্তা হিসাবে তিনি এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় বাল্য অবস্থা থেকেই চোখে পড়ে। বন্ধুদের নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যার সূত্রপাত হয় তা আজও প্রবহমান। ১৯৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহীদের শিবির পরিচালনার ক্ষেত্রে, রাজশাহী জেলে অবস্থান কালে, বিদ্যুৎ বাহিনী, ভগিনী সেনা ও গরম দল গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে ১৯৫২-তে চৈনিক আক্রমণের সময় দেশের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের জন্য ১ লক্ষ টাকা ও কিছু সোনার গহনা সংগ্রহ করে ঐ সময়কার রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর হাতে অর্পণ, রাইফেল ক্লাব স্থাপন করে চৈনিক আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে মহিষাদলের মধ্যাহিংলীতে স্থানীয় যুবক যুবতীদের রাইফেল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অবিচারের প্রতিবাদে বাংলা কংগ্রেস গঠন করে (১৯৫২ খ্রীঃ), হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১ মাস ব্যাপী ৪৫০টি গণ অনশন শিবির স্থাপনের মধ্য দিয়ে ২ লক্ষ সত্যাগ্রহীকে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করে (১৯৫২ খ্রীঃ) এবং সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে নাগরিক নিরাপত্তা কমিটি গঠন করে (১৯৫২ খ্রীঃ) তিনি তাঁর অভাবনীয় সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রেও তিনি স্মরণযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন এ বিষয়ে একটি তালিকা ইতিপূর্বে উপস্থিত করা হয়েছে।[৫১] তবে তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি গঠন করে (১৯৫২ খ্রীঃ) তিনি এক মহৎ

উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হন। এই কর্মটির লক্ষ্য হ'ল তমলুকের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ২৫টি খণ্ডে প্রকাশ। ইতিমধ্যে (১) তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রথম 'সর্বাধিনায়ক' সতীশচন্দ্র সামন্তের জীবনী গ্রন্থ 'সর্বাধিনায়ক' (২) "সংগ্রামী পুরুষ কুমারচন্দ্র" (৩) "অজেয় পুরুষ অজয় কুমার" এবং (৪) স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনপঞ্জী (১ম খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছে। "তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতি" প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদে রয়েছেন। এই সমিতির উদ্যোগে একটি চারতলযুক্ত "স্মৃতি সৌধ" নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। স্মৃতি সৌধটি নিমতৌড়ীতে অবস্থিত। এখনও পুরোপুরি নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি। প্রায় ১০৭ ডেঃ জায়গা নিয়ে এর এলাকা। এই স্মৃতি সৌধটিতেথাকবে তমলুকের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তৈল চিত্র এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার রঙিন চিত্র যাতে করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তমলুকের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনা জানার সুযোগ পায়। আর থাকছে দেশ বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পুস্তক সমৃদ্ধ এক উন্নতমানের পাঠাগার। সর্বসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সভা, অনুষ্ঠান, আলোচনা চক্র ইত্যাদির জন্য একটি হল ঘরের ব্যবস্থাও হয়েছে। সুশীলবাবুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে স্মৃতি সৌধের কাজ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একক মানুষের চেষ্টায় লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে এই কাজ করা যে কত কষ্টকর তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। যতদূর জেনেছি ইতিপূর্বে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে গিয়েছে। পাঠাগারের জন্য বহু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পুস্তক বিভিন্ন দেশের হাইকমিশন বা এম্ব্যাসির সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি সংগ্রহ করেছেন। চেষ্টা করে চলেছেন লক্ষাধিক টাকা মূল্যের এই ধরনের পুস্তক বিভিন্ন দাতাদের মাধ্যমে সংগ্রহ করার যাতে করে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস গবেষকরা এখানে বসে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। তাঁর অধিকাংশ পরিকল্পনা মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ। জাতি ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে এ জাতীয় পরিকল্পনার গুরুত্ব যে অসীম তা বোধ করি অস্বীকার করার উপায় নেই। গ্রামীণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁর পরিকল্পনাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্যের আলোচনা স্মরণ করা চলে।[৫২]

সংগঠক ও গঠনমূলক কাজের প্রবক্তা হিসাবে তাঁর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা শুধু প্রশংসাই নয়, অনুকরণযোগ্যও।

৪

সারস্বত সাধক সুশীল কুমার

সারস্বত সাধক হিসেবে সুশীল কুমারের প্রতিষ্ঠাও উপেক্ষণীয় নয়। তাঁর সাহিত্য সাধনার স্থান ছিল প্রধানতঃ জেলখানা। কারা অন্তরালে বসেই তিনি সারস্বত সাধনার সুযোগ করে নেন। তাঁর কথায়ঃ "জেল লাইব্রেরী ঘেঁটে যা কিছু আমার পড়বার যোগ ছিল তার কোনটি বাদ দিইনি মনে হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য, শরৎ ও বঙ্কিম-সাহিত্য আবার পড়লাম যা ওখানে পেলাম। ভাল একখানা বই পেয়েছিলাম আক্রাম খাঁ সাহেবের 'কোরাণ শরিফে'র বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ সুন্দর। কোরাণ-এর সুন্দর ব্যাখ্যা আমার চিত্তকে মুগ্ধ করল। এই বই তবু দু বার পড়লাম। গীতার সঙ্গে মিলিয়ে বহু জায়গায় এক ও অভিন্নতা দেখে চমৎকৃত হলাম। ঐ মহা মিলনের বহু উদ্ধৃতি খাতায় লেখা হয়ে আজও আমার কাছে আছে। ১৯৪৭-এ মুক্তির পর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য এই উদ্ধৃতি খুব কাজ দিত। ঐ সময়ে জেলে রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা খুব মন দিয়ে বারে বারে পড়েছি। গীতাঞ্জলি ও রবীন্দ্র কবিতা বেশ পূর্বেই আমাকে মুগ্ধ করেছিল, এখন সম্পূর্ণভাবে বন্দী করলো। ১৯৪০-৪১ এবং ৪৪-৪৭-এর জেল-জীবনে গান্ধী চিন্তার উপর কতিপয় মূল্যবান পুস্তক এবং রাজনীতি ও অর্থনীতির বেশ কিছু বই পড়বার সুযোগ হয়। ঐ সময়ে কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চীন যাত্রী' পড়ে এত অভিভূত হই যে, ভারতীয় জাতীয় চরিত্র গঠনে তার অত্যন্ত প্রয়োজনবোধ করি।"[৫১] এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে তিনি একজন অভিনিবিষ্ট পাঠক ছিলেন এবং সেই সূত্র ধরে বোধ করি তিনি লেখা শুরু করেন। তাঁর রচনার ক্ষেত্র বহুবিধ—সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, কাব্য ইত্যাদি। তাঁর প্রকাশিত পুস্তকগুলি হল প্রবাহ (আত্মজীবনীমূলক রচনা), গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি বিপ্লব, জনতা সরকারের পতনের শিক্ষা, রাষ্ট্রভাষা হিন্দী-বাংলা ব্যাকরণ, মালা (কাব্যগ্রন্থ), প্রবন্ধ গুচ্ছ (বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধ সংকলন)। এছাড়াও অনেক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

সুশীলবাবুর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'প্রবাহ' পাঠ করলে ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তমলুক মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের বহু অজানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় যা অন্য কোন সূত্র থেকে পাওয়া যায় না বললে

চলে। তাছাড়া পুস্তকের মধ্য দিয়ে লেখকের জীবন দর্শন তথা মানব কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারকে জনপ্রিয় করার জন্য গান্ধীজীর অহিংস মতবাদে বিশেষ আস্থাবান হয়েও জাতীয় সরকারের স্বার্থে ব্রিটিশ শাসকদের যারা দালালী বা পৃষ্টপোষকতা করেছিল তাদের চরম শাস্তি এমন কি মৃত্যুদণ্ড দিতেও দ্বিধা করেন নি। গরম দলের 'বড় সাহেব' হিসেবে তিনি প্রবাহ-পুস্তকে তা স্বীকার করেছেন।[৫৪] এই স্বীকারোক্তিই তাঁর দৃঢ় হৃদয়ের পরিচয়বাহী। সর্বোপরি এই পুস্তকের রচনা শৈলী পাঠকদের যে মুগ্ধ করবে তা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

'গ্রামীণ অর্থনীতি' পুস্তকটিতে তিনি গ্রামীণ মানুষদের স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতির বনিয়াদকে দৃঢ় করার পরিকল্পনাটি তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে মৌলিকতার ছাপ চোখে পড়ে।

প্রাবন্ধিক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'প্রবন্ধ গুচ্ছ' পুস্তকটি ঐ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাছাড়া এমনও কিছু প্রকাশিত প্রবন্ধ রয়েছে যাতে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ সহজে চোখে পড়ে। প্রসঙ্গতঃ দুটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করছি —(১) "জাতীয় সংগ্রামে তমলুকের আইনজীবীগণ"

(২) "ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও গান্ধীজী" (পশ্চিমবঙ্গ, মহাত্মা গান্ধী সংখ্যা, বর্ষ-২৮, সংখ্যা ২৬-৩০, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৫২, পৃঃ ৬৭-৭৮)।" তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি" ইতিপূর্বে যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনী পুস্তক প্রকাশ করেছে সেইসব পুস্তকের মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে সুশীলবাবু বারংবার বর্তমান ও ভাবী প্রজন্মকে উদ্দীপিত করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিত এইসব জন নায়কদের দুঃখজয়ী জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এই মুখবন্ধগুলিতে তাঁর রচনা শৈলীর বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে।

রাষ্ট্রভাষা হিন্দী শিক্ষা শুরু করে (১৯৪১) শেষ পর্যন্ত জেল জীবনে এই ভাষায় যথেষ্ট বাুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। যার ফলশ্রুতি হ'ল "রাষ্ট্রভাষা ব্যাকরণ" প্রণয়ন। প্রথম খণ্ডে রইল শুধু ব্যাকরণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হল ট্রানশ্লেষণ ও কম্পোজিশন। দু-খণ্ডে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়াল দেড়শর মত। এগুলি ছাপা হয় ১৯৪৮ সালে। একটি খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর থেকে কিছু অর্থও পেয়েছিলেন।[৫৫]

তিনি যে যথার্থ জ্ঞান পিপাসু ছিলেন তার পরিচয়ও অজ্ঞানা নয়! 'ওমর খৈয়াম' ও 'কোরাণ শরিফ' এই মূল পুস্তক দুটি পড়ার উদ্দেশ্যে তিনি উর্দু ভাষা শিখতে শুরু করেন। এমন কি এক সাধারণ বন্দীর কাছে আরবী ভাষাও শিখতে থাকেন।[৫১] এমনই ছিল তাঁর পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ।

জেলে অবস্থান কালে ছোট-বড় প্রায় একশ'র বেশী কবিতা লিখেছেন। 'মালাকার' ছদ্ম নামে তিনি লিখতেন এবং মাঝে মাঝে কিছু কবিতা জেলের বাইরেও পাঠাতেন ঐ ছদ্মনামে। এই কবিতাগুলি হ'ল সেই সময়কার তাঁর "মনের ব্যথা-আনন্দ, হাসি-কান্না ও চিন্তা-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ।"[৫৭] সুশীল কুমার নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন। তাই তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মালা'তে লিখেছেন: "তবু আমি লিখি—আমার স্বাভাবিক উচ্ছল আবেগে। আর আমার প্রিয়জনরা পড়ে—তাদের প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার রসে তাকে ডুবিয়ে নিয়ে।"[৫৮] তিনি এও বুঝেছেন যে 'অন্তর্লোকের সাড়াই কবিতার উৎস।'[৫৯]

আধুনিক কালের কোন সমালোচক 'মালা' কাব্য গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন এর "অনেক কবিতাই লিরিক্যাল—যাদের স্বতোৎসারণ, আবেগের উচ্ছল প্রবাহ, অনুভূতির নিবিড়তা সহজ রূপের বন্ধনে ধরা পড়েছে, যেমন 'মালাকার', 'প্রিয়', 'মনে পড়া', 'মালা' প্রভৃতি কবিতা। ···শান্ত স্নিগ্ধ প্রেমানুভবের অপরূপ উদ্ভাস 'স্বপ্ন' কবিতাটি। ঐশী চেতনায় নিবেদিত কবিচিত্তের ব্যাকুলতা রূপবদ্ধ হয়েছে 'প্রার্থনা', 'গীতি' প্রভৃতি কবিতাতে। কবির হৃদয়ে সুন্দরের গভীর অনুভব ছিল; সেই সুন্দরকে কবি দেখেছেন বৈশাখের রুক্ষতায়, শ্রাবণের ধারা জলে, মর্তের ধূলিকণায়, গগনের সুনীল নীলিমায়, আলোর উচ্ছাসে, অন্ধকারের তমসদ্যুতিতে। ····প্রেম প্রকৃতি সুন্দর সৃজনমূলে কার্যকরী হলেও স্বদেশ ভূমির প্রতি অনুরাগই কবির চিত্তকে সর্বাধিক আন্দোলিত করে। তশুভনাশকারী তথ্যধ্বনি আর উড্ডীয়মান বিপ্লবের পতাকাই তাঁকে নব নব সৃষ্টিতে প্ররোচিত করে।"[৬০] 'জনতার কল্লোল' কবিতাটিতে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

(১)

ওঠে ঐ জনতার কল্লোল
গর্জনে সিন্ধু
নহে নহে বিন্দু
সমীরণে বারিকণা হিল্লোল ॥
(ওঠে ওই জনতার কল্লোল)

(২)

হানিছে বজ্র অমানিশা রাত্রি
চূর্ণিছে বেলাভূমি
শঙ্কিত যাত্রী
জাগল জনতা জাগল কল্লোল
শোন ওই হুঙ্কার তরঙ্গ হিল্লোল ।।
(ওঠে ঐ জনতার কল্লোল)

(৩)

সার্বিক বিপ্লব ধ্বজা ওই ঊর্দ্ধে
প্রাণ কাড়া আহ্বান
দেয় কোন বুদ্ধে !
জাগল জনতা শুনি কার কলরোল
ওঠে ওই জনতার কল্লোল
(ওঠে ওই জনতার কল্লোল)

(৪)

বাজাও তুর্য গম্ভীর ভীষণ
কর নাশ অশুভে
অন্যায় শাসন
লাখে লাখে সৈনিক তুলছে কল্লোল
ছুটে আজ রক্তেরই হিল্লোল ।।
(ওঠে ওই জনতার কল্লোল)

(৫)

রহিবে না পদানত সহিবে না অবিচার
অন্যায় যা কিছু
ভেঙ্গে কর চুরমার
ওঠে ওই আহ্বান কোন্ মহাশঙ্খে
আর নাই কোন ভয় প্রাণ করে উতরোল,
ওঠে ওই জনতার কল্লোল ।।

'ঘুম ভাঙ্গান গান'-এ অনুরূপ জন জাগরণের রূপটি ধরা পড়ে।

আবার জাতির জনকের প্রতি গভীর প্রাণের বিনম্র শ্রদ্ধা কল্পরূপ পেয়েছে 'বাপুজী', 'গান্ধী স্মরণে' ও 'শুভ পদার্পণে' কবিতাগুলিতে।

সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রে সুশীল কুমারের সীমাবদ্ধতা থাকলেও প্রাণের গভীর আবেগ এবং হৃদয়ের তীব্র প্রেরণা তাঁর সৃষ্টির মূলে যে বিশেষভাবে কাজ করেছিল তা বোধ করি অস্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে তাঁর কর্মময় জীবন যেমন গান্ধী দর্শনের দ্বারা মহিমান্বিত তেমনি সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে তিনি নজরুল-রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত ও আলোকিত।

৫

কথা শেষ

ইতিপূর্বে আমরা সুশীল কুমারের কর্মময় দীর্ঘ জীবনের একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাঁর চরিত্রের আরও বহু গুণাবলীর কথাও আমরা জানব। বক্তা হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন এবং এর জন্য তাঁর অনুশীলনের অন্ত ছিল না।[১১] প্রৌঢ় বয়সে তিনি সঙ্গীত চর্চাতেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং অধ্যবসায়ের জোরে তিনি স্বরলিপি দেখে গান তুলতে পারতেন।[১২] তিনি যে প্রগাঢ় স্নেহশীল মনের অধিকারী ছিলেন তার বহু পরিচয় রয়েছে।[১৩] তাঁর সাহচর্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই তাঁর এই বিশেষ গুণের পরিচয় পেয়েছেন। সময়ানুবর্তিতা তাঁর জীবনের একটি অবশ্য পালনীয় ধর্ম। আজও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করে চলেছেন। আড়ম্বরহীন জীবন যাপনেই তিনি অভ্যস্ত। এমন কি বিধায়ক, মন্ত্রী ও সাংসদ থাকাকালীনও তিনি একইভাবে জীবন যাপন করেছেন। কোন কাজকেই তিনি হেয় মনে করতেন না বলেই চানাচুরের ব্যবসা করে রোজগারের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভগবানে বিশ্বাসী।[১৪]

চারিত্রিক দৃঢ়তা, শৃঙ্খলা, কর্তব্যবোধ এবং কর্মে একাগ্রতা তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণাবলী। তাই তাঁর পক্ষে কঠোর পরিশ্রমী, সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হওয়া সম্ভব হয়েছে। তাঁর দেশাত্মবোধ তাঁকে দুঃসাহসিক করে তুলেছিল। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ক্ষিপ্রতা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। ঐ সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল নেতারা নেতৃত্বে ছিলেন এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে তুলনা করলে

সুশীল কুমারকে তালিকার প্রথমে স্থান দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। তাছাড়া ঐ সময়কার কোন স্বাধীনতা সংগ্রামী সুশীল কুমারের ন্যায় পরবর্তীকালে বহুমুখী কর্মে লিপ্ত হয়ে জনকল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন এমন খবর আমাদের জানা নেই। এক কথায় তাঁর সমগ্র কর্মময় জীবন পর্যালোচনা করলে একথা মনে হয় যে তিনি এক অবিস্মরণীয় মানুষ। তিনি সত্যই নমস্য। দেশবরেণ্য এই মহান স্বদেশ সাধকের উদ্দেশ্যে জানাই আমার প্রণতি।

২য় পর্ব

১

সংগ্রামী মেদিনীপুর ও দেশের স্বাধীনতা

প্রভাতাংশু মাইতি

পশ্চিমবাংলার এই সীমান্ত জেলা মেদিনীপুর এক বৈচিত্র্যময়, বর্ণ বহুল অঞ্চল। উড়িষ্যা ও বাংলার মাঝে এই সীমান্ত জেলা আকৃতিতে বাংলার যে কোন জেলা অপেক্ষা বিশাল। এই জেলার যে কোন থানা আয়তনে ও লোকসংখ্যায় বাংলার অন্য জেলার কাছাকাছি। জেলার পশ্চিম ভাগে ল্যাটেরাইট বা লালমাটি অঞ্চল ও বিস্তীর্ণ বনভূমি। জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগে পলিমাটি ও কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল। জেলায় প্রবাহিতা নদীগুলি হল কংসাবতী, হলদী, রসুলপুর, কেলেঘাই দ্বারকেশ্বর, শীলাবতী, রূপনারায়ণ ও আংশিক ভাগীরথী বা গঙ্গা। সীমান্তবর্তী এই জেলার আরণ্যভূমিতে বাস করেন সাঁওতাল, লোধা প্রভৃতি আদিবাসীগণ। আর আছেন উড়িয়া ও বাংলা মিশ্রিত ভাষাভাষী এবং পূর্বভাগে বাংলাভাষীগণ। জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মাহিষ্য অথবা সদগোপ সম্প্রদায়ের লোক। ব্রাহ্মণ কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক আনুবীক্ষণিক। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই জেলার বেশীরভাগ অধিবাসী অতীতে এবং এখনও স্বনির্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। ধান, পান, লবণ একদা মেদিনীপুরে ব্যাপক উৎপাদিত হত। হিজলী অর্থাৎ তমলুক ও কাঁথির নিমক মহাল থেকে একদা গোটা বাংলায় ও ভারতে লবণ সরবরাহ হত।

প্রাচীন যুগে মেদিনীপুর বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। মেদিনীপুর সদর (দক্ষিণ) মহকুমার দণ্ডভুক্তি অধুনা দাতন ছিল একটি ভুক্তি বা প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্র। তাম্রলিপ্ত ছিল এক প্রাচীন নগরী। গুপ্তযুগে চৈনিক পর্য্যটক ফা-হিয়েন এখান থেকে জাহাজ যোগে চীন যাত্রা করেন। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে মৌর্য যুগে পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্ত বন্দর পর্যন্ত রাজপথ ও বাণিজ্যপথ প্রসারিত ছিল। কুষাণ যুগের বহু মুদ্রা ও মূর্তি তমলুকের আশে পাশে পাওয়া গেছে যা এখন তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। ষষ্ঠ শতকে হিউয়েন সাঙ তাম্রলিপ্তে অশোকের তৈরী বৌদ্ধস্তূপ দেখেন। গৌড় রাজ শশাঙ্ক মেদিনীপুরকে

তাঁর সাম্রাজ্যের হৃদপিণ্ড মনে করতেন। দাঁতনের কাছাকাছি সরশঙ্কার দীঘি বা হ্রদ হল মহারাজ শশাঙ্কের খোদাই করা সেচ হ্রদ। পাল যুগে প্রথম মহীপালের আমলে দক্ষিণের চোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোল বাংলায় একটি অভিযান পাঠান। দণ্ডভুক্তি বা দাঁতনের সামন্ত রাজা রণশূরকে পরাস্ত করে চোল বাহিনী ভাগীরথী তীর পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তখন দাঁতন বা দণ্ডভুক্তি ছিল বাংলার দক্ষিণ দরজা। চোল সেনার একাংশ মেদিনীপুরে থেকে যায়। আজ তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে বিলীন হয়ে গেছে।

পাঠান যুগে উড়িষ্যা থেকে জনগোষ্ঠীর ব্যাপক অভিবাসন ঘটে। উড়িষ্যার গঙ্গ ও গজপতি বংশের অধীনে "খণ্ডাইৎ" নামে এক যোদ্ধা কৃষক সম্প্রদায়, উড়িষ্যার অধিপতিগণের আদেশে পাঠান আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য দলে দলে, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল প্রভৃতি অঞ্চলে ঢুকে জমি দখল ও বসবাস শুরু করে। এই খণ্ডাইৎদের সাথে জার্মানীর পূর্ব প্রাশিয়ার জাঙকারদের (Junker খাঁটি উচ্চারণ য়ুঙ্কার) তুলনা করা যায়। ক্রমে এই খণ্ডাইৎ শ্রেণী মেদিনীপুরের স্থানীয় অধিবাসীদের বিশেষ করে মাহিষ্যদের সাথে মিশ্রিত হয়ে মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা প্রিয়, লড়াকু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। বর্ধমান অঞ্চল থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে সদগোপ সম্প্রদায় অনুপ্রবেশ করে। তাঁদের নেতা হন নাড়াজোলের রাজা। মেদিনীপুরের পূর্বাঞ্চলে খণ্ডাইৎ মাহিষ্যদের যাঁরা রাজা ছিলেন তাঁরা ব্রিটিশ আমলে উৎখাত হয়ে যায়।

আমার একথা বলার উদ্দেশ্য হল মেদিনীপুরবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মেদিনীপুরের সংখ্যা গরিষ্ঠ মাহিষ্য ও সদগোপদের সাথে উড়িষ্যার যোদ্ধা কৃষক খণ্ডাইৎ সম্প্রদায়ের রক্ত মিশ্রিত হলে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আত্মবিশ্বাস, আত্ম-নির্ভরতা ও সংগ্রামীচেতনা গড়ে ওঠে। পাঠান যুগে সুলতানী সরকার মেদিনীপুর থেকে কোনো নিয়মিত ভূমিরাজস্ব আদায় করতে পারেনি। স্থানীয় মাহিষ্য বা সদগোপ জমিদার ও মাহিষ্য চাষীরা রাজস্ব স্বেচ্ছায় আদায় দিত সুলতানী সরকার তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। জেলাবাসী মোটামুটি স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করত। মুঘল আমলে অশান্ত মেদিনীপুরকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য শুধু এই জেলা যা চাকলা মেদিনীপুরের জন্য একজন ফৌজদার নিয়োগ করতে হয়। তথাপি মুঘল সরকার স্থানীয় জমিদারদের আভ্যন্তরীণ শাসনের ব্যাপারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকেন। মুঘলের বশংবদ অবাঙালী জমিদার

বর্ধমান-রাজ মেদিনীপুরে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করায় চেতুয়া—বরদা বা ঘাটালের শোভা সিংহ উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খাঁর সহায়তায় বিদ্রোহ করে বর্ধমান রাজবাড়ী পুড়িয়ে দেন। অবশেষে মুঘল ফৌজদারের হাতে তাঁর পরাজয় হয়।

বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর শাসনকালে বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামা (১৭৪০-১৭৫১) প্রায় ১১ বছর ধরে চলে। মুঘল সাম্রাজ্যের তখন ভগ্নদশা। পেশবা বালাজী বাজীরাও-এর সীমান্ত সেনাপতি রঘুজী ভোঁসলের আদেশে মারাঠা সেনারা মধ্যপ্রদেশ থেকে উড়িষ্যা হয়ে মেদিনীপুরের ভেতর দিয়ে বাংলায় অভিযান চালাত। মারাঠাদের আসা যাওয়ার পথের ধারে মেদিনীপুরের উর্ব্বরা মাটি ও ফসলের লোভে বহু মারাঠী সেনা এই জেলার স্থায়ী বাসিন্দাতে পরিণত হলে, মেদিনীপুরের জনগোষ্ঠীতে আরও একটি যোদ্ধ, শ্রেণীর সংমিশ্রণ ঘটে। এখনও 'খাস্কেল' ও 'সেনাপতি' প্রভৃতি পদবীধারী বহু পরিবার মারাঠাদের বংশধর হলেও মেদিনীপুর বাসীর সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলায় ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থলোভী কোম্পানী সরকার মেদিনীপুরে শোষণনীতি চালু করে, নবাব মীরকাশিম বর্ধমান মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার জমিদারী স্বত্ব কোম্পানীকে ছেড়ে দেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী পেলে মেদিনীপুরে চড়া হারে ভূমিরাজস্ব আদায় শুরু করে। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করলে বাংলার অন্যান্য জেলার মত মেদিনীপুরে সেটেলমেণ্ট ও জমি জরিপ করে নতুন বন্দোবস্ত চালু করা হয়। এর ফলে প্রায় ১৭% নিট ভূমি রাজস্ব বাড়ে, তাছাড়া ছিল নানা প্রকার সেস। নিস্কর, দেবোত্তর ও ওয়াকফ সম্পত্তি গ্রাস করে কর যোগ্য করা হয়। অরণ্যভূমির অরণ্য কাটাই করে অরণ্যের আদিবাসী সন্তানদের উৎখাত করে নতুন বন্দোবস্ত চালু করা হয়। বিলাতের লিভারপুল বন্দর থেকে খালি জাহাজ ফেরত না এসে বিলাতী লবণ বোঝাই করে আনা হয়। জেলার লবণ শিল্পের উপর চড়া হারে শুল্ক চাপিয়ে, জেলার লবণ উৎপাদনকে ধ্বংস করা হয়। সেই জমি যাকে জালপাই বা জলপাই জমি বলা হত তাকে ক্ষেতী জমি হিসাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। জেলার কৃষি জমির বন্দোবস্তে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জেলার বহুকালের প্রচলিত ভূমি স্বত্ব ও খাজনা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে।

জেলাবাসী ব্রিটিশ শাসনের কালে এই শোষণ ও বঞ্চনা নতশিরে মেনে নেয়নি। পশ্চিম মেদিনীপুরের অরণ্য অঞ্চলে নতুন ভূমি বন্দোবস্ত ও খাজনার

প্রবর্তনের ফলে সাঁওতাল ও লোধা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণির বিদ্রোহ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আদিবাসী সম্প্রদায় অরণ্যের স্বাধীন অধিকার রক্ষার জন্য অস্ত্র ধরেন। বিদ্রোহী সাঁওতালগণ মেদিনীপুর সদর শহরের উপকণ্ঠে এসে গেলে জেলা কালেকটরের সিংহাসন কেঁপে ওঠে। অবশেষে ইংরেজের আগ্নেয়াস্ত্র, আদিবাসীদের বিদ্রোহকে রক্তস্নানে নির্ভিয়ে দেয়।

কূটবুদ্ধি ব্রিটিশ শাসকরা ভাবতে বসেন মেদিনীপুরে ব্রিটিশের আধিপত্য ও ভূমি বন্দোবস্ত এর বিরুদ্ধে কেন এত বাধা আসছে। সুদক্ষ কালেকটর বেইলী তাঁর এক রিপোর্টে গভর্ণর জেনারেলকে জানান যে মেদিনীপুরের জনসাধারণের লড়াকু চরিত্র, দীর্ঘকাল ধরে স্বায়ত্ত শাসন ভোগ করার ফলে তারা সহজে ব্রিটিশকে মানতে চাইছে না। স্থানীয় জমিদারগণ বেশ লড়িয়ে প্রকৃতির। এরা মুসলিম আমল থেকে স্বায়ত্ত শাসন ভোগ করায়, স্বাধীনতাপ্রিয় জনসাধারণকে স্থানীয় জমিদাররাই নেতৃত্ব দেয়। এই জমিদারদের বিতাড়িত করে নতুন করে বশংবদ জমিদার নিয়োগ করলে এরাই ব্রিটিশের Collaborator হিসেবে জেলায় ব্রিটিশের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করতে পারবে। বেইলীর রিপোর্টের পর ব্রিটিশ সরকার সূর্যাস্ত আইন প্রয়োগ ও বিভিন্নভাবে জবরদস্তি করে মুঘল যুগের বংশানুক্রমিক জমিদারদের উচ্ছেদের নীতি নেন। তার স্থলে নতুন বশংবদ জমিদারদের Collaborator হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এইভাবে মহিষাদলে ও নন্দীগ্রামের রেয়েপাড়ার জমিদাররা যুদ্ধে ধ্বংস হন। তমলুক, ময়না ও অন্যান্য স্থানেও মোটামুটি একই ব্যাপার ঘটে। নাড়াজোলের গোপ বংশীয় জমিদার অবশ্য টিকে যান। এজন্য নাড়াজোল রাজবংশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ঘটেছিল। ব্রিটিশের স্তাবক ধামাধরা জমিদারগণ ইংরাজের পদলেহন করে নিজ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। ইংরাজের পদলেহী নতুন জমিদারগণের সহযোগিতায় ব্রিটিশের প্রশাসনযন্ত্র জেলাবাসীর কণ্ঠরোধ করে। পুরাতন ধারায় সশস্ত্র বিদ্রোহ ক্রমশঃ অবসিত হয়। এটাই হল জেলাবাসীর ইংরাজ বিরোধিতার মনস্তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি। এর সঙ্গে জেলার লবণ শিল্প বিলাতী লবণের আমদানীর কারণে ধ্বংস হওয়ায় বহু লোকের জীবিকা হারানর ক্রন্দন যুক্ত হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অতিরিক্ত ভূমি রাজস্বের চাপ, লবণ শিল্পের ধ্বংস, অরণ্যভূমিকে ক্ষেতজমিতে পরিণতকরণ এবং জেলাবাসীর স্বায়ত্তশাসন লোপ ইত্যাদি জেলাবাসীকে ব্রিটিশ বিরোধী করে তোলে। জনগোষ্ঠীর সংগ্রামী

ঐতিহ্য তাদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে প্রেরণা দেয়। এই বিরোধীতা অব্যাহতভাবে ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত চালু ছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিক মেদিনীপুরবাসীর (১) ধনী দরিদ্র ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামীর ব্যাখ্যা হিসাবে বলেন যে—মেদিনীপুরের বেশীর ভাগ লোক মাহিষ্য ও সদগোপ সম্প্রদায়ের। এই জেলার বেশীর ভাগ জমির মালিক একই সম্প্রদায়ের। রায়তচাষী, জমিদার ও জোতদার একই সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার ফলে মেদিনীপুরে ধনী দরিদ্র সকলেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয়। তুলনামূলকভাবে পূর্ববাংলার জমি মালিকরা বর্ণহিন্দু ও চাষীরা মুসলমান সম্প্রদায় বা নমশূদ্র হওয়ায় মেদিনীপুরের মত সাড়া পাওয়া যায়নি। এইরূপ ব্যাখ্যা একটি ভ্রান্ত সরলীকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। এই ব্যাখ্যা দ্বারা মেদিনীপুরবাসীর ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক দিকগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। কোলকাতাকেন্দ্রিক কিছু বুদ্ধিজীবী তৃণমূলে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা না করে জেলাবাসীর প্রতি উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই দায়সারা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা মেদিনীপুরবাসীর প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রামী চেতনা স্বনির্ভরতার ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক অসন্তোষের দিকগুলি উপেক্ষা করেছেন।

ঊনবিংশ শতকের রেনেসাঁসের ইমনরাগিনী এই জেলাতেও বেজেছিল। এই জেলার পরম গৌরব বাংলাদেশের শিক্ষা জগতের কলম্বাস পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার ও বাংলা ভাষা সংস্কার প্রভৃতির জন্য বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। বাংলার নবজাগরণের অপর নায়ক ঋষি রাজনারায়ণ বসু বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দের মাতামহ মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বন্দে-মাতরম্ শব্দের স্রষ্টা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন নেগুয়া বা কাঁথিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সেই সময় তিনি রসুলপুর নদ সংলগ্ন বালিয়াড়ী ও অরণ্য পরিবেশ প্রভাবিত হয়ে তাঁর ধ্রুপদী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থটি রচনা করেন। মনে আছে বঙ্গবাসী কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী বলেছিলেন যে বংকিম যখন নেগুয়ার ম্যাজিস্ট্রেট সেই সময় পর পর তিন দিন মধ্যরাত্রে তার বাংলোর সামনে এসে ডাক দেয়, "বঙ্কিম বাড়ী আছো"? হয়ত এই ডাক ছিল বঙ্কিমবাবুর Inner voice এর আহ্বান। এরপরই তিনি 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থটি রচনা করেন। বাংলার রেনেসাঁসের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশমন্ত্র জেলার

যুবশক্তিকে প্রেরণা দেয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় নাড়াজোল রাজ ও মুগবেড়িয়ার দিগম্বর নন্দ জাতীয় শিক্ষার তহবিলে অর্থদান করেন। বাংলার বিপ্লবীদের প্রভাতী তারকা মেদিনীপুরের অগ্নি শিশু ক্ষুদিরাম ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদান করেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে জনগণমন অধিনায়ক মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে সংগ্রামী মেদিনীপুর থেকে স্বামীজীর তেজোদৃপ্ত স্বদেশমন্ত্র বুকে নিয়ে এক ঝাঁক তাজা তরুণ আত্মত্যাগী দেশকর্ম্মীরূপে এগিয়ে আসেন। তাঁরা শীঘ্রই মহাত্মার আদর্শে স্বদেশমাতার মুক্তি সৈনিকে পরিণত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, কুমারচন্দ্র জানা, অজয় কুমার মুখার্জী, নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি, সতীশচন্দ্র সামন্ত, রজনীকান্ত প্রামাণিক প্রভৃতি মুক্তি সাধক প্রবাদ পুরুষগণ। তখন এঁরা কোন মসনদ বা পদ প্রাপ্তির আশায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেননি। এঁরা বর্ব্বর ইংরেজের লাঠি ও গ্রেপ্তারকে স্বেচ্ছায় বরণ করলেন। দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য বীরেন্দ্র নাথ শাসমল মহাশয় তাঁর লাভজনক আইন ব্যবসা ত্যাগ করে ইংরেজের গোলামখানা হাইকোর্টের মত উচ্চ আদালত বয়কট করে জেলার অগ্রণী দেশকর্ম্মীরূপে স্থান গ্রহণ করে নেন। পাঠান-মোঘল যুগের মেদিনীপুরের স্থানীয় স্বাধীনতার বিদ্রোহের পরিবর্তে এখন সর্বভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের তরঙ্গে জেলা মেদিনীপুর ভেসে চলে। জেলার মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানগণ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে সরকারী চাকুরীর লোভজনক হাতছানি উপেক্ষা করে হাইকোর্ট অথবা কলকাতার কলেজের ল্যাবরেটারী থেকে দেশনেতার ডাকে বেরিয়ে আসেন। এই নবপর্যায়ের গান্ধীবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনে যুদ্ধের ঘোড়া যেমন যুদ্ধের বাজনা শুনলে নেচে ওঠে, সেভাবেই মেদিনীপুরবাসীর সুপ্ত সংগ্রামী চেতনা আবার জেগে উঠে। গান্ধীজীর আহবানে জেলার ধনী, দরিদ্র, জোতদার, রায়ত, হিন্দু-মুসলমান সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আন্দোলনের সামিল হন। মেদিনীপুর থেকে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকগণ কোলকাতায় বিলাতি মদ, কাপড় ও বিলাতী জিনিসের দোকানে দোকানে পিকেটিং করেন। এই তরঙ্গে ভাসলেন কুমারচন্দ্র, প্রেসিডেন্সীর কৃতী ছাত্র অজয় কুমার, বীরেন্দ্রনাথ, সতীশ সামন্ত প্রভৃতিরা। জাতীয় পতাকা সেই যে তাঁরা হাতে তুলে নিলেন বীর সৈনিকের মতই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা তা উচ্চে তুলে রাখেন। বীরেন্দ্রনাথ এই সময় জেলার ভিতর চৌকিদারী ট্যাক্স ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট চালু

করেন। মেদিনীপুর জেলায় ১৩৫ ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে শুধুমাত্র পাঁশকুড়া থানার গোপালনগর ইউনিয়ন বোর্ডটি চালু থাকে। ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট এত সফল হয় যে ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ইউনিয়ন বোর্ড আইন প্রত্যাহার করে নেন। তমলুকের কুমারচন্দ্র, সতীশচন্দ্র ও গোরাচাঁদ গিরি প্রভৃতি ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট আন্দোলনে বীরেন্দ্রনাথকে সহায়তা করেন। অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার বিভিন্ন জেলার মধ্যে একমাত্র মেদিনীপুরেই চৌকিদারী ট্যাক্স ও ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট দ্বারা এই জেলা তার আপোষ বিরোধী সংগ্রামী চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে।

সুমিত সরকার প্রভৃতি কয়েকজন বামপন্থী ঐতিহাসিক বলেন যেহেতু মেদিনীপুরের সংখ্যা গরিষ্ঠ লোক ছিলেন বীরেন্দ্রনাথের সম্প্রদায়ভুক্ত, সেহেতু মেদিনীপুরে এই ট্যাক্স বয়কট আন্দোলন অভাবিত সফলতা লাভ করে। এই ব্যাখ্যা এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকরা অকারণ কেন দেন তার উদ্দেশ্য বোঝা দুষ্কর, এর দ্বারা কি জেলাবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের অবমূল্যায়ন করা হয় না? মেদিনীপুরবাসী বীরেন্দ্রনাথ মাহিষ্য বলেই তাঁর নির্দেশ মেনে নেয়, এই ব্যাখ্যার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ইঙ্গিত আছে। জেলাবাসীর সুদীর্ঘ প্রাচীন সংগ্রামী ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করার চেষ্টা এতে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে মেদিনীপুরবাসীর সংগ্রামী চরিত্রের যে ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা এই ধরণের হাস্যকর মন্তব্যকে খণ্ডন করতে যথেষ্ট।

অসহযোগ আন্দোলন থেকে জেলার দেশকর্মীগণ এই শিক্ষা নেন যে গ্রামসেবা ও গ্রামোন্নয়নের কাজ হল সত্যাগ্রহের গঠনমূলক অঙ্গ। চৌরীচৌরার দুর্ঘটনার পর ব্যথিত মহাত্মা অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেও জেলার দেশকর্মীরা গ্রামসেবার কাজ নিষ্ঠা ভরে চালিয়ে যান। কারণ সত্যাগ্রহের আদর্শ অনুযায়ী দেশকর্ম্মীরা ভাবতেন ভারতের প্রতিটি গ্রাম হল মন্দির আর মানুষগুলি হল দেবতা। কুমারচন্দ্র সুতাহাটার অনন্তপুরে, সতীশচন্দ্র মহিষাদলের কাঁকুড়দহে, অজয় কুমার তমলুকের নিমতৌড়ীতে জাতীয় বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষাদান, স্বাক্ষরতার কাজ, নৈশ্য বিদ্যালয় স্থাপন, গ্রামে সালিশী বিচার, গ্রামের পথঘাট তৈরী, চরকা কাটা, কুটীর শিল্প স্থাপন, স্থানীয় মেলায় স্বদেশী সভা, স্বদেশী প্রদর্শনীতে যুবকদের যোগদান, গান্ধীবাদ প্রচার প্রভৃতি কাজ নিষ্ঠা ভরে চালিয়ে যান। এইভাবে জেলার যুবকদের তাঁরা জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতের সাথে যুক্ত রাখেন। এই আমলে তাঁর গান্ধীবাদী আদর্শের প্রতি

একনিষ্ঠতার জন্য কুমারচন্দ্র "মেদিনীপুরের গান্ধী" নামে খ্যাতি পান। এই যুগের জেলার কংগ্রেস নেতাদের নিরভিমান আচরণ ও জনসেবার জন্য তাঁরা জনগণের কাছের লোকে পরিণত হন। জেলায় কোন সাম্প্রদায়িক বিবাদ ঘটেনি। ব্রিটিশ সরকার ভেদনীতি খাটিয়ে, স্বদেশীর অপরাধে হিন্দু গৃহস্থের গৃহস্থালীর সামগ্রী ক্রোক করে মুসলিমদের তা নীলামে কিনতে উৎসাহ দিলেও, মুসলিম ভাইরা এই ভেদনীতির ফাঁদে পা দেননি।

এরপর আসে আইন অমান্য আন্দোলনের (১৯৩০—৩২) সংগ্রামী দিন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণস্বরাজকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে, প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারীকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালনের ডাক দিলে জেলার সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। পুলিশের লাঠি ও গ্রেপ্তার তা স্তব্ধ করতে পারেনি। এরপর মহাত্মা আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা হিসাবে ডাণ্ডীতে লবণ সত্যাগ্রহ উদ্‌যাপন করেন। মহাত্মার এই সিদ্ধান্তকে উপহাস করে Englishman পত্রিকা লেখে যে: "Let Mr. Gandhi boil as much sea water, as he likes, and the British Govt. will go on for ever." এই সাম্রাজ্যবাদীগণ মহাত্মার সিদ্ধান্তের গুরুত্ব বুঝাতে পারেন নি। ডাণ্ডি অভিযানের পর আসমুদ্র হিমাচল তন্দ্রা ছেড়ে আবার যৌবনের খরতেজে জ্বলে ওঠে। বাংলাদেশের আইন অমান্য আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়ায় জেলা মেদিনীপুর। লবণ আইন অমান্য মেদিনীপুরবাসীর কাছে বেশ প্রিয় ছিল। হিজলীর এই একদা সমৃদ্ধ লবণ শিল্পকে আবার পুনরুদ্ধার করার আনন্দ তারা লবণ আইন ভেঙ্গে গায়। নিজের নুন ভাত নিজে উৎপাদনের অধিকার অর্জন ছিল জেলাবাসীর কাছে একটি Crusade এর মতই পবিত্র কাজ।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় জনসাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনাকে সাংগঠনিক পথে চালিত করার জন্য এগিয়ে আসেন সতীশ সামন্ত, অজয় কুমার মুখার্জী, সুশীল কুমার ধাড়া, নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি, অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সাতকড়ি রায় প্রভৃতি নিবেদিত প্রাণ দেশকর্মীরা। গোটা জেলায় স্বাধীনতা যুদ্ধের রণধ্বনি "বন্দেমাতরম্" হতে লাগল। মাতা ও ভগিনীগণ গৃহকোণ ছেড়ে লবণ আইন অমান্য করতে এগিয়ে এলেন। তমলুক মহকুমার নরঘাটে এক কেন্দ্রীয় সমাবেশে ৪০/৫০ হাজার নরনারী লবণ আইন ভঙ্গে অংশ নেন। কাঁথিতেও ব্যাপকভাবে লবণ আইন ভঙ্গ করা হয়। কাঁথির পিছাবনীতে

পুলিশের নির্মম গুলি বৃষ্টি উপেক্ষা করে জনতা লবণ আইন ভঙ্গ করে প্রাণ দিলেন। অহিংস আন্দোলন করতে এই শহীদরা পিছাননি, এজন্য স্থানটির নাম হল পিছাবনি। এরপর থানায় থানায় লবণ আইন ভঙ্গ করা হল, মহা উৎসাহে মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রামে বিপুল জনতার সমর্থনে এবং পুলিশকে আগে থেকে দিন, ক্ষণ, স্থান জানিয়ে।

জেলাবাসীর উপর নেমে এল তথাকথিত সুসভ্য ব্রিটিশ সরকারের বর্বর মধ্যযুগীয় নির্যাতন। ধর-পাকড়, গ্রেপ্তার, লাঠিচার্জ, লুঠতরাজ, পিটুনি, পুলিশ নিয়োগ, পিটুনি জরিমানা, গৃহস্থের জিনিষ ক্রোক প্রভৃতি দমন নীতির সাথে লাঠি পেটাই, জেলে পুরে আড়া-বেড়ি ও দণ্ড-বেড়িতে আবদ্ধ করা প্রভৃতি অকল্পনীয় নির্যাতন চালাত। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি সাহেব নিজে সিভিলিয়ান প্রশাসক হয়ে, নিজ হাতে যুবকদের বেত্রাঘাতে জর্জরিত করতে কুণ্ঠা দেখালেন না। হিজলী জেলে নিরস্ত্র বন্দীরা 'বন্দেমাতরম' উচ্চারণ করায় এই রাজবন্দীদের উপর চলল নির্মম গুলি। বহু বন্দী মারা গেলেন। বহু মাতার কোল খালি হয়ে গেল। অজয়বাবু, সতীশবাবু, সুশীলবাবু সকলেই গ্রেপ্তার হলেন। গুণ্ডা সেনার দ্বারা কংগ্রেস অফিসগুলি মাটিতে লুটিয়ে দেওয়া হল। তথাপি জেলার স্কুল কলেজে অফিসে পিকেটিং ও বয়কট চলতে লাগল। জনসাধারণ শত প্ররোচনা সত্ত্বেও অহিংস থাকলেন।

মেদিনীপুরের অধিবাসীদের উপর এই নির্মম অত্যাচারের জন্য বিপ্লবীরা স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁরা অত্যাচারী সরকারের বর্বর আমলাদের শিক্ষা দিতে প্রতিজ্ঞা নেন। বিপ্লবীদের বুলেটে মেদিনীপুরের কুখ্যাত ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট পেডি ও তারপর ডগলাস ও বার্জ নিহত হলেন। সরকারকে অত্যাচারের রথ রুদ্ধ করতে হল। মেদিনীপুরের শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের নীতি পরিবর্তন করতে হল। জনসাধারণের কাছ থেকে বিপ্লবীদের সম্পর্কে কোন তথ্য বহু চেষ্টাতেও ইংরাজের গোয়েন্দারা জোগাড় করতে পারল না।

আইন অমান্য আন্দোলন মেদিনীপুরের জনগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটায়। এই আন্দোলন জেলায় তিনটি স্তরে চলে, (১) প্রধান ভূমিকায় ছিলেন গান্ধীবাদী নেতারা যথা তমলুকে কুমারচন্দ্র, অজয় কুমার, সতীশ সামন্ত, সুশীল কুমার প্রভৃতি (২) দ্বিতীয় স্তরে ছিলেন শহরের দেশব্রতী আইন জীবীরা বিশেষতঃ মহেন্দ্রনাথ মাইতি, শ্রীনাথচন্দ্র দাস, গোরাচাঁদ গিরি, বঙ্কিম ভৌমিক,

মেদিনীপুরের ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র প্রভৃতি (৩) তৃণমূল স্তরে ছিলেন গ্রামের মধ্যবিত্ত কৃষক, চাষী, ভাগচাষী, হরিজন।

এই আন্দোলন ওপর থেকে চালিয়ে দেওয়া হয়নি অথবা এই আন্দোলন কোন বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই আন্দোলন ছিল প্রকৃত গণ আন্দোলন। মেদিনীপুরবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। আইন অমান্য আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, গণ সংগঠনের শিক্ষা বৃথা যায়নি। '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগে। ১৯৩০-৩২ এরপর জেলার দেশকর্মীরা গ্রাম সংগঠনের কাজে ব্রতী হন। তাঁরাই আপদে বিপদে দেশবাসীর পাশে থাকেন। উদাসীন ব্রিটিশ সরকার বা সহযোগী জমিদারগণ জনগণের পাশে থাকেননি।

১৯৩৯ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪১ খ্রীঃ জাপান অক্ষশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়ে ব্রিটিশের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাম্রাজ্যে মারাত্মক আঘাত হানল। এই সভায় সুভাষচন্দ্র তমলুকের রাজবাড়ীর মাঠে এক জনসভায় দেশবাসীকে আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার ডাক দেয়। কোলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্ক বক্তৃতায় প্রদত্ত ভাষণের সুরে, সুভাষচন্দ্র জানালেন যে—'বিশ্বের ইতিহাসে কোন সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হয়নি, কারণ তা শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও একই নিয়মে ভেঙে পড়বে।' এর কিছুদিন পরেই সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য "মহানিস্ক্রমন" করেন। এদিকে জাপান দ্রুত গতিতে ইন্দোচীন, মালয় ও সিঙ্গাপুর দখল করে ব্রহ্মদেশে ঢুকে পড়ে। ব্রিটিশ সিংহ তার পুচ্ছ গুটিয়ে বেঁটে জাপানীদের ভয়ে ব্রহ্মদেশে প্রবাসী ভারতীয়দের ফেলে রেখে ব্রিটিশ সেনাদলকে নিয়ে সমুদ্রপথে ভারতে পিছু হটে আসে। জাপানীরা ভারতের দরজায় আঘাত করে। মেদিনীপুরের উপকূল অঞ্চল তমলুক ও কাঁথিতে জাপানী সেনার আকস্মাৎ নেমে পড়ার আশংকায় ব্রিটিশ সরকার এই দুই মহকুমায় পোড়া-মাটি-নীতি নেন। সরকার জেলাবাসীর একমাত্র যানবাহন সাইকেল ও নৌকা নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে জোর করে বাজেয়াপ্ত করে। এই সঙ্গে প্রদেশের মুসলীম লীগ সরকারের আশ্রিত ইস্পাহানি কোম্পানী মেদিনীপুর জেলার ধান, চাউল খরিদের একচেটিয়া লাইসেন্স গ্রহণ করে এবং অতি অল্প দামে জেলার ধান, চাল কিনে নিয়ে যুদ্ধের প্রয়োজনে জেলার বাইরে পাঠাতে থাকে। জেলায় প্রচণ্ড খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ব্রহ্মদেশ ইংরেজের হাত ছাড়া হওয়ায় ব্রহ্মদেশ থেকে রেঙ্গুণ চাউল আমদানী বন্ধ হয়। বাংলার খাদ্য ঘাটতি পূরণ

হওয়ার কোনো উপায় ছিল না। স্মরণ রাখা দরকার যে তখনকার দিনে জেলায় আমন ধান ছাড়া আর কোনো ফসল হত না।

দেশের এই সংকটজনক অবস্থায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেয়। ক্রীপস্ প্রস্তাব ব্যর্থ হলে মহাত্মা ইংরেজের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য মনে করেন। গান্ধীজী বলেন যে দেশ আজ জাপানের হাতে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে। কিন্তু জাপানের সাথে ভারতবাসীর কোনো ঝগড়া নেই। ইংরেজ ভারতে আছে বলেই জাপান ভারত আক্রমণে উদ্যত। ব্রিটিশ ভারতবাসীকে রক্ষায় অক্ষম। ইংরেজ জাপানী আক্রমণের মুখে অসহায় ভারতবাসীকে ফেলে রেখে মেষের পালের মত পলায়ন করবে। যে সরকার তার প্রজাদের ধন প্রাণ রক্ষায় অক্ষম, তাঁর ভারতে থাকার নৈতিক অধিকার নেই। "For God sake leave India to God or anarchy." পণ্ডিত নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে "এ সময়ে তিনি বাপুজীকে ইংরাজের বিরুদ্ধে এত ক্ষুব্ধ দেখেন, যা তিনি আগে কখনও দেখেননি।" বোম্বাই-এর অধিবেশনে ৮ই আগষ্ট গান্ধীজী ঘোষণা করলেন—"ইংরাজ ভারত ছাড়", দেশবাসীকে বাপুজী বলেন, "এটাই জাতির স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম। এখন থেকে প্রতি ভারতবাসী নিজেকে স্বাধীন ভাববে। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'।" কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশ্য করে গান্ধীজী বলেন "আজ থেকে প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মী স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মদানে প্রস্তুত থাকবেন। যদি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কোন নির্দেশ দিতে না পারে, তবে প্রতি কংগ্রেস কর্মী নিজেকে জাতির সেবক মনে করে, তাঁর বিবেক অনুযায়ী কাজ করবেন।" আগষ্ট আন্দোলনের মস্তিষ্ক নষ্ট করার জন্য, বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর আদেশে ৯ই আগষ্ট বোম্বাই-এর অধিবেশনে উপস্থিত কংগ্রেসের প্রথম সারির সকল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল। স্বয়ং মহাত্মাও গ্রেপ্তার হলেন। তিনি "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের পরিচালনার জন্য কোন ছক বা পরিকল্পনা ঘোষণার সময় পেলেন না।

মেদিনীপুরের বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা কুমারচন্দ্র বোম্বাই অধিবেশন থেকে ফেরার পথে গ্রেপ্তার হলেন। জেলার কংগ্রেস নেতাগণ অজয়বাবু, সতীশবাবু, সুশীলবাবু প্রভৃতির গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারি হলে তাঁরা গা ঢাকা দিলেন। আসন্ন সংগ্রামের জন্য গ্রামে গ্রামে প্রস্তুতি চালালেন। মহাত্মা ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গোটা দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। আসমুদ্র হিমাচলে একটা রাজনৈতিক ভূমিকম্পন দেখা দিল। যে সকল ব্রিটিশ শাসনের নিদর্শন ছিল যেমন

রেল, টেলিগ্রাফ, কোর্ট, অফিস ইত্যাদি ক্রুদ্ধ জনতা তা ধ্বংস করে দিল। বোম্বাই দিল্লী ও বারাণসীতে জনতা পুলিশের সাথে খণ্ড যুদ্ধ চালাল, আমেদাবাদ হল ভারতের ষ্ট্যালিন গ্রাড্।

মেদিনীপুর দিন কয়েক সময় নিয়ে ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ খ্রীঃ আগষ্ট আন্দোলনে প্রকৃতপক্ষে যোগ দিল। কলকাতার চেতলায় মেদিনীপুর থেকে বহিষ্কৃত এ্যাডভোকেট মন্মথনাথ দাসের গৃহে বসে আগষ্ট আন্দোলনের নীল নক্সা রচিত হল। তমলুক মহকুমার দায়িত্ব নিলেন অজয়বাবু, সতীশবাবু, সুশীল বাবুরা। তখন গান্ধীবাদী কুমারচন্দ্র জেলে, সুতরাং তিনি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিতে পারেননি। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ খ্রীঃ রাত্রে তমলুক-মহিষাদল, মহিষাদল-সুতাহাটা, তমলুক-নরঘাট, তমলুক-পাঁশকুড়া সড়ক কেটে এবং পুল ধ্বংস করে জেলা ও জেলার বাইরের সাথে যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করা হল। গোটা মহকুমায় টেলিগ্রাফ লাইন কেটে ফেলা হয় ও ডাক্ যোগাযোগ নষ্ট করা হল। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৯শে সেপ্টেম্বর নিরস্ত্র নরনারী থানা ও আদালত দখল করতে এগিয়ে এল। থানা অভিযানের কথা গোপন রাখা হয়নি। পুলিশকে তার প্রস্তুতি নিতে সুযোগ দেওয়া হয়। তার আগে ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২ মহিষাদল থানার দানিপুরে জেলা থেকে চাল রপ্তানীতে বাধা দিতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে তিনজন দেশকর্মী শহীদ হন। দানিপুরের মাটিতেই মেদিনীপুরের আগষ্ট আন্দোলনের প্রথম রক্ত ঝরে। দানিপুরের গুলি চালনার ফলে সারা মহকুমার জনগণ উত্তেজনায় কঠিন ও কঠোর হয়ে ওঠেন। ক্ষোভে ও ক্রোধে লোকে মরিয়া হয়ে ওঠে। ২৯শে সেপ্টেম্বর দেখা দিল জনতার সেই উত্তাল অভিযান। সমুদ্র কল্লোলের মতই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করে হাজার হাজার লোক থানা দখলের জন্য এগিয়ে এল। তমলুকে আদালত ও মহকুমা শাসকের বাসস্থানের দিকে শোভাযাত্রা জাতীয় পতাকা নিয়ে এগিয়ে এল। নারীরা শত শত শঙ্খ ধ্বনিতে সমুদ্র কল্লোলের ধ্বনি তুলে দেশমাতার মুক্তির আহ্বান জানালেন। ইংরাজের অনুগত দেশীয় পুলিশ ও অফিসাররা এই নিরস্ত্র জনতার উপর নির্মম গুলি বর্ষণ করল। তমলুকে মাতা মহীয়সী মাতঙ্গিনী হাজরা শহীদ হলেন এবং আরও অনেকে প্রাণ দিলেন। মহিষাদলে ১৩ জন, নন্দীগ্রামে ৮ জন দেশকর্মী শহীদ হলেন। গুলিতে আহতের সংখ্যা ছিল অনেক, তমলুকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের রক্ত রাঙা ইতিহাস রচিত হল। সুতাহাটা থানা জনতা দখল করল।

থানা অভিযানের উন্মাদনা তখনও লোকের মনে বাজছিল। এরই মাঝে ১৬ই অক্টোবর ১৯৪২ খ্রীঃ মহাষ্টমীর দিন প্রচণ্ড ঝড়ে সমুদ্রের জলরাশি স্ফীত হয়ে কাঁথি ও তমলুক মহকুমাকে প্লাবিত করল। ঝড় ও প্লাবনে ঘরবাড়ী, শস্যক্ষেত্র, গৃহপালিত পশু ব্যাপক ধ্বংস হল। কোন কোন স্থানে প্রাণ হানিও হল। কত ক্ষতি হল কে তার খবর রাখে? সরকারি পরিসংখ্যান যদিও বিশ্বাস্য নয়, তবুও তাতে বলা হল ২১.৫১১ একর জমির ফসল, ১১০ মাইল নদী বাঁধ, ৮১৯৩টি গরু মোষ ১.১০,৩৪৬টি গৃহ এই মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়। আমন ফসল ধ্বংস হওয়ায় জেলায় ভয়ঙ্কর খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ইতিপূর্বে লীগ সরকারের আশ্রিত ইস্পাহানী কোম্পানী জেলার ধান চাউল রপ্তানী করেছিল। এখন নতুন ফসল নষ্ট হওয়ায় মধ্যবিত্ত গরীব সকলেই খাদ্যাভাবে জর্জরিত হতে থাকে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতই জেলায়, রাস্তাঘাটে অনাহারে মানুষ মরতে থাকে। জেলা শাসক পাঠান জাতীয় আই-সি-এস, এন. এম. খান বিদ্রোহী মেদিনীপুরবাসীকে শায়েস্তা করার জন্য উপযুক্ত খয়রাতী বা দাদন সরকার থেকে দেওয়া বন্ধ রাখেন। ৪২-এর দুর্ভিক্ষে জেলায় "মৃত্যুর উৎসব" (Festival of death) চলে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে জেলাবাসীর দুর্দশার কথা চেপে রাখা হয়।

প্রকৃতির রুদ্ররোষের সঙ্গে তমলুকে নেমে আসে ব্রিটিশ সরকারের বর্বর দমন পীড়ন। ২৯শে সেপ্টেম্বর থানা অভিযানের শাস্তি দিতে কলকাতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য মজুদ ব্রিটিশ, কানাডিয়ান, বালুচ ও মার্কিন সেনাদলকে তমলুকে আনা হয়। গোটা তমলুক মহকুমায় ভারত রক্ষা আইন অনুযায়ী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, জনসাধারণের উপর মধ্যযুগীয় বর্বর নির্য্যাতনের ব্যবস্থা চালু করা হয়। গ্রেপ্তার, বেত্রাঘাত, গৃহদাহ, চিরুনী অভিযান, কুলনারীর সতীত্ব নাশ ও পৈশাচিক অত্যাচার মহকুমাবাসীর উপর নেমে আসে। উইকেনডেন রিপোর্টে তার সামান্য অংশ ধরা আছে মাত্র। এখনও বহু প্রত্যক্ষদর্শী আছেন যাঁরা অনেক বেশী তথ্য দিতে পারবেন। সরকারী হিসাবমত ১১৬টি গৃহ দাহ করা হয়। বিভিন্ন এলাকায় মাতৃজাতির উপর চলে পাঠান ও বালুচ সেনার নির্মম ধর্ষণ। সূর্যের অপেক্ষা বালির তাপ বেশী। ইংরেজের গোলাম কিছু কিছু দেশীয় পুলিশ কর্মচারী নাৎসী আইনম্যানের ইহুদী নির্যাতনের কায়দায় নির্যাতনে Specialize করে।

এইভাবে যখন কবি গুরুর ভাষায় "প্রতিকার হীন শক্তের অপরাধে, বিচারের

বাণী নীরবে নিভৃতে" কাঁদছিল। সেই সময় মহকুমার দেশনেতা অজয় কুমার, সতীশচন্দ্র, স্মশীল কুমার প্রভৃতি বহু চিন্তার পর তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেন। এই সরকারের মুখপত্র 'বিপ্লবী'র ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ সংখ্যায় অজয়বাবু ঘোষণা করলেন "ভারতের স্বাধীনতার জন্য শেষ যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধে হয় বিজয়, নয় মরণ। তমলুকে ব্রিটিশ সেনার অত্যাচার ও অরাজকতা আর চলতে দেওয়া যায় না। তাই মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রবর্তিত হচ্ছে।" এই সরকার ইংরাজের বিরুদ্ধে শুধু একটি সমান্তরাল সরকার ঘোষণা করে ক্ষান্ত থাকেনি, জেলায় দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ কার্যে অংশ নেয়। 'বিপ্লবী' পত্রিকা থেকে জানা যায় যে ত্রাণ কার্যে জাতীয় সরকার প্রায় ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করেন, বহু ছোলা, গুড় বিতরণ করেন। বিপ্লবী নেতাদের অবস্থান ও জাতীয় সরকারেব গোপন ঘাঁটিগুলি সম্পর্কে এক শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক দালাল বা পঞ্চম বাহিনীর লোক ব্রিটিশ সেনার কাছে গোপন খবর পাচার করায়, জাতীয় সরকার তাদের দমন, সন্দেহভাজন গুপ্তচরদের গ্রেপ্তার ও প্রয়োজনে প্রাণদণ্ড দেয়। এই সন্ত্রাসের ফলে দুষ্ট দেশদ্রোহিরা দমিত হয়, জনসাধারণের মনে আস্থা ফিরে আসে। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গ্রামীণ বিবাদের বিচার করত। জনসাধারণকে ব্রিটিশের আদালতে মামলা না করতে অনুরোধ করত। জাতীয় সরকারের অধীনে থানা, মহকুমা ও আপীল আদালত গঠন করা হয়েছিল। প্রকাশ্য স্থানে বিচার সভা বসত। দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই ধরণের মামলার বিচার হত। অপরাধ প্রমাণিত হলে ফৌজদারী মামলায় জরিমানা বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা দৈহিক শাস্তি দেওয়া হত। ২৯৯৭টি মামলার নিষ্পত্তি জাতীয় সরকার করে।

ব্রিটিশ সরকার যেটুকু খাদ্য শস্য বা অর্থ দুর্ভিক্ষ-ত্রাণে লাগাবার জন্য দিত তা মহকুমার ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দরিদ্রের মধ্যে সব বিতরণ না করে আত্মসাৎ করেন। ব্রিটিশ সরকারের পাঠানো বীজধান চাষীকে সব বণ্টন না করে কিছু নিজেরা বিক্রি করতেন। জাতীয় সরকার এই ধরণের অপরাধীদের অথবা তাদের পরিবারের লোকেদের গ্রেপ্তার করে জরিমানা ধার্য করেন। যতদিন না আদায় হয় ততদিন বন্দীকে আটক রাখা হয়। ভালভাবে খাদ্য ও বাসের ব্যবস্থা করা হয়। যে সকল ধনী জোরদার বা ধনী চাষী গোলায় ধান মজুদ করে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট চাষীদের কাছে বেশী দামে বিক্রি করে মুনাফা করেন, তাঁদের মজুদ ধান দুর্ভিক্ষ পীড়িত চাষীদের কাছে বিতরণ বা বণ্টনের দাবী জানানো হয়।

রাজী না হলে ভীতি প্রদর্শন করে গ্রেপ্তার অথবা জরিমানা ধার্য করা হয়। মহকুমাবাসীর এই মহা সর্বনাশের দিনে মজুদদার অথবা জোতদারের মুনাফা বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে আর্ত-ত্রাণে তাঁদের বাধ্য করা হয়। অন্য কোনভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি লুঠ অথবা কেড়ে নেওয়া হয়নি। সমস্ত কাজই বৃহত্তর স্বার্থের জন্য করা হয়। ব্রিটিশ সরকার তমলুকের বিদ্রোহী জনগণকে শায়েস্তার জন্য জেল থেকে দাগী আসামীদের ছেড়ে দেন। এই সকল স্বভাব অপরাধী জনজীবনে বিভীষিকা সৃষ্টি করে। জাতীয় সরকার তার গুপ্তচর বিভাগের সহায়তায় এই সকল অপরাধীদের শায়েস্তা করে। উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য জাতীয় সরকারের কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু ভুল ত্রুটি ঘটে। যে জরুরী অবস্থা এবং ব্রিটিশের সাথে সংঘাতের মধ্যে জাতীয় সরকারকে চলতে হয়, তাতে দু একটি ভুল ত্রুটি ঘটা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সার্বিকভাবে জাতীয় সরকার মহকুমার জনগণকে বিশেষতঃ মাতৃজাতিকে নিরাপত্তা দিতে এবং ব্রিটিশের সন্ত্রাস থেকে রক্ষার চেষ্টা করে ছিল। সন্দেহভাজন ব্রিটিশের গুপ্তচরদের দমন করেছিল। ১৯৪২ খ্রীঃ ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৪ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার অধিষ্ঠিত ছিল। ব্রিটিশ শত চেষ্টাতেও জাতীয় সরকারের প্রধান কর্মকেন্দ্র বা সদর দপ্তরগুলির হদিস পায়নি।

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক ছিলেন প্রথমে সতীশবাবু, তাঁর গ্রেপ্তারের পর এই পদে বসেন অজয়বাবু। সুশীলবাবু ছিলেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, গুপ্তচর দমন, জনসংযোগ রক্ষা, যুবশক্তি ও স্বেচ্ছা সেবকদের নেতৃত্বদানে জাতীয় সরকারের গুপ্তচর, বিদ্যুৎ বাহিনী ও ভগিনী সেনা পরিচালনা প্রভৃতির গুরুদায়িত্ব তার কাঁধে পড়েছিল। সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সতীশবাবু ও তারপর অজয়বাবু প্রভৃতি। জাতীয় সরকার চালু রাখতে বেশ কিছু ব্যয় হত। স্বেচ্ছাসেবকদের খাওয়া পরার খরচা, ক্যাম্প বা শিবির খরচা, বুলেটিন ছাপান, সংবাদ আদান প্রদান দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্য প্রভৃতি যাতে টাকা লাগত। জরিমানা বাবদ যে টাকা সংগ্রহ হত তা থেকে খরচ নির্বাহ করা হত।

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার শেষ পর্যন্ত মহাত্মার নির্দেশে ভেঙে দেওয়া হয় (১৯৪২ খ্রীঃ) নতুবা জনসমর্থন থাকায় এই সরকার ১ বছর ন'মাস চালু ছিল। জনসমর্থন না থাকলে ব্রিটিশ সেনা ও পুলিশের চিরুণী তল্লাশি এড়িয়ে এই সরকার অবাধে চলতে পারত না। যদিও সরকারের নেতাগণ ব্রিটিশ পুলিশের

হাতে গ্রেপ্তার হন, তা সম্ভব হয় নেতাদের অসাবধানতার জন্য। দেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁরা বন্দী হননি। দু-চার জন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সকল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেখা যায়। ব্রিটিশের সেনা ও পুলিশের অকথ্য অত্যাচার সত্ত্বেও জনসাধারণ ভেঙে পড়েননি বা জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে যাননি। কোন কোন ঐতিহাসিক জনসমর্থনের ব্যাপারটি উড়িয়ে দিয়ে বলেন যে জনতা ভয়ে সমর্থন করেছিল স্বেচ্ছায় সমর্থন করেননি। তাহ'লে তাদের মতের corollary হ'ল যে জাতীয় সরকারের শাস্তির ভয়ে সমর্থন করে নতুবা তারা ব্রিটিশ সরকারকেই সমর্থন জানাত। একথা কি ঐতিহাসিক সত্য বলে মানা চলে? জাতীয় সরকারের পক্ষে যে জনসমর্থন ব্যাপক ভাবে ছিল তার সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হল বাংলার ছোট লাট স্যার আর. জি. ক্যাসি। ভারতের বড়লাটকে ১৪ই আগষ্টের (১৯৪৪) একটি নোটে বলেন যে, 'স্থানীয় অধিবাসীদের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ এই জাতীয় সরকারের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। কংগ্রেসের আগষ্ট বিদ্রোহের গোড়া থেকে এই সরকার চালু আছে।'

জাতীয় ঐতিহাসিকদের পিতামহ প্রতিম ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে—"চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকার এবং তমলুকে আগষ্ট আন্দোলন ও জাতীয় সরকার স্থাপন উভয়ের মধ্যে তুলনা করা যায়। কালানুক্রম অনুযায়ী চট্টগ্রামের বিদ্রোহের অনেক পরে তমলুকের এই আন্দোলন ও জাতীয় সরকার স্থাপিত হলেও, লক্ষ্য ও কার্য প্রণালীর বিচারে তমলুকের এই আন্দোলনকে বাংলার সর্বপ্রধান হিংসাত্মক বিদ্রোহ বলে গণ্য করা যায়।

(১) চট্টগ্রাম বিদ্রোহ অল্প সময়ের জন্য ইংরাজ শাসনকে অচল করতে পেরেছিল। বিপ্লবীদের সাথে জনসাধারণের কোন সংযোগ চট্টগ্রামে ছিল না, যদিও জনসাধারণ বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু মেদিনীপুরে যা ঘটেছিল তাকে গণবিদ্রোহ বলা যেতে পারে। জেলার সর্বশ্রেণীর নরনারী আগষ্ট বিপ্লবে অংশ নেয়। (২) চট্টগ্রাম বিপ্লব ২/৩ দিনের জন্য স্থায়ী হয়। মেদিনীপুরের এই অঞ্চলে প্রায় দেড় বছরের বেশী ইংরাজ শাসন বিলুপ্ত হয়। (৩) চট্টগ্রাম বিপ্লবের পর ব্রিটিশ সরকার সীমিতভাবে জনসাধারণের উপর দমন-পীড়ন চালায়। মেদিনীপুরের মত ব্যাপক গৃহদাহ, অমানুষিক অত্যাচার ও পাইকারী নারী নির্য্যাতন সেখানে হয়নি।"

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন মেদিনীপুরের আগষ্ট আন্দোলন যে পন্থায় পরিচালিত হয় এবং তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার যেভাবে কাজ করে তা ছিল

গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলনের ঘোর বিচ্যুতি, গান্ধীবাদী কুমারচন্দ্র 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় জেলে ছিলেন। পরে মুক্ত হওয়ার পর আন্দোলনের পন্থা নিয়ে তাঁর সঙ্গে জাতীয় সরকারের নেতাদের গভীর মতভেদ হয়। গান্ধীজী মহিষাদলে এলে কুমারবাবু এ নিয়ে গান্ধীজীর কাছে অভিযোগ করেন। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর গ্রন্থে অভিযোগ করেছেন যে জাতীয় সরকারের আন্দোলন আদপেই গান্ধীবাদী আন্দোলন ছিল না। এই সরকার হিংসাত্মক নীতিতে যে সকল বিভিন্ন কাজ করে তার ফলে তাকে ভুগতে হয়েছিল। তিনি সোদপুরে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। গান্ধীজী তাঁকে লেখা এক পত্রে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে সতীশবাবু, অজয়বাবু গ্রেপ্তার হওয়ার পর সুশীলবাবু জাতীয় সরকারের সর্বেসর্বা হয়ে বহু বাড়াবাড়ি করেন।

আগষ্ট আন্দোলন থেকে আজ আমরা অর্ধশতক দূরে চলে এসেছি। এখন ব্যক্তিগত আবেগ মুক্ত হয়ে এই আন্দোলন সম্পর্কে নির্মোহ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করার সময় এসেছে। একথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে আগষ্ট আন্দোলন গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলন ছিল না। পথঘাট কাটা, ডাকঘর পোড়ানো বা খাজনা চৌকি ধ্বংস করা অথবা জাতীয় সরকারের আমলে ব্রিটিশ গোয়েন্দাগিরির জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শাস্তি দান গান্ধীবাদী আন্দোলনের ব্যাকরণে নেই। গান্ধীবাদের ব্যাখ্যাকার কিশোরীলাল মশরুওয়ালা হরিজন পত্রিকায় অবশ্য যুক্তি দেখান যে রেলপথ, টেলিগ্রাফ যেহেতু জাতীয় সম্পত্তি সেহেতু জনসাধারণ দরকার মনে করলে তা ধ্বংস করতে পারেন। কোর্ট, কাছারী, থানা অহিংসভাবে দখল তাঁর মতে অহিংস আন্দোলনের সীমার মধ্যেই পড়ে। এই যুক্তি সকলে মানবেন বলে মনে হয় না। স্বয়ং গান্ধীজী সতীশবাবুর কাছে যা বলেন তাতে তিনি এই যুক্তি মানেননি দেখা যাচ্ছে। আমরা একটু পরে গান্ধীজীর বক্তব্যে আসব। কিন্তু যদি মেদিনীপুরের "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন অহিংস পন্থায় না চালিত হয় তাতে দোষ কোথায়? ভারতের যেখানেই আগষ্ট আন্দোলন ও সমান্তরাল সরকার গঠিত হয়েছিল, সেসব স্থানের কোথাও গান্ধীবাদী ব্যাকরণ মেনে পরিচালিত হয়নি। উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলি, গোরক্ষপুরেই হোক, জুবা মাল্লার সমান্তরাল সরকারই হোক, অথবা উড়িষ্যার বালেশ্বর ও তালচেরের আন্দোলন ও জাতীয় সরকার হোক, মহারাষ্ট্রের, কর্ণাটকের আন্দোলন ও পাত্রি সরকার হোক কোনখানেই আন্দোলন অহিংস পথে চলেনি। মহারাষ্ট্রে

নানাজি পাতিলের নেতৃত্বে দিনে কৃষক রাত্রে গেরিলা সেনা সেজে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালান হয়েছিল। ভারতের সর্বত্র এই আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও সহিংস। তাহলে তমলুকের আন্দোলন ও জাতীয় সরকারের কাজকে আলাদা করে বেছে নিয়ে অনুবীক্ষণের নীচে ফেলে তা গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলন ছিল কিনা, তার পরীক্ষা কেন? ব্যক্তিগত আবেগ ও উত্তাপ মুক্ত হয়ে ভারতের সার্বিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তমলুকের আন্দোলন বিচার না করে আলাদাভাবে বিচার করা কেন?

জয়প্রকাশ নারায়ণ ছিলেন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য নেতা ও পরিকল্পনাকারী। তিনি বলেন যে "আমরা ৮ই আগষ্টের বোম্বাই প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি। ব্রিটিশকে আগ্রাসীশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছি। আমরা তাই বোম্বাই প্রস্তাব অনুসারে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালনা করে ন্যায্য কাজই করেছি। তা যদি গান্ধী নীতির সাথে না মেলে তা আমাদের অপরাধ নয়।" 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন কিভাবে পরিচালিত হবে তার কোন রূপরেখা বা কর্মসূচী গান্ধীজী দিয়ে যেতে সময় পাননি সেহেতু 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন অহিংস পথে চলতে বাধ্য ছিল, এই দাবী অন্ধ গান্ধীভক্ত ছাড়া আর কেউ করবেন না; তাছাড়া অহিংসা সম্পর্কে ১৯২০-২২-এর গান্ধীজীর যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ১৯৪২-এ তার পরিবর্তন ঘটেছিল। লুই ফিশারের কাছে গান্ধীজী স্বীকার করেন যে অহিংসার প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর আগেকার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে। গান্ধীজী সর্বদাই কাপুরুষের অহিংসাকে ঘৃণা করতেন। তমলুকে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্রিটিশের গুপ্তচর বা দেশীয় দালালদের কাছে খবর পেয়ে ইংরাজের সেনাদল বিশেষ বিশেষ সন্দেহভাজন গ্রামে অকথ্য অত্যাচার চালায়, নারীদের উপর গণধর্ষণ চালায়। এক্ষেত্রে জাতীয় সরকার সন্দেহভাজন ব্রিটিশ গুপ্তচরকে শাস্তি দান করে, জনগণ ও নারীদের রক্ষার চেষ্টা করে। শ্রদ্ধেয় সতীশবাবুর কাছে গান্ধীজী মহিষাদলে আসার পর, একথা শুনে গান্ধীজী শ্রীমতী আভা গান্ধী ও ডাঃ সুশীলা নায়ারকে সরজমিনে নারী ধর্ষণের তদন্ত করে সতীশবাবুর বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে সন্তুষ্ট হন। জাতীয় সরকারের সন্ত্রাসের জন্য যাঁরা তার কাছে অভিযোগ করেন গান্ধীজী সে সম্পর্কে সতীশবাবুর বক্তব্যের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে মন্তব্য করেন যে, "পরিস্থিতি যা ছিল তাতে তোমরা যা করেছ, সেজন্য তোমাদের দোষ দিতে পারি না। তবে আন্দোলন অহিংস পন্থায় পরিচালিত হলে আমি খুশী হতাম।"

পরিস্থিতি বিচার করে গান্ধীজী তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারকে ছাড়পত্র দিলেও, কোন কোন বিদগ্ধ লোক এই রায় মানতে রাজী হননি এটা দুর্ভাগ্যজনক। আন্দোলন পরিচালনায় কিছু ভুল ত্রুটি হতেই পারে। আসলে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ঠিক ছিল কিনা তা বিচার করে দেখা উচিত। কোথাও কোনো ক্ষেত্রে দু একটা ভুল হয়ত হয়েছিল তারজন্য গোটা তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের কার্যকলাপকে গুরুত্বহীন বলে নস্যাৎ করা দুর্ভাগ্যজনক। সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তা প্রায় সকল আন্দোলনে কম বেশী দেখা যায়। ফরাসী বিপ্লবে রোবস পীয়ারের সীমাহীন সন্ত্রাস, রুশ বিপ্লবে ষ্টালিনীয় রক্তস্নানের কথা কে ভুলতে পারে? তারজন্য এই বিপ্লবকে তুচ্ছ করা হয়নি। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ছিল আসলে সর্বভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের অঙ্গ। ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুক্ত অঞ্চল গঠন করে ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই চালান হয়। তমলুকেও তাই হয়।

ডঃ ত্রিপাঠী সর্বভারতীয় স্তরে ভারতছাড়ো আন্দোলনের মূল্যায়ন করে বলেছেন যে আগষ্ট আন্দোলন বা ভারতছাড়ো আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের ৫ বছর পরে ইংরাজ ভারত ছাড়ে। পাঁচ বছর পরে ইংরেজের এই ভারত ত্যাগ আগষ্ট আন্দোলনের জন্য হয়নি বলে ডঃ ত্রিপাঠী মনে করেন ও সুমিত সরকার আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন যে, "তুচ্ছ তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলার একটি কোণে স্থাপিত হওয়ায়, কলকাতার প্রাদেশিক সরকার তাতে চিন্তিত হয়নি এবং এই সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে আরাকান বা আসাম রনাঙ্গণের সাথে কলকাতার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি।

উপরোক্ত মূল্যায়ন সমালোচনার দাবী রাখে। ভারতের স্বাধীনতা ছিল একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক আন্দোলন। তা অহিংস এবং সহিংস উভয় খাতেই প্রবাহিত হয়। কোন একটি স্থানের, কোনো বিশেষ আন্দোলনকে বেছে নিয়ে তা সফল অথবা বিফল হয়েছিল কিনা, তা আলাদাভাবে বিচার করা ইতিহাস সম্মত নয়। তাহলে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর আত্মদান, চট্টগ্রামে মাষ্টারদার অভিযান বা বিনয় বাদল দীনেশের আত্মদান, এই যুক্তিতে ব্যর্থ হয় এবং তা মূল্যহীন বলতে হয়। একই যুক্তিতে মহাত্মার নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯২০-২২-এর অসহযোগ এবং ১৯৩০-৩৪-এর আইন অমান্য আন্দোলন সফল হয়নি বলা চলে। এই বিচার কি সকলে মেনে নেবেন? আসলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল এক দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম, বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন সময়ে

তা চলেছিল। আন্দোলনগুলির পন্থা যাইহোক না কেন, মূল লক্ষ্য ছিল এক, এবং তা হল ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করা। ধাক্কার পর ধাক্কা পড়তে থাকায় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শিকড় আলগা হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ইংরাজ ভারত ত্যাগ করে। সুমিত সরকারের যুক্তি মানলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও স্বাধীন সরকার ঘোষণাও ছিল অকিঞ্চিতকর। কারণ চট্টগ্রাম নিশ্চয়ই কলকাতার কাছে নয় এবং এই বিদ্রোহ কলকাতার সরকারকে মোটেই অচল করতে পারেনি। তাহলে চট্টগ্রামের আন্দোলনের কেন এত প্রশংসা? বাঘা যতীনের বালেশ্বরের যুদ্ধেরই বা কি গুরুত্ব তাহলে আছে?

আসলে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রতি তাচ্ছিল্য বশতঃ এই কলিকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি তমলুকে আগষ্ট আন্দোলনের সঠিক মূল্যায়ন করেননি। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ছিল এক ব্রিটিশ শাসন মুক্ত অঞ্চল গঠনের প্রচেষ্টা। ব্রিটিশ সরকার এজন্য এই সমান্তরাল সরকারকে উপেক্ষা করেননি। সেনা পুলিশ নিয়োগ ও দমননীতির দ্বারা এই সরকারকে উচ্ছেদের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আগষ্ট আন্দোলনের সর্বভারতীয় ব্যাপকতা ও তার গভীরতা দেখে লর্ড ওয়াভেল ভারত সচিবকে জানান যে ১৯৪২-এ যুদ্ধের জন্য মিত্র পক্ষের সৈন্য ভারতে থাকায় এত বড় গণবিদ্রোহ আপাততঃ দমন করা গেছে। এরপরে যখন মিত্র শক্তির সেনাদল থাকবে না, তখন এরকম বিদ্রোহ হলে ব্রিটিশকে ভারত ছাড়তে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের গুরুত্ব ওয়াভেল রিপোর্টের পটভূমিকায় বিচার করা উচিত। গান্ধীবাদী প্রাক্তন বিপ্লবী ও চিন্তাবিদ শ্রী পান্নালাল দাশগুপ্ত বলেন "ইংরেজের বিরুদ্ধে মুক্তাঞ্চল গঠন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আঞ্চলিক ক্ষমতা দখলে রাজনীতির কৌশল আজ দেশ-বিদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আগষ্ট আন্দোলন যখন সারা দেশে স্তিমিত ও স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন এ জাতীয় স্বাধীন আঞ্চলিক সংগ্রামই দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকা উড্ডীন রাখতে পেরেছিল।" ভারতবর্ষ একটি ছোট মহাদেশ। এই বিরাট দেশের সার্থক মুক্তি সংগ্রাম কেবলমাত্র একটি সর্বব্যাপক সংঘাতে সুসম্পন্ন হতে পারে। অজয়বাবু ও সুশীলবাবুরা মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করে সীমায়িত ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সংহত করেন। সারা দেশের মুক্তি সংগ্রামের বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে এই স্থানীয় মুক্তাঞ্চল গঠনের গুরুত্ব বুঝতে হবে।

বিপ্লবী মহাচীনে মহা বিপ্লবী মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনা কমিউনিষ্টগণ লং মার্চ (Long March) করে উত্তর পশ্চিম চীনে মুক্তাঞ্চল গড়েন এবং পরে

তারা গোটা চীনকে অধীনে আনেন। আগষ্ট আন্দোলনের সময় তমলুক সহ ভারতের কয়েকটি স্থানে এই রকম মুক্তাঞ্চল গঠন করা হয়। পুনায় নানাজি পাতিল ও শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির নেতৃত্বে পাত্তি সরকার, কর্ণাটক ন্যায়দান মণ্ডল, উত্তর প্রদেশের বালিয়াতে জয়প্রকাশের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার, উড়িষ্যার পবিত্র মোহন প্রধানের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠন ছিল এই মুক্তাঞ্চল গঠনের চেষ্টা। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ছিল একই প্রকার মুক্তাঞ্চল গঠনের প্রক্রিয়া। অবিভক্ত বাংলার মধ্যে একমাত্র মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমাতেই তা বাস্তবায়িত করা হয়। এই প্রচেষ্টাকে গুরুত্বহীন ভাবা দুর্ভাগ্যজনক। অথচ এই সকল মতবাদের চশমা পরা বুদ্ধিজীবীরা পাবনার কৃষক আন্দোলন বা নকশাল বাড়ীর আন্দোলন নিয়ে নৃত্য করেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল এক দীর্ঘায়িত প্রক্রিয়া। আগষ্ট আন্দোলন ছিল এই স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষের দিকের বিরাট পদক্ষেপ। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ছিল সেই চেষ্টার প্রধান অঙ্গ। এই জাতীয় সরকারের বিপ্লবী নেতারা দাবী করেন যে তাঁদের আন্দোলন দুটি পতাকার নীচে পরিচালিত হয়। প্রধান পতাকা ছিল কংগ্রেসের ৮ই আগষ্টের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পতাকা, দ্বিতীয় পতাকা ছিল নেতাজীর। তাঁরা আশা করতেন যে আজাদ হিন্দ সেনা তমলুক বা কাঁথির সমুদ্র উপকূলে নামবে, তাঁরা আজাদ হিন্দ বাহিনীকে বরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এ সম্পর্কে কোনো দলিল পত্রের প্রমাণ না থাকায় ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী এই দাবীকে গুরুত্ব দেননি। এ বিষয়ে সুনিশ্চিত কিছু বলার মত তথ্য প্রমাণ হাতে নেই, একমাত্র জাতীয় সরকারের জীবিত নেতাদের মুখের কথা ছাড়া। যদি পরে এবিষয়ে কোন চিঠিপত্র ও লিখিত তথ্য পাওয়া যায় তবে মূল্যায়ন হতে পারে। শুধু একটি কথা এখানে বলা যায় ব্রিটিশের আশংকা ছিল যে জাপানের সহায়তায় আজাদ বাহিনী হয়ত নামতে পারে। এজন্য তমলুক ও কাঁথিতে তারা Denial Policy নেয়।

মেদিনীপুরের আগষ্ট আন্দোলনের সামাজিক চরিত্র বিচার করে এই আন্দোলনকে মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত ও জমি মালিকদের পৃষ্ঠপোষকতা যুক্ত আন্দোলন বলা যাবে না। সকল শ্রেণীর হিন্দু মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের এবং ধনী দরিদ্র ভাগচাষী, রায়ত সকলেই এই আন্দোলনে সামিল হন। জাতীয়তাবাদ, ব্রিটিশ বিরোধিতা, মেদিনীপুরের নিজস্ব সংগ্রামী ঐতিহ্য, জেলায় ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণ এবং গান্ধীজীর ডাক জেলাবাসীকে অনুপ্রাণিত করে।

আজ যখন স্বাধীনতা আমরা লাভ করেছি, আজ মেদিনীপুর জেলার সেই সংগ্রামী চেতনার, সেই আত্মত্যাগের সেই উন্মাদনার সামান্য অবশেষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন আগষ্ট আন্দোলনের স্মৃতিটুকুও জেলার বর্তমান প্রজন্মের যুবকদের মনের মুকুরে ধরা নেই। আজ জেলার যুবশক্তি আত্মবিস্মৃত। অপসংস্কৃতির ভয়াবহ প্রকোপে আজ যুবক যুবতীরা ছন্নছাড়া। সমগ্র দেশের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবক্ষয় জেলাবাসীকে গ্রাস করে ফেলেছে। আজ আমরা কেহই দেশের জন্য আত্মদানে অক্ষম। সকলেই ভোগবাদী অভিকর্ষের টানে ছুটে চলেছি এক সর্বনাশের অতল গহ্বরের দিকে। আজ গ্রামগুলির সাংস্কৃতিক জীবন পচনশীল। সেখানে চলছে মাইক, ভিডিওর পৈশাচিক তাণ্ডব। গভীর চিন্তা, গভীর পড়াশোনা, আদর্শবাদ আজ হাসি ঠাট্টার ব্যাপার। কোনো জাতি কি এভাবে কখনও বড় হতে পারবে ? রাজনৈতিক দলগুলি সকলেই নিজ নিজ ছেঁদো মতবাদ প্রচার ছাড়া জাতি গঠনের জন্য আলো দেখাতে ব্যর্থ। যুবকেরা লক্ষ্য ভ্রষ্ট। মেদিনীপুর কি ভস্মশয্যা ছেড়ে পুনরায় উঠে দাঁড়িয়ে দেশবাসীকে আলো দেখাতে পারবে ?

এই প্রবন্ধের জন্য যে সকল গ্রন্থ ও রিপোর্টের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

১। Midnapur District Gazeteer

২। J. Wise—Notes on the Races, Castes and Traders of Bengal

৩। G. Das—History of Orissa

৪। R. C. Majumdar (Ed.)—History of Bengal. Vol. I

৫। R. M. Martin—The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India

৬। R. L. Roy—Transition of Bengal society and Land system

৭। T. Roy Chaudhury—Bengal under Aktear and gahangor

৮। R. C. Majumder—History of Freedom Movement, Vol. III

৯। K. K. Dutta—Studies in the History of Bengal subah

১০। G. P. Narayan—Towards Struggle

১১। Maulana Abul Kalam Azad—India wins Freedom
১২। Tarachand—History of Freedom struggle
১৩। A. C. Gohuson—My Mission with Mountbaten
১৪। Tendulkar—Life of Gandhi
১৫। Louis Fisher—Gandhli
১৬। সুশীল ধাড়া—প্রবাহ
১৭। অমলেশ ত্রিপাঠী—স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস
১৮। রাধাকৃষ্ণ বাড়ী—অজয় পুরুষ অজয় কুমার
১৯। যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলা
২০। Dhgrug Kumar—Economic History of India Vol. II
২১। S. C. Sarkar—Modern India
২২। বিপ্লবী—প্রকাশিত সংখ্যা
২৩। গোপীনন্দন গোস্বামী—বাংলার হলদিঘাট তমলুক
২৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৪ খণ্ড
২৫। Satish Chandra Samanta—August Revolution and Two years National Government in Midnapur

২

মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপরেখা

রাজর্ষি মহাপাত্র

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ মেদিনীপুরের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণ। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর মীরকাশিম ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রাম এই তিনটি জেলার রাজস্ব প্রদান করেন। এই চুক্তির ফলে মেদিনীপুর ব্রিটিশ শাসনের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু মেদিনীপুরে আধিপত্য পুরোপুরি কায়েম করতে প্রতি পদে পদে কোম্পানীকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এমনিতেই একাধারে মারাঠাদের আক্রমণ অপরদিকে ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী ও ফকিরদের দলবদ্ধ উপদ্রব কোম্পানীকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলে।[১] সুতরাং এই অধিকার লাভের ফলে কোম্পানী কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়—(১) জমির প্রকৃত মালিক কে এবং কি উপায়ে তার থেকে রাজস্ব আদায় করা যেতে পারে? (২) জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনপক্ষ হল সরকার, জমিদার ও কৃষি উৎপাদক শ্রেণী। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক কিভাবে নির্ণীত হবে? (৩) কিভাবে ইংরেজ সরকারের পক্ষে জমির উৎপাদক শ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভবপর হবে?

বিশেষভাবে মেদিনীপুর জেলার অরণ্য পরিবেষ্টিত এলাকা জঙ্গল মহালের জমিদারদের কাছ থেকে বর্দ্ধিত হারে খাজনা আদায় করতে গিয়ে কোম্পানীকে এক বিরাট প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হল। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার এই গণবিক্ষোভকে ভূস্বামীদের বিক্ষোভ রূপে গণ্য করলে প্রকৃত সত্যের অপলাপ হবে। কারণ জঙ্গল মহালের ভূমরাজন্যবর্গ প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা এতদিন জমির মালিকানা তাদের কৃষক সৈনিকদের সঙ্গে সুখে দুঃখে একসঙ্গে ভোগ করে এসেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে সুলতানী মুঘল আমলেও জঙ্গল মহালের জমিদারবৃন্দ কর্তৃপক্ষকে নামমাত্র খাজনা প্রদান করার বিনিময়ে স্বাধীনভাবেই নিজ নিজ জমিদারী শাসন করত। তাদের প্রচুর নিষ্কর জমি ছিল। জমিদারীর আইন শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার ভার ছিল তাদের উপরে এই জন্য প্রতিটি জমিদারের অধীনে ছিল প্রচুর পাইক ও বরকন্দাজ। মেদিনীপুরে ইংরেজ শাসন চালু হওয়ার পর

তারা দেখল যে বিদেশী কোম্পানীর উদ্দেশ্য হল শোষণ যন্ত্র অব্যাহত রেখে তাদের সম্পূর্ণ পদানত করা। সুতরাং তারা বিদ্রোহ করল এবং কিছুতেই বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে রাজী হল না। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, ধলভূম প্রভৃতি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এই বিদ্রোহ দেখা দেয়।[২]

একাধারে জমির খাজনা বৃদ্ধি অন্যদিকে বিভিন্ন মুদ্রাকে কলকাতার মান সম্মত মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত করার জন্য পাট্টার ব্যবস্থা জমিদার ও রায়তদের সমান দুর্দশাগ্রস্থ করে তোলে। এই ব্যবস্থার পরিণতি স্বরূপ জমিদারগণ সুদখোর মহাজন শ্রেণীর শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়। জঙ্গল মহালের অনেক জমিদারই কোম্পানীর নতুন বন্দোবস্ত অনুযায়ী খাজনা দিতে অস্বীকৃত হলেন। বলরামপুর জমিদারী এলাকায় খড়ুই নামে একটি আদিবাসী উপজাতি জমিদারদের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের কঠোর হস্তে দমন করার জন্য যথারীতি কোম্পানীর অনুগ্রহপুষ্ঠ গোমস্তাগণ সৈন্যসহ প্রেরণ করা হল। এই অত্যাচারের ফলে ঝাড়গ্রাম, ঘাটশিলা, গড়বেতা প্রভৃতি স্থানের দরিদ্র উৎপাদক শ্রেণী তাদের জমিদারদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে রত হলেন।

১৭৯৩ খ্রীঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জঙ্গল মহালের প্রধূমিত অশান্তিকে প্রজ্জলিত করল। শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে প্রত্যেক জমিদারেরই পাইক বরকন্দাজ নিয়ে নিজস্ব বাহিনী গঠন করতে হত। এই পাইক বরকন্দাজেরা জমিদারকে সেবার বিনিময়ে চাকরান জমি ভোগ করত। চাকরান জমি ছিল নিষ্কর। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ায় জমিদারদের নিজস্ব বাহিনী রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। আর একদিকে সমস্ত নিষ্কর জমিতে নতুন খাজনা বসান হল। নিম্ন শ্রেণীর জাতিভুক্ত, বৃত্তিচ্যুত বরকন্দাজেরা ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হল। তাদের সম্মুখে দেখা দিল এক অনিশ্চিত দুঃসহ অবস্থা। জমিদারগণও বিশাল কর ভারের চাপে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। এই দুঃসহ অবস্থায় কোম্পানীর বিরুদ্ধে জমিদারগণের নেতৃত্বে চুয়াড়গণ, খয়রা ও মাঝিরা মাথা তুলে দাঁড়াল, সমগ্র জঙ্গল মহাল হয়ে উঠল বিদ্রোহে উত্তাল।

বগড়ীর যদুসিং, রায়পুরের দুর্জন সিং, তিরকুয়াচৌরের যশোদানন্দন প্রভৃতি জমিদারগণ খাজনা দেওয়া বন্ধ করল। ১৭৯৮ খ্রীঃ প্রায় ১৫০০ ভূমিহীন পাইক রায়পুরের কাছারী পুড়িয়ে দিল। গোবর্দ্ধন দিকপতির নেতৃত্বে ১৭৯৮ খ্রীঃ ৪০০ পাইক চন্দ্রকোণা আক্রমণ করল। কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণিও

এই বিদ্রোহে সামিল হয়েছিলেন। এই বিদ্রোহ দমনে কোম্পানীকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল।[৩]

উনবিংশ শতকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি আমেরিকার 'Wild west'-এর মতো ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হয় এবং সেইসঙ্গে, সমগ্র ক্রম-অগ্রসরমান দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার জনজাগরণ প্রতিবেশী ওড়িষ্যা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের রাজ্যগুলিতে প্রসারিত হয়ে পরিণতি লাভ করে ১৭৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের অভূতপূর্ব গণ-জাগরনের মুহূর্তে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ থেকে একশত বৎসরের ইতিহাস শুধুমাত্র জননায়ক জমিদারদের নেতৃত্বে গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস। আধুনিক ঐতিহাসিকবৃন্দ, দুঃখের বিষয় এই তৃতীয় পর্যায়ের গণ-অভ্যুত্থানের গুণগত পার্থক্যের স্বরূপ বুঝতে সচেষ্ট হননি। তাই তাঁদের কারণ বিশ্লেষণও নির্ভুল হয়নি। ১৭৯৯ সালে দক্ষিণ-পশ্চিমবাংলায় চুয়াড় বিদ্রোহ আসলে Suppressed native militery power-এর অভ্যুত্থান, যার পেছনে রয়েছে অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য ও বর্তমানের সয়ম্ভর গ্রামকেন্দ্রিক কৃষি জীবন থেকে উৎখাত হবার অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ।[৪]

১৭৭২ সালে মেদিনীপুরে 'সন্ন্যাসী' বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ মূলতঃ ইংরেজ বিদ্বেষ জনিত ব্রিটিশ কোম্পানীর বিরুদ্ধে। ইংরেজ বিতাড়নই এর মূল উদ্দেশ্য ছিল। উত্তর বাংলায় 'সন্ন্যাসী' সম্প্রদায় এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা হলেও একবার এই দলভুক্ত কিছু সন্ন্যাসী ১৭৭৩ সালে পুরী যাবার পথে মেদিনীপুর জেলায় ঢুকে পথের দুধারের অধিবাসীদের উপর অত্যাচার ও লুণ্ঠন চালায়। দলে দলে এক তীর্থ থেকে অন্য তীর্থে সশস্ত্র অবস্থায় এরা যেত। এরা পশ্চিমা হলেও এদেশের লোকের সাহায্যে গমনাপথে ধনীদিগের খাদ্য ও অর্থ আদায় করত, গৃহ ও গোলা লুণ্ঠন করত, বাধা দিলে প্রহার দিত সংহার করত। ব্রিটিশ শাসকের কুঠীও বাদ দেয়নি এরা। ১৭৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাই-এর কাছে তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য এবং তাদের বন্দী করার জন্য ইংরেজ কোম্পানী নির্দেশ দিলে সন্ন্যাসীরা ফুলকুশমা নিয়ে জঙ্গলমহলে প্রবেশ করে, গোপীবল্লভপুরের দিকে চলে যায়। শেষে ১৮১৬ সালে ব্রিটিশরা এদের করায়ত্ত করে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের ঘটনার উপর ভিত্তি করে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' রচনা করেছিলেন।[৫]

বিদেশী ব্রিটিশ শাসন মেদিনীপুরের মানুষ স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারেনি। তমলুক ও হিজলীর অসংখ্য লবণ উৎপাদনকারীদের (মলঙ্গী),

প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে কোম্পানী গড়ে তুলেছিল মুনাফার বিশাল পাহাড়। ১৮০৪ সালে জনৈক পরমানন্দ সরকারের নেতৃত্বে নিরীহ রিক্ত মলঙ্গীর দল এই অন্যায় বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। সেই যুগে যখন ব্রিটিশ সিংহের প্রতাপে 'বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়' তখন এই নিরীহ দরিদ্র মলঙ্গীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।[৬]

জঙ্গলখণ্ডে চুয়াড়দিগের অত্যাচারের রেশ মেলাতে না মেলাতেই ১৮০৬ সালে মেদিনীপুরের উত্তরাংশে বন্য জাতিগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মেদিনীপুরের এই বিদ্রোহ সাধারণতঃ 'নায়ক হাঙ্গামা' নামে পরিচিত। নায়কগণ প্রায় চুয়াড় শ্রেণীভুক্ত। নায়কগণ কুক্কুট মাংস আহার করলেও হিন্দু ধর্মে আস্থা প্রদান করত এবং গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিমান ছিল। বগড়ীর রাজবংশ কর্তৃক ওদের জায়গির নির্দিষ্ট ছিল। ওরা সেই জায়গির ভোগ করত এবং আবশ্যক হলে রাজ-সরকারে পাইক সৈন্যের কাজ করত। হুমগড় বগড়ী দোল মেলার কাছে বগড়ীর রাজবংশীয় গজপতি সিং এর নাতি ছত্রপতি সিংও নায়েক বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন।

নায়কগণ গড়বেতার নিকটবর্তী নিবিড় বনভূমির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে বগড়ীর কেন্দ্র থেকে সীমানা পর্যন্ত ভীষণ বিদ্রোহনল প্রজ্জ্বলিত করে এবং ইংরেজ অধিকৃত বগড়ী পরগণার পার্শ্ববর্ত্তী যাবতীয় জনপদে আছড়ে পড়ে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত সবজাতির নরনারীর সর্বনাশ সাধন করতে থাকে। নায়কগণের অত্যাচারে হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার পার্শ্ববর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ জনপদ কেঁপে ওঠে। শত শত নরনারীর বেদনারোল আকাশ বিদীর্ণ করে অবশেষে কোম্পানীর কর্মচারীগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করলে তারা আর স্থির থাকতে পারলেন না। কিছুদিনের মধ্যে গভর্ণর জেনারেলের আদেশে ওকেলী সাহেব নামক জনৈক ইংরেজ একদল ব্রিটিশ সৈন্য নিয়ে বগড়ীতে উপস্থিত হলেন। মেদিনীপুরের কালেক্টর হয়ে এসে ওকেলী গভীর গভীর শাল জঙ্গলে 'আড্ডা' চিহ্নিত করেন। গনগনির অরণ্যে বন্যজাতীয় অশিক্ষিত নায়কগণের সঙ্গে, সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যের খণ্ডযুদ্ধ অনেকদিন ধরেই চলছিল। নায়কগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে যুদ্ধ করতোনা। তারা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকত আর মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হয়ে বর্তমানে গেরিলা যুদ্ধের মত তীর ধনুক নিয়ে ইংরেজ সৈন্যের ওপর পতিত হত এবং তাদেরকে ভীষণরূপে আক্রমণ করত। এটাই ছিল মূলতঃ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই। ১৮০৬ থেকে ১৮১৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ

১০ বছর চলে অসম লড়াই। শাল মহুয়ার গভীর বনে একদিকে দামামার সঙ্গে তীর ধনুক অন্যদিকে ছিল বেনিয়া লুঠেরার বারুদের গন্ধ।

ইংরেজ সৈন্য ও সৈন্যধ্যক্ষ নায়কদের খুঁজে বের করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে একদিক রাত্রে কয়েকটি কামান একত্রিত করে ক্রমাগত গোলা বর্ষণে সমস্ত বনভূমি বিদ্ধস্ত করে ফেললেন। নায়কদের সমস্ত আড্ডা ধ্বংস করল। দলপতি অচল সিং গনগনির বন থেকে পালিয়ে জঙ্গলময় বগড়ীর পশ্চিম প্রত্যন্ত প্রদেশে শিবির স্থাপন করলেন; শেষ পর্যন্ত বগড়ীর রাজ্যচ্যুত রাজা ছত্র সিং ইংরেজের হিত সাধন করে বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্বক অচল সিংহকে ধৃত করে ইংরেজ সেনাধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ করেন। এরপর নায়কগণ পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। নায়ক হাঙ্গামা কিরূপ ভীষণভাবে মেদিনীপুর জেলায় বিস্তৃতিলাভ করে তা ১৮২০ সালে হ্যামিল্টন সাহেবের বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি লেখেন বাংলার অন্যান্য প্রদেশে ব্রিটিশ শাসনে শান্তি শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হলেও, ব্রিটিশ রাজধানী কলকাতা থেকে মাত্র ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী স্থানের প্রজারা নিরাপদ নহে। ঐ স্থানের ব্যবস্থা দেখলে মনে হয় তারা কোন রাজার অধীন নয়। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষী দিতে সাহস না করলেই তার প্রাণদণ্ড দিত নায়করা।

এরপর ইংরেজ রাজত্বে রাজকীয় বিশৃঙ্খলার স্মরণীয় ঘটনা সিপাহী বিদ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় মেদিনীপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু, তাঁর লেখা আত্মচরিতে রয়েছে "১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। সিপাহী বিদ্রোহের ভারতব্যাপী তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্যন্ত পেঁছায়। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে বিদ্রোহী সিপাহীরা মিরাট নগর ত্যাগ করে দিল্লী গমন করে। সিপাহীদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল যে ১০ই মে-র অব্যবহিত পরেই একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরে রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টনকে বিগড়াবার চেষ্টা করে। মেদিনীপুরে যে রাজপুত জাতীয় পল্টন ছিল, তাহার নাম Sheka Wattan Battalion। উক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণকে মেদিনীপুর স্কুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে ইংরেজরা ফাঁসি দেন। এক স্থানের বিদ্রোহের সংবাদের পর আর এক স্থানের বিদ্রোহের সংবাদ যেমন মেদিনীপুরে আসতে লাগল তেমনি মেদিনীপুরবাসী অত্যন্ত ভয়াকুল ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগল। সে সময় বাঙালীদের অপেক্ষা সাহেবরাও বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় আন্দোলনের আভাসে। সাহেবরা ক্যাণ্টনমেণ্টে গিয়ে সিপাহীদের থানায় ধান দূর্বা রেখে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিত যে তারা ভবিষ্যতে আর আন্দোলন করবে না। প্রত্যেক

সিপাহী সেরূপ করলেও সাহেবদের বিশ্বাস হত না। মেদিনীপুরের নিকট কংসাবতী গ্রীষ্মকালে শুষ্ক থাকে। বৃষ্টি পড়লেই তখন প্রবহমান হত। সাহেবরা কংসাবতী নদীতে নৌকা প্রস্তুত করে রাখতেন। এই ভেবে রাখতেন যে যখনই বিদ্রোহ হবে তারা নৌকায় করে পলায়ন করবে। তখন আফিসে ও স্কুলে সকলে প্যান্টের ভিতর ধুতি পরে আসত এবং সিপাহী দেখলেই প্যান্ট ও চাপকান খুলে ফেলে দিত এবং ধুতি চাদর পরে ফেলত। সিপাহীদের প্যান্টলুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। মেদিনীপুর শহরে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হাতির পিঠে চড়ে নিশান নিয়ে সিপাহীরা শহর পরিক্রমাকালে সকলেই ভীত হয় এবং মনে করে বিদ্রোহের আর বেশী দেরী নেই। মেদিনীপুর শহরে যে বিশেষ বিদ্রোহ হয়নি তার প্রধান কারণ কর্ণেল সাহেবের রাজপুত উপ-পত্নী। তার কথা সিপাহীরা খুব মান্য করত। বিদ্রোহের প্রস্তাব হলে সে সিপাহীদেরকে তা করতে বারণ করত। বঙ্গের সেই সময়ের ছোট লাটসাহেব বাঙলার সিপাহী বিদ্রোহের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর মধ্যেও মেদিনীপুরের Shek wattan Battalion ও উক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণের কথা আছে। তিনি বিবরণে আরও বলেন, ঐ সেনাদল মেদিনীপুর থেকে ছোটোনাগপুরে স্থানান্তরিত হলে স্থানীয় সাঁওতালদিগের মধ্যে কিছু অসন্তোষ হয়। কমিশনার সাহেব গভর্ণমেন্টের কাছে তা জানালে মেদিনীপুরে আবার দুদল সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন, ফলে সিপাহী বিদ্রোহের বিশেষ কোন গোলযোগে মেদিনীপুরবাসীকে বিপন্ন হতে হয়নি। তবে অন্যান্য স্থানের পরাজিত সিপাহীগণ মেদিনীপুরের উপর দিয়ে যাবার সময় লুণ্ঠন ও অত্যাচার করতে ত্রুটি করেনি। বিদ্রোহের তেওয়ারী ব্রাহ্মণটির নাম ছিল মঙ্গল পাণ্ডে। কেল্লার মাঠটিই হচ্ছে বর্তমানে কলেজ ময়দান। গড়বেতা ও চন্দ্রকোণার বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছিল বহু ইংরজে ও ইংরজেসৈন্যকে।[৭]

বিদেশী ঔপনিবেশিক শোষণ ক্রমশঃ ভারতে তীব্রতর হয়। ভারতের জনমতের উপর এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জন্ম নেয়। কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে দুটি দল ছিল—নরমপন্থী ও চরমপন্থী। চরমপন্থীগণ ব্রিটিশ বিতাড়নে আবেদন-নিবেদনের পথ ছেড়ে সহিংস উপায় গ্রহণ করতেও প্রস্তুত ছিল। মেদিনীপুরের স্বদেশপ্রেমীগণ চরমপন্থী মতবাদ গ্রহণ করাই অধিক শ্রেয় মনে করেন। দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন

করতে ক্ষুদিরাম বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বীরবৃন্দ নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[৮]

বঙ্কিম বিবেকানন্দের দেশমাতৃকার পুজোর আহ্বানে কলকাতা শিক্ষাকেন্দ্রগুলি থেকে জেলার যুবকরা আনত মহাপুরুষদের ভাবধারা, বাণী, সব নবজাগরণের সাড়া নিয়ে মেদিনীপুরে। ১৮৫৮ সালে কবি রঙ্গলাল, ১৮৭০এ হেমচন্দ্র, ১৮৮২-তে বঙ্কিমের লেখনী প্রভাবই মেদিনীপুরবাসীকে দেশমুক্তিতে অনুপ্রাণিত করে। এছাড়া ১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, ১৮৯০এ মার্চে দেশমুক্তি স্রষ্টা অরবিন্দ, ১৮৯০এ এপ্রিলে গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকা অভিযানের সফলতা, ১৮৯৩এ সেপ্টেম্বরে বিবেকানন্দের আমেরিকায় ধর্মবক্তৃতা বিজয়, এই সব মেদিনীপুরে জাতীয়তাবোধ জাগরণের এক উজ্জ্বল দিক এনে দেয়। এইরূপ সব দৃষ্টান্ত দেখে ব্রিটিশরা আতঙ্কিত হয়ে বঙ্গভঙ্গ ষড়যন্ত্র করে। এই অভিসন্ধির কথা জানতে পেরে মেদিনীপুরের অধিবাসী অন্যান্য জেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনদিন প্রতিবাদ স্বরূপ জুতো ও ছাতা ব্যবহার করেনি। ১৯০৫ সালে ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ বিভাজনে 'অরন্ধন দিবস' পালন হয়, স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় জেলা মেদিনীপুরে। মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য জাতির ভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রভাব ফেলেন, দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রীর হিন্দুধর্মান্তরিতদের যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯০৬ সালে মহিষাদলে জনসভায় বিভিন্ন থানার আগত প্রতিনিধিদের স্বদেশী গানে দীক্ষিত করা হয়। ইংরেজ সরকার মেদিনীপুর জেলাকেও দু-ভাগে বিভক্ত করবার চেষ্টা করলে গণ অভ্যুত্থান প্রবলতর হয়। ১৯০৭ সালে ৬ই ডিসেম্বর নারায়ণগড়ে ট্রেন ধ্বংস করে ছোটলাট ফ্রেজারকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়—বোমা কার্যকরই হয়নি। এই ষড়যন্ত্রে অরবিন্দ, বারীন্দ্র, সত্যেন্দ্র, হেমচন্দ্র অনেকেই ছিলেন—এরাই আবার কলকাতায় অত্যাচারী বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের প্রাণনাশের প্রস্তুতি করেন। এরজন্য ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল কুমার চাকীকে নিযুক্ত করা হয়। সমস্তিপুরে প্রফুল্লকে গ্রেপ্তারের সময় সে আত্মহত্যা করে, ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে এবং ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট মজঃফরপুর জেলে ফাঁসি হয়।[৯]

বিশের দশক থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়—(১) গান্ধীজী প্রদর্শিত অহিংস আন্দোলনের পথ। (২) সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। এর প্রতিফলন মেদিনীপুর জেলাতেও দেখা যায়। কাঁথি ও তমলুকের

লবণ আইন অমান্য আন্দোলন, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট আন্দোলন প্রথমোক্ত পথের অনুসারী। ত্রিশের দশকে মেদিনীপুরের তরুণ দল সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের পথ অবলম্বন করেন। এদের অধিকাংশই ছিলেন 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' দলের সদস্য। একের পর এক তিনজন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট বিপ্লবীদের রিভলবারের গুলিতে নিহত হন। ব্রিটিশ সরকারও এই হত্যার চরম প্রতিশোধ নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করল না। শহীদ হলেন নৃপেন দত্ত, অনাথ বন্ধু পাঁজা, প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, যতীজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, মৃগেন দত্ত প্রভৃতি বহু তরুণদের ভাগ্যে জুটলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও আন্দামানে নির্বাসন। এদের গর্বে গরবিনী মেদিনীপুর।[১০]

প্রাসঙ্গিক যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও মেদিনীপুর বিভাগ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বৈপ্লবিক কাজকর্ম শাসকবর্গের কেড়ে নিল রাতের ঘুম। এই সময়েই মেদিনীপুরে সুতাহাটা ইত্যাদি অঞ্চলে অব্রাহ্মণ গোষ্ঠী একীভূত হয়ে পুরোহিতদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে পার্থক্য দূর করার জন্য সামাজিক আন্দোলনে হিন্দুদের ঐক্যসূত্রে আনার চেষ্টা করেন। লণ্ডন থেকে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ১৯১২ সালে কলকাতায় এসে ক্ষোভের বিষয় জেনে বঙ্গভঙ্গ ও মেদিনীপুর বিভাগ পরিকল্পনা বন্ধ করেন। এই সময় ১৯১৪-১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এই যুদ্ধে ব্রিটিশরা ভারতের বহু অর্থ কাজে লাগায় ও তরুণ প্রাণকে সেনা বিভাগের জন্য ধ্বংস করে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের হয়ে আন্দোলনে শ্বেতাঙ্গ সরকারকে নীতি স্বীকার করিয়ে মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় ১৯১৫ সালে কলেজ স্ট্রীটে এবং ১৯১৭ সালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ভাষণ দেন। গান্ধীর বক্তৃতায় মোহিত হন মেদিনীপুরের কুমারচন্দ্র জানা। রাওলাট আইনের বিধিনিষেধ আরোপিত হলে গান্ধীজীর পূর্ণ হরতাল ডাকে (১৯১৯ সাল, ৬ই এপ্রিল) মেদিনীপুরে কুমারচন্দ্র জানা নেতৃত্ব দেন। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রকাশ্য জনসভায় জেনারেল ডায়ার মেশিনগান চালিয়ে হাজার হাজার নরনারী হত্যা করে, এই হত্যার প্রতিবাদে মেদিনীপুরের সর্বত্র জাগরণ ও গণ-সংগঠন শুরু হয়—চরমপন্থীদেরও কার্যবলী আরম্ভ হয়। তমলুক রাজময়দানে ধিক্কার জানান বীরেন্দ্র শাসমল এবং ১৯২০ সালে ব্রিটিশকে সর্বপ্রকার অসহযোগিতা করার কথা ঘোষণা করেন।

এই সময় তুরস্কের সুলতান, মুসলিম জগতের ধর্মগুরুকে ব্রিটিশ গদিচ্যুত করলে, মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করায় ইংরেজের বিরুদ্ধে এই যে বিক্ষুব্ধতা এটাই খিলাফৎ আন্দোলন। গান্ধীজীর ডাকে মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীরাও খিলাফৎ আন্দোলনে সামিল হয়। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসের ডাকে মেদিনীপুর সাড়া দেয় এবং মেদিনীপুর জেলাতে গান্ধী যুগ আরম্ভ হয়, এই থেকে গান্ধীবাদী বিশ্বাসী বীরেন্দ্র শাসমল ব্যারিষ্টারী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯২১ সালে চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্র মোহনের ডাকে মেদিনীপুরেও প্রবল আন্দোলন হয় বীরেন্দ্রর নেতৃত্বে। বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন মেদিনীপুরে ইংরেজ চালু করলে বীরেন্দ্র ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের ডাক দিয়ে কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। এইভাবে মেদিনীপুরবাসীই সর্বপ্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সার্থক রূপ ভারতের সামনে তুলে ধরে। এজন্যই মেদিনীপুর জেলা বাংলায় তথা ভারতে অগ্রগণ্য ও স্বনামধন্য।

বীরেন্দ্রর ত্যাগ, সংগঠনশক্তি ও তাঁর দুঃসাহসের জন্য কাঁথিবাসী দারুয়া ময়দানে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে এবং 'দেশপ্রাণ' আখ্যায় তাঁকে ভূষিত করেন। জেলাবাসী দেশপ্রাণের নেতৃত্বে বিলেতী জিনিস পুড়িয়ে, ম্যাঞ্চেষ্টারের মিলগুলি অচল করতে এবং দেশীয় জিনিস তৈরী করতে কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করেছিল, মেদিনীপুর কলেজ ময়দানে ১৯২১ সালে গান্ধীজী ও সরোজিনী নাইডুসহ সর্বভারতীয় বহুনেতা তুলে ধরেন তাদের বক্তৃতায়। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধুর তৈরী 'স্বরাজ্য' পার্টিতে মেদিনীপুরের দেশপ্রাণ, কুমারচন্দ্র জানা সহ অধিকাংশ নেতাই যোগদান করেন। ১৯২৪-এ দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদে গান্ধী কলকাতায় আসেন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শেষে, গান্ধীর প্রতিষ্ঠিত চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের জন্য অর্থ সংগ্রহ, অস্পৃশ্যতা বর্জন ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য মেদিনীপুর শহরে আসেন। দেবেন্দ্র খাঁন ও তাঁর ভ্রাতা বিজয় খাঁন গান্ধীজীকে স্টেশন থেকে গোপ প্রাসাদে নিয়ে যান। এর পরদিন নাড়াজোল রাজ-কাছারীতে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের বিরোধীতা সত্ত্বেও জনসভায় ভাষণ দেন গান্ধী এবং ১৮ দফা কর্মসূচী তুলে ধরেন। মহাত্মার এরই ভিত্তিতে তমলুকের নিমতৌড়ীতে অজয় মুখার্জী, সতীশ সামন্ত গড়েন 'দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতি' এবং কুমারচন্দ্র জানা সুতাহাটায় গড়েন 'সেবাদল'। স্বদেশী যাত্রা, হরিজন বিদ্যালয়, নৈশস্কুল, অস্পৃশ্যতা চালু হয় গ্রামে গ্রামে। ১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস হিসেবে

পালন করা হয়, থানায় থানায় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা তোলার চেষ্টা হয়।

সমুদ্রের লোনা জল ও লোনা মাটি থেকে লবণ হয়। ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গ মেদিনীপুর জেলার লবণ আইন অমান্য তীব্র হয়, তমলুক ও কাঁথির বৃহদাংশ সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে। কুমারচন্দ্র জানা তমলুকের সর্বত্র স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে নরঘাটে এবং বীরেন্দ্র শাসমলের ১৯২১ সালের ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলনই লবণ আইনকে প্রস্তুত করে, কাঁথির পিছাবনীতে সফলতা নিয়ে আসে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিলিটারীম্যান প্যাডি নরঘাটে আইন অমান্যকারীদের ওপর নির্মমভাবে বেত চালান, অজয়বাবু ও সতীশবাবুকে সশ্রম কারাদণ্ড দেন। ১৯৩০-৩১, ৬ই এপ্রিল লবণ আন্দোলনের ১ বছরে প্যাডি, বহু দেশবাসীকে হত্যা করে ১৯৩২ সালে 'পিউনিটিভ ট্যাক্স' না দেওয়ার জন্য সতীশবাবুর সব বাজেয়াপ্ত করেন। জমিদার ব্যারিষ্টার মুকুটহীন রাজা বীরেন্দ্রের বীরত্ব, তেজস্বীতা, সাহস, কঠোর পরিশ্রম, অনমনীয় দৃঢ় চেতনার জন্যই ১৯৩০-এর অহিংস বিপ্লব ও ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লব সফল হয়েছিল।

মেদিনীপুর জেলার মহিলারাও 'পিউনিটিভ ট্যাক্স', 'চৌকিদারী ট্যাক্স, মাদকদ্রব্য, বিলিতি দ্রব্য বয়কট আন্দোলনে যাত্রা করেন, বালুঘাটা, চকদীপা ও রামনগরের লবণ আইন আন্দোলনে এদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অত্যাচারীতার জন্য ১৯৩০ সালের ৭ই এপ্রিল হয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্যাডি হত্যা, ১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল জেলাশাসক ডগলাস হত্যা এবং জেলাশাসক বার্জ হত্যা হয় ২রা এপ্রিল ১৯৩৩ সালে।[১১]

অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া রাজনৈতিক মুক্তি বৃথা, মেদিনীপুরের কৃষিজীবী মানুষ এই সত্য ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ত্রিশের দশক থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি চলছিল জমিদারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন। ১৯৩৬ সালে 'সারা ভারত কিষাণ সভা' গঠিত হয়েছিল। এই কিষাণ সভার কর্মসূচী কৃষকদের মধ্যে প্রচুর উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। ১৯৩০-৩৮ সালে মুগবেড়িয়ার কয়েক মাইল দক্ষিণে বাঁকাদাড়িতে রজনী সাহু এবং রঘুনাথ ধল-জমিদারদের রায়তের কাছ থেকে খাজনা ছাড়াও 'আবওয়াব' নামে এক ধরণের কর সংগ্রহের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা ক্রমশঃ খেজুরী, ভগবানপুর ও কাঁথির উত্তরাংশে ছড়িয়ে পড়ে। জমিদারের লোকেরা নৃশংসভাবে রজনী সাহুকে হত্যা করে। কিন্তু সন্ত্রাসের দ্বারা কোন গণ-আন্দোলনের কণ্ঠ

স্তব্ধ করা যায় না। তাই দেখা যায় পরবর্তী বৎসরগুলিতে তমলুক, সুতাহাটা ও মহিষাদলের কৃষকেরা জমিদারদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। বাধা বিপত্তি তাদের রুখতে পারেনি। কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে মহিষাদলের কৃষক নেতা বঙ্কিম মাইতির সব জমি নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তীব্র দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করেও বঙ্কিম মাইতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেভাবে নিরলস সংগ্রাম করেছেন তা তাঁর নির্লোভ আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাবের পরিচায়ক।

প্রাদেশিক কিষাণসভা ও তারপর মেদিনীপুর জেলা কিষাণসভা 'তেভাগার' দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ পক্ষে কৃষকদের 'তেভাগার' দাবী ছিল অত্যন্ত ন্যায্য দাবী। ১৯৪৩ সালে খাজনার সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্লাউড সাহেবের সভাপতিত্বে একটি ভূমি রাজস্ব কমিশন বসে। এই কমিশনে বক্তব্য রাখেন যে "আইনত জমিদারদের উচিত বর্গাদারদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের পরিবর্তে এক তৃতীয়াংশ ফসল গ্রহণ করা।" সেই সময় পর্যন্ত কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পার্টি যুক্তভাবে কৃষক আন্দোলনের পরিচালনায় ছিল। নন্দীগ্রাম থানায় তেভাগার দাবীতে কৃষক সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। জোতদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য মনুচক, কেন্দেমারী, কালিচরণপুর এবং নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রামে পুলিশ মোতায়েন করা হল। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করেই নন্দীগ্রামের সংগ্রামী কৃষকগণ নিজ খামারে ধান তুলতে আরম্ভ করলেন। কেন্দেমারীর জানা পরিবার পুলিশের সাহায্যে কৃষকদের এই আন্দোলন দমন করতে ছিল বদ্ধপরিকর। জোতদার ও সরকারের এই চক্রান্ত বিনষ্ট করার জন্য জেলার কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। থানায় থানায় কৃষক শোভাযাত্রা করে বিভিন্ন দিক থেকে কেন্দেমারীর দিকে অগ্রসর হলেন। নারীরাও পিছিয়ে রইলেন না। বিমলা মাজীর নেতৃত্বে তারাও এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেন। চাষীদের ওপর যখন নির্য্যাতন চলছিল তখন সরকারপক্ষ নীরব ছিলেন কিন্তু চাষীরা যখন আন্দোলনে নামলেন আইনের রক্ষকগণ তখন সক্রিয় হলেন। ভূপাল পাণ্ড, অনন্ত মাজী প্রভৃতি নেতৃবর্গকে জেলে পাঠান হল। শেষ পর্যন্ত জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হবে—এই মর্মে লীগ মন্ত্রীসভা ১৯৪৬ সালে বিল আনলে 'তেভাগা' আন্দোলন রদ করে নেওয়া হয়।[১২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। ১৯৪০ সালের অক্টোবরে মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহের ডাক দেন। তাতে মেদিনীপুরে গান্ধী আশ্রম.

(বাসুদেবপুর) থেকে সত্যাগ্রহ করার জন্য ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও কুমারচন্দ্র জানা গ্রেপ্তার হন। ব্রিটিশরা যুদ্ধের প্রয়োজনে আইন করে চাল, খাদ্যশস্য, নৌকা, গরুর গাড়ী আটক করে স্থানীয় বাজার অচল করে দেয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কাঁথি উপকূলে জাপানীদের বোমা ফেলবার আশংকায় কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, জেলাবাসী আরও বিক্ষুব্ধ হয়।[১৩]

যুদ্ধ উদ্যোগে কংগ্রেসের অসহযোগ নীতি ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই সরকার জাতীয়তাবাদীদের কাজকর্ম খর্ব করার প্রস্তুতি শুরু করল। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের প্রতিরোধের নজির আগে থেকেই থাকার দরুণ সরকার মেদিনীপুরকে কড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচন করে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আইনের স্বাভাবিক নিয়ম বাতিল করে দিয়ে মেদিনীপুরে ভারত প্রতিরক্ষা আইন জারি করা হল। সরকারী অনুমতি ছাড়া সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করা হল। কংগ্রেস স্থানীয় কর নিরূপণের সমালোচনা করেছিল। প্রতিবাদী সভা নিষিদ্ধ করা হল। একই সময়ে স্থানীয় কর্মকর্তারা যুদ্ধের জন্য জোর করে চাঁদা আদায়ের চেষ্টা করতে লাগলো। এইসব জোর-জবরিস্তিতে সাধারণ মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

এর আগে থেকেই পূর্ব মেদিনীপুরে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল, তৎসত্ত্বেও সরকার মেদিনীপুরকে উদ্বৃত্ত জেলা হিসেবে গণ্য করল ও সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে খাদ্য মজুত করার জন্য শস্য সংগ্রহের অভিযান শুরু করল। তৎকালীন জিলা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়াজ মহম্মদ খাঁ (আই. সি. এস)-এর কাছে তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটি এই শস্য সংগ্রহ অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবাদে কান দেয়নি। অত্যাচারের প্রতিরোধ বিশেষ করে সংগ্রহ অভিযানের প্রতিরোধে কংগ্রেসের উদ্যোগ হয়ে উঠল সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধান বিষয় এবং ক্রমেই লোকজন বেশী সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দিতে লাগল। যারা আগে কংগ্রেস থেকে সরে গিয়েছিল তারাও এখন আবার কংগ্রেসে ফিরে আসতে শুরু করল। কংগ্রেস আবার হয়ে দাঁড়াল সাধারণ মানুষের প্রধান মুখপাত্র।

তাই ১৯৪২-এর ৬-৮ই আগষ্টের মধ্যে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব পাশ হওয়ার আগেই পূর্ব মেদিনীপুরে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকার পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে

পড়েছিল। ১৯৪২-এর সেই রক্তক্ষরা দিনগুলোতে মেদিনীপুর আবার ইংরেজ শাসনের চিহ্ন মুছে ফেলবার জন্য হল সংগ্রামে অবতীর্ণ।

৮ই আগস্টে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব ও তার পরের দিনই নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের দরুণ আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে একটা খোলাখুলি বিদ্রোহ দেখা দিল। মেদিনীপুরে এর কোন তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়েনি। আগষ্টের গোটা মাসটা জুড়ে মেদিনীপুর ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত—যদিও খাদ্যশস্য অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চলেই আসছিল ও প্রকাশ্য জায়গায় মিটিং ও বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও ব্যাপকতা পাচ্ছিল। বস্তুতপক্ষে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল ২৯শে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ৫০ দিন পরে। আন্দোলনের পরিকল্পনা কী হবে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার দরুণই এই আন্দোলন শুরু করতে দেরী হয়েছিল—জিলা অফিসারেরা তাই মনে করতেন। কোন কোন নেতাও একথা বলতেন। গোটা আগষ্ট মাস জুড়ে যখন অনেক জায়গায় জনগণ বিদ্রোহে উত্তাল হয়ে উঠেছিল তখন মেদিনীপুর কেন অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। এই ঘটনার কোন তেমন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। মনে হয়, মেদিনীপুরে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন দেরীতে আরম্ভ হল কেন তার প্রকৃত কারণ খুঁজতে গেলে জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা দেখতে হবে।[১৪]

যাহোক, ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস—'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু; মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীরা নাশকতামূলক বিদ্রোহ করে আরেকবার বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করল যে তাঁরা স্বাধীনতাকামী এবং স্বাধীনতা তাঁদের জন্মগত অধিকার।[১৫] ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আন্দোলন যখন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছিল, বাংলাদেশের মেদিনীপুরে তখন এক দুর্বার আন্দোলন বিকশিত হয়েছিল। মনে হয় যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের তুলনায় মেদিনীপুরের আন্দোলন অপেক্ষাকৃত সুসংগঠিত ছিল। লক্ষ্য করবার বিষয় যে তমলুক মহকুমা ছিল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, কৃষক সভাও ঐ অঞ্চলে গরীব কৃষকদের মধ্যে ক্রমশঃ সমর্থন সংগ্রহ করছিল।

আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে তমলুক ও কাঁথিতে কংগ্রেস নেতারা গ্রামাঞ্চলে কেন্দ্র স্থাপন করে আন্দোলন সংগঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১১ই আগষ্ট তমলুকে কংগ্রেসের মহিলা কর্মীদের সভা হয়; তাদের মধ্যে ছিলেন ১৯৩০-এর আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মাতঙ্গিনী হাজরা। ১৭ই আগষ্ট কাঁথিতে

প্রকাশ্য জনসভায় কংগ্রেসের কর্মসূচী ব্যাখ্যা করা হয়। তিনদিন পরে কাঁথি ভগবানপুরে পাঁচ হাজার কৃষক, ছাত্র-বন্দীদের মুক্তি দাবী করে। একটি পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ

"The Stirring up of the Peasantry is the most disturbing feature of the movement at the present time .... "।

যুদ্ধের সময় থেকে গ্রামাঞ্চলে বিক্ষোভ জমে উঠেছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। ২৯শে সেপ্টেম্বর আন্দোলন শীর্ষদেশে পৌঁছেছিল। সহস্র সহস্র মানুষের মিছিল ঐদিন কাঁথি ও তমলুকে থানা দখলের জন্য অভিযান করেছিলেন। কাঁথিতে পাঁচ হাজার জনতার মিছিল পটাশপুর থানা পুড়িয়ে ফেলে। সাত হাজার মানুষের জনতা খেজুরী থানা দখল এবং পুলিশদের বন্দী করে। উল্লেখ্য, সেই সময় নন্দীগ্রামের সামসাবাদ নিবাসী ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাক্তার হিসেবে খেজুরীতে ছিলেন অতুলচন্দ্র মহাপাত্র, তিনি বিপ্লবী কাজকর্ম অনুশীলন দলের হয়ে গোপনে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এছাড়া ঐ সময় ভগবানপুর থানা আক্রান্ত হয় কিন্তু পুলিশের গুলি বারুদের মুখে জনতা পশ্চাদপসরণ করে। প্রায় একই সাথে তমলুকে থানা দখলের অভিযান চলে। জনতা সুতাহাটা থানা দখল করে। মহিষাদল থানা আক্রান্ত হয় কিন্তু জনতা পুলিশের গুলি বারুদের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়। পনের হাজার জনতা তমলুকে থানা আক্রমণ করে। জাতীয় পতাকা হাতে অনতন মিছিলেব পুরোভাগে ছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। মাতঙ্গিনী হাজরা সহ দশজন নিহত হয়। ছাত্ররাও এই আন্দোলনে সামিল হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর দশ হাজার মানুষের জনতা নন্দীগ্রামে থানা আক্রমণ করে, পুলিশের গুলিতে সাতজন নিহত হয়। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রবি মিত্র সাঁওতালদের সংগঠিত করবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ৩রা অক্টোবর সাওতাল জনতা দাদের গোলা আক্রমণ করে এবং পুলিশদের বন্দী করে। সতীশ সামন্তের বিবরণী পড়ে মনে হয় অসংখ্য মহিলা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এছাড়া তারা বিপ্লবীদেরও আশ্রয় দিতেন।

ব্রিটিশ সরকার কঠোর দমন নীতির সাহায্যে এই অভূতপূর্ব সংগ্রামের মোকাবিলা করতে উদ্যত হয়। পুলিশ ও সৈন্যদের পাশবিক অত্যাচার সত্ত্বেও আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা যায়নি। তদানীন্তন জেলা শসক এম. এন. খান তাঁর এক রিপোর্টে বিদ্রোহীদের মনোবল সম্পর্কে লিখছেন ঃ "The morale of the agitators and rebels still remains unbroken,

the combined civil and military operations up-to-date have been effective only in a partial manner.... .. "। তাঁর প্রতিবেদন পড়ে বোঝা যায় গ্রামের মানুষ বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিতেন। পুলিশ এলেই সংকেত ধ্বনি দিতেন।

আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে জরিমানা আদায় করা শুরু হয়। বাংলার গভর্ণরের কাছে মেদিনীপুরের জেলা শাসক কি নির্দেশ পেয়েছিলেন তা জানা যায় না। তবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জেলা শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন সরকার এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন। বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করে কৌশলে। বৃহত্তর মুসলিম সমাজ এই চক্রান্তের অংশীদার হতে রাজি হয়নি।

১৬ই অক্টোবর, মহা সপ্তমীর দিন মেদিনীপুরের বুকে নেমে আসে এক অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের ফলে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়। টেলর এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে "ভগবানের আশীর্বাদ" হিসেবে বর্ণনা করেন। কারণ দুর্যোগের ফলে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের তীব্রতা অনেকাংশে কমতে থাকে। গ্রামের মানুষ ও কৃষকরা তখন রিলিফের জন্য হাহাকার করছে। স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষে আন্দোলনকে টেনে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর দেখা দিল "পঞ্চাশের মন্বন্তর।" এই সবের মধ্যে চলতে থাকে ব্রিটিশের অকথ্য অত্যাচার। সরকারী দমন নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে শ্যামাপ্রসাদ অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করলেন এবং একটি নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেন। ২৯শে অক্টোবর কমিউনিস্ট নেতা ভূপাল পণ্ডা একশো কৃষকের একটি মিছিল সংগঠিত করেন ও গ্রেপ্তার বরণ করেন, পরে ১৯৪৬ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। টেলরের চিঠি থেকে জানা যায় যে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিদ্রোহীরা ধান লুঠ করতে থাকে। কংগ্রেসের নেতৃবর্গ রিলিফের জন্য জমিদার ও জোতদারদের কাছ থেকে ধান ও চাল সংগ্রহ করেন। নভেম্বর মাসে কাঁথিতে কংগ্রেস কর্মীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জেলা শাসক মন্তব্য করেন: "There are no indications to show that the congress movement has yet been abandoned. The workers were evidently shaken by the cyclone, but they are on

the move again........" জেলা শাসকের মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে আন্দোলন তখনো অব্যাহত।[১৬]

বিপ্লবের বহ্নিশিখা পূর্ণমাত্রায় জ্বলে উঠল ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২-এ। দেশবাসীর স্বার্থে তমলুকের মাটিতে "মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার" গড়ে উঠল। তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটি এই সরকার গড়লেন। জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক হলেন শ্রী সতীশচন্দ্র সামন্ত, অর্থ সচিব হলেন শ্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সমর ও স্বরাষ্ট্র সচিব হলেন 'বিদ্যুৎ বাহিনী' ও 'ভগিনী সেনার' সংগঠক শ্রী সুশীল কুমার ধাড়া। এছাড়া আরও অন্যান্য বিভাগীয় সচিব ছিলেন। জাতীয় প্রয়োজনে গড়া 'জাতীয় সরকার' ১৯৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৪-এর ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাজ করেছিল।[১৭]

কাঁথিতে 'স্বরাজ পঞ্চায়েতে'-র কেন্দ্রীয় সংগঠন অনেকটাই উপদেষ্টা ও সমন্বয় সাধনের কাজ করত। কাঁথিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পত্তন হয়েছিল থানা পর্যায়ের জাতীয় সরকারের কাজকর্ম শুরু হয়ে যাওয়ার পর। 'স্বরাজ পঞ্চায়েত'-ও একটা সৈন্যবাহিনী চালনা করত—এটিকে মুক্তি বাহিনী বা জাতীয় বাহিনী বলা হত। বলাই দাসমহাপাত্র ছিলেন এর নেতা। মুক্তিবাহিনী কাঁথির বিভিন্ন অংশ জুড়ে কিছু কিছু শাসন সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত কাজকর্ম সংগঠিত করত। থানা পর্যায়ের বিকল্প শাসন ব্যবস্থার অবনতি ঘটার পর স্বরাজ পঞ্চায়েতরা গোটা মহকুমা জুড়ে জাতীয় সরকারের সকল কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। খেজুরীতে সমান্তরাল সরকার 'খেজুরী সাধারণতন্ত্র' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন একজন সভাপতি যার সহায়তায় ছিলেন একদল মন্ত্রী। ভগবানপুরেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। পটাশপুরের বিকল্প প্রশাসন প্রথম দিকে ব্রিটিশ জিলা শাসন ব্যবস্থার ছাঁচেই গড়া হয়েছিল। সমান্তরাল সরকারগুলোকে দারুণ চাপের মধ্যে কাজ করতে হত। নন্দীগ্রামে থানা জাতীয় সরকার ব্যবসায়ীদের চাল রপ্তানি না করতে ও বাজারে ধান চাল বিক্রি না করতে নির্দেশ দিয়েছিল।[১৮]

১৯৪২-৪৩ সালে ধান ভালো হয়নি, প্রয়োজনের তুলনায় ঘাটতি ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মেদিনীপুরের আমন ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এরই সাথে ভয়ঙ্কর বিশালের আকারে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মেদিনীপুর। ডিসেম্বর মাস থেকে কিছু কংগ্রেস কর্মী কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাজ শুরু করে এবং খাদ্য সমস্যা

সমাধানের জন্য কিছু কর্মসূচীও গ্রহণ করেছিল। ৯ই জানুয়ারী ১৯৪৩ কাঁথিতে কংগ্রেস ক্যাম্পে তীর-ধনুক নিয়ে একদল সাঁওতালকে সমবেত হতে দেখা গেল। 'স্বরাজ পঞ্চায়েত' তাদের প্রচার পত্রে জেলার বাইরে ধান বিক্রি ও চালানে সমবেতভাবে বাধাদান করার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করে। কাঁথিতে কিছু বিদ্রোহী, গ্রামের গরীব কৃষকদের নিয়ে ভুখা মিছিলের আয়োজন করার প্রচেষ্টা চালান। তমলুকে কৃষক সভা গঠন করার জন্য হাটের কাছে অবস্থিত গাছে গাছে প্রচার পত্র লাগানো হয়। এই সমস্ত ঘটনাগুলো থেকে বোঝা যায় তখন গ্রামে গ্রামে একটা নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সরকারী রিপোর্টে আগস্ট আন্দোলনের এক নতুন পর্যায়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সময় কিছু আত্মগোপনকারী আন্দোলনকারী ধরা পড়েন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের গ্রামবাসীরা ধরিয়ে দেয়।

মেদিনীপুরে কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন দলের কৃষক ছিল যথা সসম্পন্ন কৃষক, মাঝারি কৃষক এবং গরীব প্রান্তিক চাষী। এছাড়া বিশের দশক থেকে মাহিষ্য সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যে সরকারের 'ডিনায়েল পলিসি' এবং খাদ্য সংগ্রহ নীতি স্বচ্ছল কৃষকদের অসন্তোষের কারণ ছিল। কর্মীদের মধ্যে মুসলমান এবং মহিলাদের সংখ্যা কম ছিল। সম্ভবতঃ মুসলমানরা নিরপেক্ষ ছিল, আর মহিলারা মিছিলে যোগ দিলেও সংসার ভুলে সক্রিয় কর্মী কমই হয়েছিলেন।[২৯]

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সরকারি কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চরম পরীক্ষা হয়েছিল। আন্দোলনের ভিতরে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ততা প্রমাণ করে জনসাধারণ তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত ছিল। তারা অভীষ্টের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। স্বরাজ লাভের জন্যে আরো সংগ্রাম প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই সময় বা তার পরে সেই বৃহত্তর সংগ্রামের আহ্বান কেউ দেননি।[৩০]

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মেদিনীপুরের সন্তানগণ তাঁদের ত্যাগ ও শৌর্যের দ্বারা সারা ভারতে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে মেদিনীপুরের অবদান জনমানসে একটি গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কারণ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মেদিনীপুরের রাজনীতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ছিল অশান্ত। এই আন্দোলন কখনো চরমপন্থী হিংসাশ্রয়ী রূপ ধারণ করে, কখনো-বা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস

অসহযোগ ও আইন অমান্যকারী বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আবার কখনো সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ অনুসারী তেভাগা আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

মেদিনীপুরের মেদিনী রহস্যময়ী. তেজোদ্দীপ্ত বীরত্বের সঙ্গে অহিংস সহনশীলতার নানা বর্ণালীর আলোকচ্ছটায় ভাস্বর। চুয়াড় বিদ্রোহ থেকে শুরু করে অসহযোগের পথ ধরে ভারত ছাড়ো পর্যন্ত অগ্নির মন্ত্রে অথবা সত্যাগ্রহের ব্রতে নন্দিত শৃঙ্খল মুক্তির আরাধনা। স্বাধীনতার হোমানলে মানুষ যেন 'Excess of Love Bewilder them till the death' মেদিনীপুরের যেন নিত্যকালের ব্রত। বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এসবই অতীত. কিন্তু অতীতকে বিস্মৃত হয়ে আত্মপরিচয় উপেক্ষা করে কোন মানব গোষ্ঠী এগোতে পারেনা। সংগ্রামের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য বহন করে মেদিনীপুরের ইতিহাস বর্তমানে এ জেলার সংগ্রামী চরিত্রের ইতিহাস। এই জেলার শান্ত মাটির অভ্যন্তরে যে তেজ. যে অনির্বাণ অগ্নি নিহিত আছে, তা শুধু মুক্তি-সাধনার পথের অন্তরায়কেই বার বার দগ্ধ করেনি. নিজেকেও দগ্ধ করেছে। এখানকার সহস্রমন যে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে. এক কার্যে যে সহস্র জীবন উৎসর্গীত হয়েছে, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম জাগরণে, পেয়েছি অসহযোগ আন্দোলনের ত্যাগে ও সংহতিতে, পেয়েছি আগষ্ট বিপ্লবের ঘূর্ণাবর্তে। এই ভাস্বর ইতিহাস সমৃদ্ধ করুক আজকের নবীন প্রবীন সকল নর-নারীর জীবন দর্শনকে। আবার এই পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের আসন্ন দুর্যোগের দিনে এই মেদিনীপুরকেই যে পুরোভাগে দাঁড়াতে হবে, সেই অনিবার্য সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করে আমি পূর্বাহ্নেই জয়োচ্চারণ করতে এসেছি। মেদিনীপুর তার জন্যে নিশ্চয়ই প্রস্তুত হবে।।

৩

সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণ
ভারত-ছাড় আন্দোলন' ও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব থেকেই কংগ্রেসের ধারণা হয়েছিল যে ইউরোপে এক বৃহত্তর যুদ্ধ শীঘ্রই দেখা দেবে। ফলে আগে থেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করে যে, অনুরূপ কোন অবস্থাতেই ভারত বৃটেনকে সাহায্য করবে না। ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে এই বহু প্রত্যাশিত যুদ্ধ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়। ভারতীয়দের কোনরূপ মতামত না নিয়েই বৃটেন ভারতকে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধরত দেশ হিসেবে ঘোষণা করে।[১] কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সমগ্র অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ১৪ই সেপ্টেম্বর মিলিত হয়। কমিটি জার্মানীর পোলাণ্ড আক্রমণের নিন্দা করলেও অভিমত প্রকাশ করে যে, বৃটেন ভারতের উপর যুদ্ধের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। ভারতের সাথে এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন সম্বন্ধই নেই।

চীন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জওহরলাল নেহেরু এই যুদ্ধে বৃটেনকে তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানান। তিনি ঘোষণা করেনঃ "We do not approach the the problem with a view to taking advantage of Britain's difficulties..... In a conflict between democracy and freedom on the one side and Fascism and agression on the other, our sympathies must inevitebly lie on the side of democracy."[২] নেহেরুর উপরোক্ত ঘোষণা কংগ্রেসের হরিপুরা (১৯৩৮) ও ত্রিপুরী (১৯৩৯) সম্মেলনের কর্মপদ্ধতির বিরোধী ছিল। এই সম্মেলন দুটিতে কংগ্রেস বৃটেনের সাথে অসহযোগিতার কথাই ঘোষণা করেছিল। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বোস বৃটেনের পরাজয়ই কামনা করেছিলেন কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে বৃটেনের পরাজয়ের ফলেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করতে পারে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বৃটেনের প্রতি গান্ধীজীর এই নমনীয় এবং

নেহেরুর পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব মেনে নিতে পারেনি। ভারতের সম্মতি ব্যতিরেকেই ভারতকে এক যুদ্ধরত দেশ হিসেবে ভাইসরয়ের ঘোষণাকে কংগ্রেস নীতি-বহির্ভূত বলে মনে করে। কাজেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৫ই সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেঃ "India can not associate herself with a war said to be for democratic freedom, when that very freedom is denied to her."[৩] ১৯৪০-এর মার্চে অনুষ্ঠিত রামগড় সম্মেলনে কংগ্রেস তার মতবাদ পূর্ণ স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত আরও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে। অন্যদিকে ১৯৪০-এর ২০শে মে নেহেরু কংগ্রেসী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বৃটেনকে পূর্ণ সমর্থনের বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেনঃ "Launching a Civil disobedience campaign at a time when Britain is engaged in life and death struggle would be an act derogatory to India's honour." অনুরূপভাবে গান্ধীজী তাঁর অহিংস নীতিতে অটুট আস্থা প্রকাশ করে ঘোষণা করেনঃ "We do not seek our independence out of Britain's ruin. That is not the way of non-violence."[৪]

বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাপানের যোগদানের ফলে যুদ্ধ পরিস্থিতি ভয়াবহ ও সংকটজনক হয়ে পড়ে। জাপান অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সিঙ্গাপুর ও মালয় দখল করে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করার ফলে জাপানের সামরিক শক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন বৃটেন ভীত হয়ে পড়ে। ফলে ব্রহ্মদেশ ও মণিপুরের মধ্য দিয়ে জাপানের ভারত আক্রমণ নিশ্চিত হয়ে পড়ে। জাপানের প্রতি ভারতীয়দের পূর্ণ সমর্থন না থাকলেও ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে যুদ্ধরত—কাজেই জাপানীদের ভারত আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। অনেকে আবার মনে করেন যে, বৃটেনের হাত থেকে ভারতের মুক্তির জন্য জাপানী আক্রমণের প্রয়োজন আছে। ভয়ে ভীত ইংরেজ ভাইসরয় জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এক সংযুক্ত মোর্চা গঠনের উদ্দেশ্যে ভারতীয়গণকে আবেদন করেন। কিন্তু তাঁর আবেদনে ভারতীয়েরা কোনরূপ সাড়া দেয়নি।[৫]

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের অগ্রগতিতে ভারতের সামরিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চীনের প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাই-সেক বৃটেনের পক্ষে ভারতীয়দের সহায়তা লাভের জন্য হঠাৎ ভারতে আগমণ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এর পরিবর্তে বৃটেন অবশ্যই ভারতকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করবে।[৬] সেই সংগে তিনি ভারতীয়দের সাথে আপোষের জন্য

ব্রিটিশ সরকারকেও অনুরোধ করেন। বৃটেনের বর্তমান রণনীতির পরিবর্তন ছাড়া ভারতীয়দের সমর্থন লাভ অসম্ভব, এ মত ব্যক্ত করে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে এক পত্র লেখেন। ফলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভারতে ব্রিটিশ নীতি পরিবর্তনের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। ইতিমধ্যে জাপানীরা ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুণ অধিকার করে। অন্যোন্যপায় চার্চিল এই ঘটনার তিনদিন পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ষ্ট্রাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে প্রেরণের কথা ঘোষণা করেন।

ক্রিপসের প্রস্তাবে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতাদানের কোন আশ্বাস ছিল না। নিজ প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে ক্রিপস্ রয়টারকে বলেন: "If this right (right of independence) is promised after the war, then I believe that the present difficulties can be settled on that basis."[৭] তাছাড়া ক্রিপস্ প্রস্তাবে মুসলীম লীগের পাকিস্তান দাবীকে পরোক্ষে সমর্থন করা হয়েছিল। ক্রিপসের এই প্রস্তাবকেই গান্ধীজী 'Post-dated cheque' বলে ঘোষণা করেছিলেন।

ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতার ফলে গান্ধীজীর বৃটেনের প্রতি নমনীয় মনোভাবের পরিবর্তন হয় এবং এই সময় থেকেই তিনি 'ভারত-ছাড় আন্দোলনের' পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৪২-এর ১৯শে এপ্রিল 'হরিজন' পত্রিকায় তিনি লেখেন: "বৃটেন এবং ভারতের স্বার্থ ও নিরাপত্তার জন্য অবিলম্বে ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ করা উচিত।" অনুরূপক্ষেত্রে সম্ভবতঃ জাপান ভারত আক্রমণ থেকে বিরত হতে পারে। সম্ভবতঃ এই প্রথম গান্ধীজী বৃটেনের প্রতি তাঁর সহানাভূতি ও সহযোগিতা সমাপ্তির কথা ঘোষণা করেন। জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচীকে গান্ধীজী সমর্থন করলেও জওহরলাল সেদিনও মনে করতেন যে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে বৃটেনকে যুদ্ধে সাহায্য করা ভারতবাসীদের কর্তব্য। ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হওয়ায় নেহেরু পত্রে রুজভেল্টকে নিজ হতাশা ব্যক্ত করে ভারতের স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হন: "We were convinced that the right way to do this would have been to give freedom and independence to our people and ask them to defend it."[৮] ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের বৃটেনকে সমর্থন—এই দুই ব্যাপারেই নেহেরু সোচ্চার ছিলেন। অন্যদিকে গান্ধীজী মনে করেন যে ইংরেজ ভারত ছাড়লে সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণ থেকে ভারত রক্ষা পাবে। কেননা জাপানের শত্রু ইংরেজ—

ভারতীয়েরা নয়। সুভাষ চন্দ্র বসু প্রথম থেকেই এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুভাষ চন্দ্র ভারতীয়দের বৃটেনকে সমর্থন না করার জন্য আহ্বান জানান। উক্ত ভাষণে তিনি বলেন ঃ "India could be no party to such an imperialist war and would not persuit her man-power and sources to be explorted in the interest of British imperialism."[৯]

কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা গান্ধীজীর মতবাদ মেনে নিলেও সেদিনও নেহেরু এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। পরিশেষে, অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির (A. I C. C.) ওয়ার্কিং কমিটির এলাহাবাদ সম্মেলনে এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে আপোষ-প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এতে প্রথমতঃ বলা হয় যে ভারতকে শাসন করার অধিকার বৃটেনের নেই। বৃটেনের নিরাপত্তা ও বিশ্বশান্তির জন্য বৃটেনের অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ প্রস্তাবে বলা হয় যে বাইরের কোন দেশ ভারতকে আক্রমণ করলে ভারত তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই আক্রমণকে প্রতিহত করবে। কিন্তু উপরোক্ত দুই সিদ্ধান্তেই ভারত তার অহিংস নীতির দ্বারা পরিচালিত হবে। কাজেই দেখা যায় যে কংগ্রেসের চাপে পড়ে নেহেরু ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে বৃটেনকে নিঃশর্ত সমর্থনের দাবী প্রত্যাহার করলেন এবং গান্ধীজী জাপানের প্রতি কিছুটা কঠিন মনোভাব গ্রহণ করলেও তাঁর অহিংস নীতিতে অটুট থাকলেন। কংগ্রেসের প্রস্তাবে গান্ধীজীর জাপান সম্বন্ধীয় খসড়া (Draft) বাদ দেওয়া হোল, যাতে গান্ধীজী লিখেছিলেন ঃ "Britain is incapable of defending India. Japan's quarrel is not with India. If India were freed, her first step would probably be to negotiate with Japan."[১০] গান্ধীজীর জাপান সম্বন্ধীয় এই খসড়াটির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নেহেরু বলেন Pandit Nehru "had protested that the whole tenuor of Gandhi's draft was in favour of Japan and revealed a belief that the Axis Powers would win the war."[১১]

A. I. C. C -র উক্ত অধিবেশনের পর থেকে গান্ধীজী পুনরায় কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। মে মাসে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের সমীক্ষা করেন এবং 'ব্রিটিশ ভারত-ছাড়' পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১০ই মে তিনি বৃটেন এবং ভারতের মধ্যে 'সম্পূর্ণ পৃথকত্ব' (Complete Separation)

ঘোষণা করেন। তিনি মনে করেন ব্রিটিশের ভারতে উপস্থিত থাকার ফলেই জাপানী আক্রমণের আশংকা দেখা দিয়েছে। ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করলেই সেই আশংকা দূরীভূত হবে। সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণ সম্বন্ধে গান্ধীজীর এই মতের কোন পরিবর্তন হয়নি। জুন মাসে তিনি আবুল কালাম আজাদকে বলেন "যদি জাপানী সৈন্যবাহিনী ভারত আক্রমণ করে তাহলে তারা ভারতের শত্রু হিসেবে নয়, বৃটেনের শত্রু হিসেবে ভারত আক্রমণ করবে। আর বৃটেন যদি তাড়াতাড়ি ভারত পরিত্যাগ করে, তাহলে জাপান ভারত আক্রমণ থেকে বিরত হবে।" জাপান সম্বন্ধে গান্ধীজীর উক্ত সিদ্ধান্তকে আবুল কালাম আজাদও সেদিন মেনে নিতে পারেননি।[১১]

১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এলাহাবাদ অধিবেশনে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনকে সমর্থন করে প্রস্তাব পাঠ করা হয়। পরবর্তী ৭ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলা হয় "The immediate end of the British rule in India is an urgent necessity, for the sake of India and for the success of the cause of the United Nations." জওহরলাল এই আন্দোলনকে 'প্রকাশ্য বিদ্রোহ' (Open Rebellion) আখ্যা দেন, কিন্তু গান্ধীজীর মতে এই আন্দোলন ছিল 'প্রকাশ্য অহিংস আন্দোলন' (Open Non-violent Revolution)।

৭ই ও ৮ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাব এবং ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের প্রস্তাবকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন এবং বৃটেনের দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার প্রশ্নকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ব্রিটিশ ভারত ত্যাগের পর ভারতের ভবিষ্যত রূপরেখা প্রসঙ্গে স্বাধীন ভারতকে সংযুক্ত রাষ্ট্র সংঘের সহযোগী এবং পৃথিবীর পরাধীন দেশগুলির মুক্তি যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হয়।[১২] গান্ধীজীর নেতৃত্বে এবং গান্ধী নির্দেশিত অহিংস নীতির দ্বারা 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের এই জনযুদ্ধ পরিচালিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়। সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে এমন সময়ও দেখা দিতে পারে যখন এই আন্দোলনকে পরিচালিত করার জন্য কিংবা কংগ্রেসকে নতুনভাবে নির্দেশ দানের জন্য কেউ থাকবে না। সেক্ষেত্রে আন্দোলন-কারীগণ নিজ বিবেক অনুসারে কাজ করে যাবেন। প্রস্তাবে বলা হয় "Every Indian who desires freedom and strives for it, must be his own

guide.''[১৪] কংগ্রেস অধিবেশনে 'ভারত-ছাড়' প্রস্তাবের সাথে সাথে গান্ধীজী "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" (Do or die) নামে যে শ্লোগান দিয়েছিলেন, ব্রিটিশ সরকার তা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ হিসেবেই ধরে নেয়। কাজেই বহির্বিশ্বের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কংগ্রেসের তথাকথিত বিদ্রোহ দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার বদ্ধপরিকর হয়। ৮ই আগষ্ট রাত্রে কংগ্রেস সম্মেলন শেষ হওয়ার পূর্বেই ৯ই আগষ্টের প্রত্যুষে ব্রিটিশ সরকার গান্ধী, আজাদ ও কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের গ্রেপ্তার করে। এক সপ্তাহের মধ্যেই কংগ্রেসের সমস্ত নেতৃস্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠান হয়।

বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের জেলে পাঠান সত্ত্বেও এবং গান্ধীজীর কোন সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকলেও এই আন্দোলনের ঢেউ সমগ্র ভারতকে উত্তাল করে তোলে। বিভিন্ন স্থানের কংগ্রেস কর্মীগণ নিজ নিজ বিবেক অনুসারে এই আন্দোলন পরিচালিত করতে থাকেন, ফলে অহিংস আন্দোলন ক্রমশঃ সহিংসরূপ ধারণ করে। এই আন্দোলনে মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমার নেতাদের কার্য্যকলাপ বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা মহেন্দ্রনাথ মাইতি, সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীল কুমার ধাড়া এবং রজনীকান্ত প্রামাণিক প্রমুখ নেতাদের সাংগঠনিক দক্ষতা ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে তমলুকের সর্ব্বত্র জোরদার আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারকে সর্ব্বশেষ আঘাত হানার জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন। তাঁরা ভারতীয় কংগ্রেসের সাথে সঙ্গতি রেখে শুধু দুর্ব্বার আন্দোলনই গড়ে তোলেননি, তাঁরা মরণপণ আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলেন। তারই ফলে শত শত শহীদ সেদিন স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন।[১৫]

ব্রিটিশের বর্বর ধ্বংসলীলা, অত্যাচার ও নারী ধর্ষণকে অগ্রাহ্য করে ব্রিটিশ শাসনকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তমলুকে স্থাপিত হয়—তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। এই সরকারের কর্ণধারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সতীশ চন্দ্র সামন্ত, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ও সুশীল কুমার ধাড়া। বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে তমলুকে এক জাতীয় সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের সর্ব্বপ্রকারের অত্যাচার ও নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা এবং সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করা। যদি জাপ-বাহিনী ভারতে-

প্রবেশ করে তাহলে সেই বাহিনীকে জাতীয় সরকারের কাছে আত্ম-সমর্পণে বাধ্য করা।

জাপ-বাহিনীর প্রতি উপরোক্ত মনোভাব গ্রহণ করলেও নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন তমলুকবাসীর মনে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। কাজেই এই সময় তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার তিনটি বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে। প্রথমতঃ জাপানী আক্রমণের ক্ষেত্রে এই সরকার তার সর্ব্বশক্তি দিয়ে জাপ-বাহিনীর বিরোধিতা করবে। দ্বিতীয়তঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের মাটিতে পদার্পণ করলে জাতীয় সরকার তাঁকে স্বাগত জানাবে এবং তৃতীয়তঃ নিজ পরাজয়ের আশংকায় যদি ব্রিটিশ সরকার পোড়া মাটির নীতি গ্রহণ করে সব কিছু ধ্বংস করতে চায়, তাহলে এই সরকার তা প্রতিবিধানের চেষ্টা করবে।[১৬]

সমুদ্রপথে জাপানের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনার কথা ভেবে ব্রিটিশ সরকার নদী তীরবর্ত্তী তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় জরুরী অবস্থার ঘোষণা করে। অবিলম্বে ছোট বড় সব নৌকা সরকারকে সমর্পণ করার আদেশ দেওয়া হয়। এর ফলে একদিকে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচণ্ড অসুবিধার সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে বহু মানুষের অন্ন-সংস্থানের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এইসব আদেশ কার্যকরী করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারীগণ জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে। ফলে সমগ্র অঞ্চলে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।[১৭] নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকা চলাচল প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। খাদ্য দ্রব্যের ঘাটতি দেখা দেয় এবং দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পায়। মুনাফাখোর ও মজুতদারেরা অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ পায়।[১৮]

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান এবং তাঁর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ভারতীয়দের মনে আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এমন কি গান্ধীজী পর্য্যন্ত নেতাজীর স্বদেশপ্রেমে মুগ্ধ হন। গান্ধীজীর সুভাষ-প্রীতি সম্বন্ধে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর India Wins Freedom গ্রন্থে লেখেন: "I saw that Subhas Bose's escape to Germany had made a great impression on Gandhiji. He had not formerly approved many of his remarks convinced me that he admitted the carrage and resourcefulness of Subhas. His admiration of Subhas Bose unconsciously coloured his view."[১৯] তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারও নেতাজীর আগমনের আশায় দিন গুণতো। অদের নেতা শ্রী সুশীল

কুমার ধাড়ার ভাষায় : "আমাদের আশা যে, নেতাজী তো নিশ্চয়ই ডুবো জাহাজে আসবেন ও'র বাহিনী নিয়ে। ......আমার বাহিনীর ভাই-বোনেদের কতবার বুঝিয়েছি যে, আমরা শ্বেত পতাকা উড়িয়ে ও'র সঙ্গে সেই সময় যোগাযোগ করব এবং আমাদের পরিপূর্ণ আনুগত্য জানিয়ে এই মুক্তাঞ্চলে নামতে বলব।...... 'বিদ্যুৎ বাহিনী' আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে এবং 'ভগিনী সেনা' রাণী ঝাঁসী বাহিনীর মধ্যে তাদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে দিয়ে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী মহাসাগরে মিলিত হওয়ার অপার আনন্দ পাবে। "......তাঁর চলার পথে মেদিনীপুর জেলা থেকে আরো লক্ষাধিক সৈন্য সংগৃহীত হবে- শৃঙ্খলিতা ভারত-জননীর চির মুক্তির জন্য।"[২০] কিন্তু তাদের আশা পূর্ণ হয়নি। ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়ে নেতাজীর সৈন্যবাহিনী উপস্থিত হয় কোহিমা রণাঙ্গনে। ফলে নেতাজীর বাহিনীর সাথে তমলুকের জাতীয় সরকারের দূরত্ব থেকেই যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে জাপানী আক্রমণ প্রসঙ্গেও হয়তো তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মনোভাব কিছুটা নরম হয়েছিল। জাপানী প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো ২২শে মার্চ ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী ডায়েটে ঘোষণা করেন যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী (I.N.A) ভারত সীমান্তে প্রবেশ করে বিজিত স্থানগুলির উপর তাদেরই অধিকার স্থাপন করবে। "It is natural that all areas over which the Indian National Army marches within India, must be placed completely under the Administration of the Provisional Government."[২১]

ইতিমধ্যে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট গান্ধীজী কারামুক্ত হন। ৮ই আগষ্ট সংবাদপত্র মারফৎ তিনি নির্দেশ দেন যে যেখানে যত গোপন সংস্থা আছে কিংবা গোপন আন্দোলন চলছে তা অবিলম্বে বন্ধ করা হোক্। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার তার বর্বর অত্যাচার, উৎপীড়ন ও কূটকৌশল প্রয়োগ করেও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারকে উৎখাত করতে পারেনি। এই জাতীয় সরকার গণসমর্থন লাভ করেছিল বলেই প্রায় ২১ মাস স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। কাজেই তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গান্ধীজীর আবেদনে সাড়া দিয়ে স্বেচ্ছায় সরকারের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী মহিষাদলে এসে অহিংস আন্দোলনের নতুন প্রয়োগে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনকে সফল করার জন্য তমলুকবাসী সেদিন অহিংস নীতি পরিত্যাগ করে সহিংস নীতির দিকে পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু সেদিন

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিরোধের দ্বারা জাতীয় সরকারকে টিঁকিয়ে রাখা হয়ত সম্ভব ছিল না। সেই সময় গান্ধীজীর নির্দেশকে উপেক্ষা করাও তমলুকবাসীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। শেষ জীবনে সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণের প্রতি গান্ধীজীর নরম মনোভাব এবং সুভাষচন্দ্রের শৌর্যে মুগ্ধ গান্ধী হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রয়োজনে যুদ্ধ দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করা অনুচিত নয়। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে সশস্ত্র সংগ্রামে ভারতবাসী কোনদিনও ব্রিটিশকে পরাভূত করতে পারবে না। তাই তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারকে ভঙ্গ করার নির্দেশ তিনি দান করেছিলেন।

৪
মেদিনীপুর, সাতারা ও বালিয়ার জাতীয় সরকার : একটি তুলনামূলক আলোচনা

হরিপদ মাইতি

১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্ববৃহৎ অহিংস-সহিংস গণ সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাতের লক্ষ্যে। আন্দোলনের সূচনায় মহাত্মা গান্ধী, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সর্দার প্যাটেল, জওহরলাল এবং আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ প্রথম সারির নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার সত্ত্বেও আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ এবং নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টায়। কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগ এবং র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বিরোধিতা সত্ত্বেও কৃষক, শ্রমিক এবং মুসলমানদের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। সর্বপ্রকার দমন-পীড়ন, গুলিবর্ষণ, লুন্ঠন গৃহে অগ্নি সংযোগ এবং ধর্ষণের মত বর্বরোচিত পন্থা অনুসরণ সত্ত্বেও হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্যের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মর্মমূলে চূড়ান্ত আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিল ভারতবাসী। ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো কর্তৃক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নিকট প্রেরিত টেলিগ্রাফ প্রকৃষ্ট প্রমাণ :[১]

"By far the most serious Rebellion since that of 1857 the gravity and extent of which we have so far concealled from the world for reason of military security".

কিন্তু এ কথা ঐতিহাসিক সত্য '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কোন আকস্মিক বিচ্ছিন্ন আন্দোলন নয়। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-'২২), লবণ সত্যাগ্রহ (১৯৩০-'৩১), দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩২-'৩৪) এবং সশস্ত্র সংগ্রামের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক চূড়ান্ত পরিণতি অহিংস-সহিংস পথে পরিচালিত উক্ত আগষ্ট আন্দোলন। সাম্রাজ্যবাদী শাসক আন্দোলন দমনে যেমন চূড়ান্ত বর্বরতা প্রদর্শন করেছেন তেমনি ভারতবাসী সংগ্রাম

পরিচালনায় দক্ষতা, বিচক্ষণতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও স্বাধীনতার জন্য চরম আগ্রহ তাদের অনন্য নজির স্থাপন করেছেন যা বিশ্ববাসীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উক্ত গণসংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় জাতীয় সরকার স্থাপন এবং পরিচালন। ভারতবাসী স্বরাজ অর্জন এবং স্বাধিকার ও স্বশাসনের জন্য চূড়ান্ত দায় দায়িত্ব গ্রহণ এবং কর্মদক্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম তার অত্যুজ্জ্বল অগ্নি পরীক্ষা এই সমান্তরাল জাতীয় সরকার।

'৪২-এর পর্বে জাতীয় সরকার স্থাপিত হয়েছিল গুজরাটের আমেদাবাদ, বিহারের ভাগলপুর, সুলতানপুর, মুঙ্গের, উত্তর প্রদেশের বালিয়া এবং অবিভক্ত বাংলাদেশের বঙ্গ প্রদেশের মেদিনীপুরে। উক্ত জাতীয় সরকারগুলির মধ্যে তিনটি জাতীয় সরকার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য—নেতৃত্ব, স্থায়িত্ব, জনগণের আনুগত্য, প্রশাসনিক দক্ষতা, কার্য্যাবলির ব্যাপকতা, ঝুঁকি ও দায়িত্ব গ্রহণে তৎপরতা এবং ব্রিটিশের সর্বপ্রকার পরিচালনার ক্ষমতা প্রভৃতির প্রেক্ষাপটে। সেগুলি হল মেদিনীপুর, সাতারা এবং বালিয়ার জাতীয় সরকার। বর্তমান নিবন্ধে উক্ত তিনটি সমান্তরাল জাতীয় সরকারের তুলনামূলক আলোচনা করাই এ রচনার উদ্দেশ্য। আধুনিক ইতিহাস চর্চার প্রেক্ষাপটে আমরা প্রথমে জাতীয় সরকারের ঐতিহাসিক পটভূমির উল্লেখ করে জাতীয় সরকারগুলির কার্যাবলি এবং সর্বশেষে তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

ঐতিহাসিক পটভূমি

জাতীয় সরকার স্থাপন এবং পরিচালনের মূলে ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ এবং সময়ের প্রয়োজন। পরিবেশ-পরিস্থিতি বাধ্য করেছিল নেতৃবৃন্দকে এরূপ চূড়ান্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণে এবং জনগণকে সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে সমান্তরাল সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে একটি 'যুদ্ধরত দেশ' রূপে ঘোষণা করেন। ফলে ভারতবাসী হয়েছিল অতিরিক্ত কর ভারে জর্জরিত এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে নিষ্পেষিত। নিম্নে উল্লিখিত সারণী প্রকৃষ্ট প্রমাণ[২]

১৯১৪	১৯৩৯	১৯৪৩
১০০	১০৮	৩০৭

খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি আরও বেশী ৩৯৬ শতাংশ ১৯৪৩ সালে। ফলে

জনগণ ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদে মরীয়া এবং জাতীয় সরকার ও নেতৃবৃন্দের প্রতি বিশেষ অনুগত।

বঞ্চনা নীতি (Denial Policy)-র কঠোর প্রয়োগে জনগণ অত্যাচারিত, যোগাযোগ বিপর্যস্ত এবং দ্রব্যমূল্য ঊর্দ্ধমুখী। জনগণের প্রতিরোধে নির্মম অত্যাচার, এমনকি গুলিবর্ষণ-মৃত্যুও। ১৯৪২-এর ৮ই সেপ্টেম্বর মহিষাদলের দানিপুরে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় তিনজন স্বেচ্ছাসেবকের।[৩] জাপান কর্তৃক জার্মানীর পক্ষে যোগদান এবং প্রাচ্যদেশে একের পর এক রাজ্য গ্রাস এবং ভারতবর্ষ আক্রমণের আশংকা ব্রিটিশ সরকারকে বঞ্চনা নীতি গ্রহণে তৎপর করে বিশেষভাবে। এই বঞ্চনা নীতি উত্তর-পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে সমুদ্র ও নদী বিধৌত এলাকায় বিশেষভাবে অনুসৃত হয়। মেদিনীপুর জেলার পূর্বদিকে নদী এবং বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ ৩১৯ স্কোয়্যার মাইল এলাকার পঞ্চাশ হাজার পরিবারের প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ মৎস্যচাষ-ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলেন। তাদের বৃত্তিতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে নৌকা অপসারণের ফলে। ফলে আন্দোলনে নিম্নবর্গীয় মানুষদের ভূমিকা স্বতঃস্ফূর্ত ও জঙ্গী।

সরকারী অফিসগুলিতে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন এবং থানা-পুলিশ ও অন্যান্য কর্মচারীদের বন্দী করার পর স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়। সেজন্য যে সকল এলাকার গণ-আন্দোলন তীব্র ছিল সেই সকল স্থানে জাতীয় সরকার গঠন ও পরিচালন জনগণের ধন-মান-জীবন রক্ষায় অপরিহার্য হয়ে উঠে।

উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়া মেদিনীপুরে জাতীয় সরকার গঠনের পশ্চাতে অতিরিক্ত কারণ ছিল। ১৯৪২-এর ১৬ই অক্টোবর ঘূর্ণিঝড়ের পর সরকারী ত্রাণ ও পুনর্গঠনে উদাসীন ছিলেন। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ডাইরীতে উল্লেখ করেছেন:[৪] "The District Magistrate, I found later, had sent a confidential report to the secretariate stating, that the best way to teach the people of Midnapur an unforgettable lesson was to postpone relief by a few weeks."

এছাড়া জাপান যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তাহলে সাধ্যমত প্রতিরোধ করা।

অন্যদিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ যদি ভারতবর্ষে আগমন করেন তাহলে স্বাগত জানান।

সুতরাং আগষ্ট আন্দোলন পর্বে ভারতবর্ষের নানা স্থানে জাতীয় সরকার গঠনের পশ্চাতে ছিল আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট।

জাতীয় সরকার গঠন ও পরিচালন এই তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজনে এখন তিনটি জাতীয় সরকারের কার্যাবলী পৃথকভাবে উল্লেখ আবশ্যক।

বালিয়া জাতীয় সরকার

উত্তরপ্রদেশে বালিয়া জেলায় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪২-এর ২০শে আগষ্ট চিত্ত পাণ্ডের নেতৃত্বে। ১৯শে আগষ্ট বালিয়ার জনগণ কারাগার ভেঙ্গে বন্দী বিপ্লবীদের মুক্ত করতে অগ্রণী হয়েছিল এবং কোষাগার ও কালেক্টরেট ভবন আক্রমণ করতে ছিল বদ্ধপরিকর। ইতিপূর্বে জনতা ধ্বংসাত্মক কার্যাবলির দ্বারা বালিয়ার সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই অবস্থায় জেলা শাসক বিপ্লবী নেতা চিত্ত পাণ্ডে এবং অন্যান্য বন্দী বিপ্লবীদের মুক্তি দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন। মুক্তির পর বালিয়া টাউন হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিত্ত পাণ্ডেকে বালিয়ার 'স্বরাজ জিলাধীশ' (Independent District Magistrate) রূপে ঘোষণা করেছিল।[৫] স্বাধীন সরকারের প্রশাসন পরিচালনার জন্য আরও কয়েকজন সহযোগীর নাম ঘোষণা করা হয়। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় যত্নবান হয় উক্ত জাতীয় সরকার।

কিন্তু বালিয়া জাতীয় সরকারের কার্যকাল ছিল সীমিত। ২২শে আগষ্ট রাত্রিতে মার্শ স্মিথের নেতৃত্বে একদল সৈন্য বালিয়ায় আগমন করে পরের দিন ব্রিটিশ রাজের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল তীব্র দমন পীড়নের দ্বারা।[৬] সুতরাং বালিয়া জাতীয় সরকারের অস্তিত্ব ছিল মাত্র তিন দিন (২০শে আগষ্ট '৪২ --২২শে আগষ্ট '৪২)। স্বল্প হলেও উক্ত জাতীয় সরকার গঠন এবং পরিচালন বালিয়ার জনগণের শক্তি, সাহস, আত্মবিশ্বাস, স্বরাজ-এর আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি স্বশাসনের অভিব্যক্তি এবং ব্রিটিশরাজকে উৎখাতের সুস্পষ্ট মনোবৃত্তি। ১৯৪২-এর আন্দোলনে বালিয়া তথা উত্তরপ্রদেশের বিপ্লবী জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা করলেন।

সাতারা জাতীয় সরকার (১৯৪৩ জুন—১৯৪৬ ফেব্রুয়ারী)

মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় সমান্তরাল জাতীয় সরকার তথা প্রতি সরকার স্থাপিত হয় ১৯৪৩ সালের ৩রা জুন নানা পাতিলের নেতৃত্বে। সহযোগীবৃন্দ হলেন ঃ কিষাণবীর, আপ্পা মাষ্টার, উত্তমরাও পাতিল, জি. ডি. ল্যাড প্রমুখ।[৭]

উক্ত সরকারের প্রশাসনের প্রধান ভিত্তি ছিল বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একশত গুপ্ত জঙ্গী কর্মী। স্বেচ্ছাসেবকগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা, যোগসূত্র ও সমন্বয় সাধন সহ সমাজতন্ত্রী নেতা অচ্যুত পট্টবর্ধন প্রমুখের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল। গ্রামাঞ্চলে তাদের উদ্যোগে স্থাপিত হয় 'রাষ্ট্রীয় সেবা দল' এবং 'তুফান দল' নামক স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন।

প্রতি সরকারের কার্যাবলী

ব্রিটিশ প্রশাসনের মোকাবিলা ছাড়াও স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা সুরক্ষা এবং জনগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিধান ছিল জাতীয় সরকারের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়—'ন্যায়দান মণ্ডল' (People's Coust). প্রকৃতপক্ষে উক্ত ন্যায়দান মণ্ডল ছিল মূল প্রশাসনিক স্তম্ভ যা সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠায় ছিল অপরিহার্য। দেওয়ানী এবং ফৌজদারী উভয়বিধ বিচারের ভারপ্রাপ্ত ছিল ন্যায়দান মণ্ডল।[৮]

সরকারের সামাজিক কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাদক নিবারণ, মদ্যপদের শাস্তিদান, গুণ্ডা, চোর, ডাকাত প্রভৃতি সমাজ বিরোধীদের দমন, নারীদের সম্ভ্রম সুরক্ষা, দুশ্চরিত্রদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান, পণ প্রথা নিবারণ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ প্রভৃতি।[৯] সুতরাং নারীদের সমস্যা সমাধান তথা সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা নিঃসন্দেহে জাতীয় সরকারের [illegible] উল্লেখযোগ্য দিক।

অর্থনৈতিক অপরাধ দমন এবং উন্নয়ন ছিল এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। কৃষি ছিল জনগণের আয়ের প্রধান উৎস। সুতরাং জমি সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক অপরাধ ছিল অন্যতম। কর্জ দাতাগণ 'সত্তকারী' ঋণ গ্রহণকারীদের উপর নানাভাবে অবৈধ শোষণ করত। জমি থেকে উৎখাত ছিল অন্যতম অর্থনৈতিক অপরাধ। ফলে 'সত্তকারী'দের দমনে তৎপর হয় প্রতি সরকার। বিধবা এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের জমি বন্ধক রাখত উক্ত সত্তকারী সম্প্রদায়

নির্দিষ্ট সময়ে প্রদত্ত অর্থ-খনন শোধের শর্তে। সময় সীমা অতিক্রান্ত হলে জমি আর ফেরৎযোগ্য ছিল না। 'প্রতি সরকার' ছিল কৃষক এবং দরিদ্র জনগণের পক্ষে। ফলে সন্ত্রাসকারীদের বে-আইনী কার্যকলাপ দমন করেছিল কঠোর হস্তে।[১০] সামাজিক কল্যাণকর কর্মসূচী গ্রহণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অপরাধ দমন এবং সাধারণ মানুষের হিতসাধনী আপামর জনগণকে বিশেষভাবে অনুগত করেছিল জাতীয় সরকারের প্রতি।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রশাসনের মোকাবিলার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ হিংসার বদলে হিংসা (Force to Force) নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। অত্যাচারী পুলিশ এবং ব্রিটিশের সংবাদ দাতাদের প্রহার, দৈহিক শাস্তি এবং অর্থ দণ্ড দেওয়া হত। বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন জি. ডি ল্যাড এবং নাগনাথ নাইকাদি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ৮৭ জন পুলিশের সংবাদদাতাকে শাস্তি দিয়েছিল জাতীয় সরকারের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ। তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় প্রহারে।[১১] দৈহিক শাস্তি ছাড়া সামাজিক বয়কট এবং অর্থ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া কয়েকজন কনস্টেবলকে শাস্তি দিয়েছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

অর্থ সংগ্রহ প্রশাসন পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। আয়ের উৎস ছিল স্বেচ্ছাদান। এছাড়া রাজনৈতিক ডাকাতি, অন্যান্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ, ভীতি প্রদর্শন, জরিমানা এবং বিচার বিভাগের আয় প্রভৃতি। উক্ত সরকারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল। আয় এবং ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষক ছিলেন জি. ডি. দেশপাণ্ডে প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনৈতিক এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব।

সরকারের সীমানা সম্প্রসারণ

১৯৪৪-এর মার্চ মাসে নেতৃবৃন্দ বোম্বাইতে অচ্যুতরাও পট্টবর্ধন, নেভালকার এবং তণ্ডুলকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বিভিন্ন দলের মধ্যে সমন্বয় এবং সরকারের কর্মক্ষেত্র সাতারা ছাড়াও খান্দেশ, সোলাপুর এবং পুনা জেলার মধ্যে সম্প্রসারিত করা হয়। এগারজন নেতার সমন্বয়ে একটি 'কার্যকরী মণ্ডল' (Dictator Board) গঠিত হল। নেতৃবৃন্দ হলেন : ধন্বন্তরি, কিষাণবীর, বাবুজী পাটানকার, অন্তুকাকা বরদে, মহাবিশিখর, শেথকাকা, মাধব যাদব, এস. পি. যাদব, নাগনাথ নাইকভাদি, নাথাজি ল্যাড এবং কিষাণমাষ্টার।[১২] সমগ্র এলাকাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে দায়িত্ব দেওয়া হল তিনজন সুপারভাইজারকে। তারা হলেন : জি. ডি. ল্যাড (পূর্ব), পাণ্ডু মাষ্টার (পশ্চিম) এবং পাণ্ডুরাং বরাটে (মধ্য-উত্তর)।

সরকারের বিলোপ

১৯৪৫-এর মধ্যবর্তী সময় থেকে সরকারের কার্য্যাবলি হ্রাস পেতে শুরু করে। তার মূলে নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রধানতঃ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং ১৯৪৬-এর নির্বাচন। প্রার্থী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরোধ। নেতৃবৃন্দের জাতীয় সরকারের মাধ্যমে জনসেবার পরিবর্তে দৃষ্টি ক্রমশঃ নিবদ্ধ হল সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বৃহত্তর রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা অর্জন। তৎসহ ব্রিটিশরাজের তীব্র দমন-পীড়নও প্রতি সরকারের পতনের একটি কারণ। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত সরকার কার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল। উপরিউক্ত কারণে সামন্ততন্ত্র, জাতপাত এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সাতারা সমান্তরাল জাতীয় সরকারের বিলোপ ঘটে।

মেদিনীপুরে জাতীয় সরকার

মেদিনীপুর জেলায় চারটি জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছিল। প্রথম জাতীয় সরকার স্থাপিত হয় খেজুরী থানায় পূর্ণেন্দুশেখর ভৌমিকের নেতৃত্বে ২৮শে সেপ্টেম্বর '৪২ ঐতিহাসিক থানা অভিযানের পরবর্তী পর্য্যায়ে। ১৯৪২ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই সরকারের স্থায়িত্ব ছিল।[১৩]

জেলায় দ্বিতীয় জাতীয় সরকার স্থাপিত হয়েছিল পটাশপুর থানায় ২৯শে সেপ্টেম্বর '৪২ সকল থানা অভিযানের পর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে কালিপদ রায় মহাপাত্রের নেতৃত্বে। ১৯৪২-এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত সরকার ক্ষমতায় আসীন ছিল। স্থানীয় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ত্রাণ ও পুনর্গঠনের জন্য উক্ত দুইটি থানা জাতীয় সরকারের গঠন ছিল অপরিহার্য।[১৪]

তৃতীয় জাতীয় সরকার-মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার স্থাপিত হয় ১৯৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর সর্বাধিনায়ক সতীশ চন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে।

কাঁথি মহকুমায় চতুর্থ জাতীয় সরকার স্থাপিত হয়েছিল 'স্বরাজ পঞ্চায়েত' নামে কাঙ্গালচন্দ্র গিরির নেতৃত্বে ১৯৪৩ সালের ১৫ই এপ্রিল (নববর্ষ, ১৩৫০)।[১৫] দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা এবং শান্তি শৃঙ্খলা সুরক্ষা ছিল লক্ষ্য। সরকারের অধীনে বলাইলাল দাসমহাপাত্রের নেতৃত্বে 'মুক্তিবাহিনী' নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কার্য্যকলাপ ছিল প্রশংসনীয়। উড়িষ্যা থেকে ধান, চাল আমদানি এবং স্থানীয় জমিদারদের নিকট থেকে ন্যায্য মূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে জনগণের মধ্যে বণ্টন

এবং সেবাকারী সংস্থাগুলির ত্রাণকার্যে সহযোগিতা ছিল স্বরাজ পঞ্চায়েতের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কোন রক্তপাত না ঘটিয়ে অহিংস পথে সমস্যার সমাধান ছিল উক্ত সরকারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার

আগস্ট আন্দোলন পর্বে ভারতবর্ষের জাতীয় সরকারগুলির অন্যতম হল মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। উক্ত সরকার গঠনের ঐতিহাসিক পটভূমি ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর সর্বাধিনায়ক সতীশ চন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে এটি স্থাপিত হয়। মন্ত্রীদের অধীনে বিভিন্ন বিভাগ ছিল নিম্নরূপ।[২০]

সতীশ চন্দ্র সামন্ত	সর্বাধিনায়ক	পররাষ্ট্র বিভাগ
অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়		অর্থ বিভাগ
সুশীল কুমার ধাড়া		স্বরাষ্ট্র ও সমর বিভাগ
ডাঃ প্রফুল্ল কুমার বসু		বিচার বিভাগ
সতীশ চন্দ্র সাহু		খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ
প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক		প্রচার বিভাগ

জাতীয় সরকারের প্রশাসনিক বিন্যাস এবং উপরিউক্ত বিভাগগুলির মাধ্যমে কর্মসূচী রূপায়ণ ও সমন্বয় নিঃসন্দেহে নেতৃবৃন্দের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। অসহযোগ আন্দোলন পর্ব থেকে ১৮ দফা কর্মসূচী এবং স্বায়ত্ত শাসনে অংশগ্রহণের সফল পরিণতি উক্ত জাতীয় সরকার। তমলুক মহকুমার ছয়টি থানার মধ্যে যথাক্রমে মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম এবং তমলুক থানায় জাতীয় সরকারের কর্মের পরিধি বিস্তৃত ছিল।

জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন

অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা সংরক্ষণায় স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধে পররাষ্ট্র দপ্তরের ভূমিকা সার্থক। জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক ১৯৪৩-এর ২৬শে জানুয়ারী থানা জাতীয় সরকার গঠন ছাড়াও অপর এক ঘোষণায় 'বিদ্যুৎবাহিনী' এবং 'ভগিনী সেনাবাহিনী' একত্রিত করে 'জাতীয় সৈন্যবাহিনী' (National Militia) রূপে ঘোষণা করেন। উক্ত বাহিনীর অধীনে ছিল (১) যুদ্ধ বিভাগ, (২) গোয়েন্দা বিভাগ, (৩) গেরিলা বিভাগ, (৪) আইন-শৃঙ্খলা বিভাগ, (৫) শুশ্রূষা বিভাগ।[২১] উক্ত দুই বাহিনীর

পরিকল্পক, সংগঠক এবং পরিচালক সুশীল কুমার ধাড়াকে নিযুক্ত করা হয় জাতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতিরূপে (commander-in-chief)। সেনাপ্রধান ছাড়াও তিনি ছিলেন স্বরাষ্ট্র এবং সমর বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

জাতীয় সরকারের কার্য্যাবলি

আধুনিক প্রশাসন পরিচালনার জন্য যে সকল বিভাগ সংস্থাপন তা প্রতিষ্ঠা করে জনমুখী কর্মসূচী রূপায়ণে সচেষ্ট হয়েছিল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার।

স্বরাষ্ট্র বিভাগ: বিদ্যুৎ বাহিনী এবং গুপ্তচর বিভাগের সাহায্যে মহকুমার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষায় সচেষ্ট ছিল স্বরাষ্ট্র বিভাগ। চোর, ডাকাত, দুর্নীতি ছিনতাইবাজ, চোরাকারবারী, পুলিশের খবরদাতা, দেশদ্রোহী প্রভৃতিদের গ্রেপ্তার এবং কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত ছিল প্রশাসন। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল [illegible] চল্লিশজনকে এবং গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড [illegible]জনকে।[১৮]

অর্থ বিভাগ: প্রশাসন পরিচালনায় অর্থ অপরিহার্য। জাতীয় সরকারের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মচারীগণ অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করলেও অর্থের প্রয়োজন ছিল ত্রাণ ও পুনর্গঠন এবং উন্নয়নে। স্বেচ্ছায় সাহায্য, চাঁদা, আয়, জরিমানা, চোরাকারবারী এবং ধনীদের নিকট থেকে বাধ্যতামূলক আদায়ীকৃত অর্থ ছিল আয়ের অন্যতম উৎস।

বিচার বিভাগ: ফৌজদারি এবং দেওয়ানি উভয়বিধ মামলার নিষ্পত্তি করত বিচার বিভাগ। প্রত্যেক থানায় ছিল বিচারালয়। এছাড়া ছিল মহকুমা বিচারালয় যেখানে প্রয়োজনে আপীল করা হত। তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইবুন্যাল বিচারের নিষ্পত্তি করত। চারটি থানায় রুজু করা মামলার মোট সংখ্যা ২৯০৭। এগুলির মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছিল ১৬৮১টি।[১৯]

ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য রেজিস্ট্রেশন-এর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এই কাজ এত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল যে পরবর্তীকালে সরকার উক্ত রেজিস্ট্রেশনকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছিল।[২০]

সমর বিভাগ: ইংরেজ সরকারের অন্যায় কাজকর্মের প্রতিরোধ করাই ছিল সমর বিভাগের প্রধান কার্য্য। ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার ফলে জনগণের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ সরকার ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যে গাফিলতি করেনি,

সমাজবিরোধীদের দুর্নীতিমূলক কার্য্যে উস্কানি দিয়ে পরিস্থিতি ঘোরালো করেছিল। সমর বিভাগ কঠোর হস্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ছিল সচেষ্ট।

স্বাস্থ্য, ত্রাণ ও পুনর্গঠন : জাতীয় সরকার স্বাস্থ্য এবং ত্রাণ-পুনর্গঠনের জন্য উক্ত বিভাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রতিরোধে ঔষধপত্র বিতরণ, চিকিৎসার বন্দোবস্ত, পোষাক-পরিচ্ছদ, অর্থ, খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করেছিল দুঃস্থদের মধ্যে। ত্রাণকার্য পরিচালিত হয়েছিল 'মহেন্দ্র রিলিফ কমিটি' নামক নবগঠিত সংস্থার মাধ্যমে। মোট ঊনাশি হাজার টাকা মূল্যের ত্রাণ সামগ্রী বণ্টন করা হয়।[২১]

শিক্ষা বিভাগ : সরকার আর্থিক অনুদান দিয়ে কয়েকটি বিদ্যালয় গৃহ মেরামত এবং শিক্ষাদান কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছিল।

প্রচার বিভাগ : 'বিপ্লবী' নামক একটি বুলেটিন নিয়মিত প্রকাশ করে ব্রিটিশের দমন-পীড়ন এবং জাতীয় সরকারের কার্য্যাবলির প্রচার করে গণচেতনা বৃদ্ধিতে সক্রিয় ছিল প্রচার বিভাগ।

থানা জাতীয় সরকার

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের কার্য্যাবলি সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত চারটি থানায় অধিনায়কদের নেতৃত্বে থানা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২২]

মহিষাদল থানা	নীলমণি হাজরা
তমলুক থানা	গুণধর ভৌমিক
সুতাহাটা থানা	ডাঃ জনার্দ্দন হাজরা
নন্দীগ্রাম থানা	কুঞ্জবিহারী ভক্তদাস

একমাত্র নন্দীগ্রাম থানার অধিনায়ক জাতীয় সরকারের বিলুপ্তি পর্যন্ত পদে আসীন ছিলেন। অন্য তিনটি থানায় একজন অধিনায়কের গ্রেপ্তারের পর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন অন্যজন সেইমত তমলুক এবং সুতাহাটায় তিনজন এবং মহিষাদলে দুইজন অধিনায়ক পর্য্যায়ক্রমে থানা-জাতীয় সরকার পরিচালনা করেছিলেন। পররাষ্ট্র বিভাগ ছাড়া অন্যান্য সকল বিভাগ থানা জাতীয়-সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

জাতীয় সরকারের বিলুপ্তি

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে গৃহলুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ, গুলিবর্ষণ এবং ধর্ষণ প্রভৃতি সব প্রকার দমন-পীড়ন এবং কূটনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করেও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারকে উৎখাত করতে পারেনি। সরকারের কার্যকাল ছিল ১৭ই ডিসেম্বর '৪২ থেকে ১লা সেপ্টেম্বর '৪৪ পর্যন্ত। সর্বাধিনায়ক সতীশ চন্দ্র সামন্তকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৯৪৩-এর ২৬শে মে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁকে গ্রেপ্তারের (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩) পর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন সতীশ চন্দ্র সাহু। ১৯৪৪ সালের ১২ই মার্চ তাঁকে গ্রেপ্তারের পর স্থলাভিষিক্ত হন চতুর্থ সর্বাধিনায়ক বরদাকান্ত কুইতি। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নেতৃবৃন্দ স্বেচ্ছায় জাতীয় সরকারের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন ১৯৪৪-এর ১লা সেপ্টেম্বর।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ব্যাপক গণ-সমর্থনের ফলে উক্ত সরকারের স্থায়িত্ব সম্ভব হয়েছিল প্রায় দুই বৎসর। গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড, এমনকি প্রাণদণ্ড দিয়েছিল জাতীয় সরকার। মহাত্মা গান্ধী মেদিনীপুর শুভাগমন করে সবকিছু সরেজমিন তদন্ত করে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে মন্তব্য করেনঃ

"I wonder how I personally would have reacted to what the British have done here. What you have done is heroic and glorious. However you have deviated from the path of Non-violence."

জাতীয় সরকার ঃ তুলনামূলক আলোচনা

কার্যধারার সাদৃশ্য ঃ বালিয়া জাতীয় সরকারের কার্যকাল এবং কার্য্যাবলী [illegible]। অন্যদিকে সাতারা এবং মেদিনীপুরের জাতীয় সরকারের কার্যকাল দীর্ঘ এবং কার্যধারা বিচিত্র ও বহুমুখী।

সাতারা জাতীয় সরকারের কার্য্যকাল ছিল তেত্রিশ মাস (জুন '৪৩ ফেব্রুয়ারী '৪৬)। মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের স্থায়িত্ব ছিল বাইশ মাস (১৭ই ডিসেম্বর '৪২—১লা সেপ্টেম্বর '৪৪)।

দুইটি সমান্তরাল জাতীয় সরকার শুধুমাত্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে জনগণকে ধন-মান-প্রাণের নিরাপত্তা দেয়নি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গঠনমূলক কার্য্যধারার মাধ্যমে এলাকার উন্নতি সাধন করেছিল। এক্ষেত্রে উভয় সরকার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অধিকারী।

উভয় সরকার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য এবং সমর্থন লাভ করে—যা সরকারের স্থায়িত্ব ও কর্তৃত্বের পক্ষে অপরিহার্য। বালিয়া জাতীয় সরকার ও উক্ত ক্ষেত্রে কৃতিত্বের অংশীদার।

প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগের বিন্যাস এবং কেন্দ্রীয় স্তর থেকে নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে শাসনের সমন্বয় ঘটিয়ে ছিল উভয় সরকার।

সরকারের কর্মচারীবৃন্দ স্বেচ্ছাসেবকদের ত্যাগ, নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাহায্যে কর্মসূচী রূপায়িত করেছিলেন। ফলে দীর্ঘস্থায়ী এবং বহুমুখী কার্য্যধারা প্রশাসনের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল।

সাতারা সরকারের 'ন্যায়দান মণ্ডল' এবং তাম্রলিপ্ত সরকারের বিচার বিভাগ দক্ষতা, দৃঢ়তা এবং ন্যায় নিরপেক্ষতায় বিচারের নিষ্পত্তি করেছিল। ফলে বহুক্ষেত্রে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন—আইন শৃঙ্খলা সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে।

কার্য্যধারার পার্থক্য

সাদৃশ্যের পাশাপাশি উভয় সরকারের পরিধি এবং কার্য্যধারার মধ্যে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। যেগুলি নিম্নরূপঃ

সাতারা প্রতি সরকারের কার্য্যধারা সাতারা জেলাসহ খান্দেশ, সোলাপুর পুনা জেলায় বিস্তৃত ছিল। অন্যদিকে তাম্রলিপ্ত সরকারের কার্য্যকলাপ তমলুক মহকুমার ছয়টি থানার মধ্যে চারটি থানায় সীমাবদ্ধ ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য তৎকালীন মেদিনীপুর জেলা পাঁচটি মহকুমার সমন্বয়ে গঠিত ছিল। সুতরাং সাতারা সরকারের আয়তন বৃহত্তর।

সাতারা সরকারের স্থায়িত্ব তেত্রিশ মাস। অন্যদিকে তাম্রলিপ্ত সরকারের কার্যকাল বাইশ মাস। অর্থাৎ এগার মাস বেশী স্থায়িত্ব সাতারা সরকারের।

সাতারা সরকারের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক ছিলেন অবিসম্বাদী নেতা। ক্ষমতার কোন দ্বন্দ্ব ছিল না নেতৃবৃন্দের মধ্যে। সব স্তরের নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের আনুগত্য সর্বাধিনায়কের প্রতি ছিল অটুট। ফলে ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ আগমনের মোকাবিলা করে কার্যধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছিল।

প্রতি সরকারের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ কয়েকটি দলে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে

দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের বিদ্যুৎ বাহিনীর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। ছিল ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী প্রয়াস স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের লক্ষ্যে।

নারীদের অংশগ্রহণ সাতারা সরকারে ছিল স্বল্প। লীলাবতী পা, ভলা, রাজমতী পাটেল এবং ইন্দুমতী নিকাম প্রমুখ কয়েকজনের উল্লেখ পাওয়া যায় যাঁরা আন্তরিক নিষ্ঠায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। অন্যদিকে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অধীনে ছিল ভগিনী সেনা নামে একটি সংগঠিত, সুদক্ষ নারী বাহিনী। পুলিশের লোলুপ আক্রমণের মোকাবিলা ছাড়াও [illegible] সহায়তা এবং অসুস্থ স্বেচ্ছাসেবকদের সেবা [illegible] করেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলেন কুমুদিনী ডাকুয়া, সরোজিনী ইত্যাদি, গিরিবালা দে, মাখনবালা দাস প্রমুখা। নিঃসন্দেহে ভগিনী সেনার ভূমিকা তাম্রলিপ্ত সরকারের বিশেষ কৃতিত্বের দিক।

সাতারা সরকারের কার্যকলাপ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে যায় এবং সরকারের বিলোপ ঘটে। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক [illegible] করে। কিন্তু তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের নেতৃবৃন্দ স্বেচ্ছায় সরকারের বিলোপ ঘটায়। ব্রিটিশ সরকার শত চেষ্টা করেও উক্ত সরকারের বিলোপ ঘটাতে পারে নি। অন্যদিকে তাম্রলিপ্ত সরকার ব্রিটিশ রাজকে বিপর্যস্ত করেছিল। তা স্বীকৃত হয়েছিল বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক-এর নিম্নবর্ণিত ভাষায়ঃ

"Midnapur had parallel Government with its military and police force and intelligence branch. It has its Jails where people were imprisoned; and in some cases, the people had actually paralysed the Government."

'Life is in deeds, not in years,' এই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে সাতারা সরকারের তুলনায় স্থায়িত্ব কম হলেও বহুমুখী কর্মধারা, প্রশাসনিক সমন্বয়, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ঐক্য, নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্য প্রভৃতির নিরিখে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার অগ্রগণ্য।

জাতীয় সরকার ঃ মূল্যায়ন

'৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলন ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষা। স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ—আত্মত্যাগ, ঐক্য, দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা,

জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। আপোষহীন জনগণ ব্রিটিশ শাসনের মর্মমূলে চূড়ান্ত আঘাত হানতে বদ্ধপরিকর এবং তা প্রমাণিত। উক্ত সর্ববৃহৎ, সর্বশেষ গণসংগ্রাম চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে জাতীয় সরকার গঠন এবং পরিচালনে। গুজরাটের আমেদাবাদ, বিহারের ভাগলপুর, সুলতানপুর, মুঙ্গের, উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, মহারাষ্ট্রের সাতারা, মেদিনীপুরের খেজুরী ও পটাশপুর থানা, কাঁথি মহকুমা এবং তমলুক মহকুমায় স্থাপিত হয়েছিল জাতীয় সরকার। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল সাতারা এবং তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। অন্যান্য স্থানে স্বল্পস্থায়ী এবং স্বল্প পরিসরের জাতীয় সরকার গঠিত হলেও স্ব স্ব এলাকার জনগণের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও স্বশাসনের উদ্যোগ ও উদ্যম পরিলক্ষিত। ধাপে ধাপে আন্দোলনের মাধ্যমে জাতি যে স্বাধীনতার সুবর্ণতীরে পৌঁছুতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং স্বশাসনের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম তা প্রমাণিত। উক্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় সরকারের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে তাৎপর্য্যপূর্ণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে।

৫

তমলুক "সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ভূমি" সরকারী ঘোষণা—১৯৪৪

বাণীব্রত ত্রিপাঠী

বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে দুটি পর্য্যায়ে অর্থাৎ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর অনুপ্রবেশের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়কে কেন্দ্র করে বিভক্ত করলে দেখা যাবে—প্রথম পর্বগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত ও যোগ্য নেতৃত্বহীন অর্থনৈতিক শোষিত বর্গের ব্রিটিশ বিরোধী এক আন্দোলনের যুগ। দ্বিতীয় পর্বগুলি ছিল—রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রকৃত ও যোগ্য নেতৃত্বের অধীনে এক সচেতন গণ-আন্দোলনের যুগ। গান্ধী পর্বের শেষ আন্দোলনটি ছিল তীব্র সংঘর্ষপূর্ণ এক গণ-আন্দোলন, যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিপরীত গান্ধীবাদী আদর্শের পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, গান্ধী আন্দোলনের তিনটি পর্ব তাঁর আদর্শ (অহিংস) থেকে কেন দূরে সরে গিয়েছিল? এর কারণ বা ব্যাখ্যা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় না হলেও কারণ হিসেবে একটি কথাই বলা যায়—সহ্য, ধৈর্য্য-এর সীমা যখন অতিক্রান্ত হয় এবং মানুষের আত্মরক্ষা ও বাঁচার তাগিদ যখন একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় তখন আদর্শরূপ বিবেকের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল বলা চলে। শাসকশ্রেণী যতই শক্তিশালী হোক বিস্ফারিত গণরোষের কাছে কোন শক্তিই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ১৯৪২-এর গণ-আন্দোলনের তীব্র রুদ্ররোষ ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তে একই রকম ছিল না, কোথাও তীব্র, কোথাও প্রশমিত প্রায়। সাতারা, বালিয়া, ঢেঙ্কানল, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এই আন্দোলন কেন এত তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল? বিষয়গুলি নিয়ে সামান্য কিছু গবেষণা হয়েছে এবং কিছু গবেষণা পর্য্যায়ে বর্তমান। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় মেদিনীপুরে ৪২'-এর আন্দোলন দমনের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত স্বৈরাচারী দমনমূলক নীতির কতগুলি দিক।

মেদিনীপুরে আগষ্ট আন্দোলনের সূচনা থেকে আরম্ভ করে ১৯৪২-এর

২৯শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বরে তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও সরকারী দমন নীতি সম্পর্কে প্রায় প্রত্যেকেরই স্বল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা বর্তমান। কিন্তু ১৯৪২-এর ১৬ই অক্টোবরের (১৩৪৯ বাং সন) মর্মান্তিক ঝঞ্ঝা ও জলোচ্ছ্বাসের পর মেদিনীপুর জেলায় তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় সরকারী দমননীতি ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির।[১] ১৯৪২ থেকে শুরু করে ১৯৪৪-এর আগষ্ট মাস পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মেদিনীপুরে ৪১টি গণ-সংগঠনকে ১৯০৮ সালের Criminal Law Amendment Act (CLA)-এর নির্দেশ বলে নিষিদ্ধ করা হয়।[২] ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর ঘটনার অব্যবহিত পর থেকে এই জেলায় বিশেষতঃ তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় বিপ্লববাদ ও বিপ্লবীদের দৃষ্টান্তমূলক দমন ও শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে সরকার এই দুই মহকুমার উপর পুলিশরাজ কায়েম করে। উদ্দেশ্য ছিল দুটি, প্রথমতঃ—যে কোন মুহূর্তে পুনরায় আন্দোলনের আশঙ্কা, দ্বিতীয়তঃ—সেপ্টেম্বর ঘটনায় সরকারের চরম ব্যর্থতার প্রতিশোধ গ্রহণ। ঝড়ের পর সরকারীদমন নীতির প্রথম পর্যায় শুরু হয় নিরীহ জনগণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানিকেতনে নির্বিচারে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ-এর মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে বিপ্লবীরা সরকারী বাংলো, ডাকঘর ও কাছারি গৃহে অগ্নিসংযোগ করে বেশ কিছু সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করে। বিধানসভায় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সেনাবাহিনী ও বিপ্লবীদের দ্বারা ধ্বংসকৃত গৃহগুলির যে তালিকা দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ[৩]—

মহকুমা	গৃহদাহ, ঝড়ের পূর্বে	গৃহদাহ, ঝড়ের পরে
তমলুক		
বিপ্লবীদের দ্বারা	৩৪	৯
পুলিশ ও সেনাবাহিনী দ্বারা	১২	১১
কাঁথি		
বিপ্লবীদের দ্বারা	৩৬	২
পুলিশ ও সেনাবাহিনী দ্বারা	১৬২	....

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী তমলুক মহকুমায় মোট গৃহদাহের সংখ্যা ছিল ১২৪ এবং মোট ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১০৯৫০০ টাকা। পুলিশ ও সেনাবাহিনী কর্তৃক লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ আনুমানিক ২১২৭৯৫ টাকা।[৪] কাঁথি মহকুমাতে ঝড়ের পূর্বে ও পরে গৃহদাহের

সংখ্যা ছিল ৯৬৫।[৫] কিন্তু সর্বসম্মত স্বীকৃত কোন সঠিক পরিসংখ্যান আজও পর্য্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

গৃহদাহ ও অগ্নিসংযোগের দৃশ্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন ফজলুল হক মন্ত্রীসভার দুই মন্ত্রী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্তোষ কুমার বসু ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে তমলুক ও কাঁথি মহকুমা পরিভ্রমণে এসে। ঠিক ঐ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী তারকনাথ মুখোপাধ্যায় তমলুক, মহিষাদল ও সুতাহাটা থানা পরিদর্শনে এসে একই দৃশ্য লক্ষ্য করেন।[৬] বিপ্লব বা বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশক্রমে প্রত্যহ ৭-১৫ কি.মি. দূরত্ব পর্য্যন্ত থানাগুলিতে হাজিরাদানে বাধ্য করা হয়। গৃহসম্পদ লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে, গণপ্রহার ও ধর্ষণ ব্যতীত শয্যা ও আসবাবপত্রাদিতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীদের মলমূত্র ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রায়ই লক্ষণীয়। ১৯৪৩-এর ডিসেম্বর (পৌষ) সুতাহাটা থানার হোগলাবাড়ি গ্রামে ১৮ জন নিরীহ মানুষকে গ্রেপ্তার করে তাদের নিকট থেকে বিপ্লবীদের সম্পর্কে কোন প্রকার সংবাদ আদায় করতে না পেরে পুলিশ ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জোরপূর্বক পুকুরে পৌষের মধ্য রাত্রে স্নান করতে বাধ্য করে এবং ঐ অবস্থায় শুইয়ে দিয়ে হাতপাখার বাতাস ক্রমান্বয়ে দেওয়া হতে থাকে। ঠিক একই প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল মহিষাদল থানার পার্ণিসিথি, রাজনগর, ফটিকারী, চাঁপি প্রভৃতি অন্যান্য গ্রামাঞ্চলেও। মহিষাদল থানার খণ্ডি গ্রামনিবাসী প্রিয়নাথ দত্তের বাড়ি পুলিশ ও সেনাবাহিনী বেশ কয়েকবার লুণ্ঠন করে। প্রিয়বাবুর দুই ভাই বিষ্ণুহরি ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক এবং ছোট ভাই সতীশ ছিলেন গরমদলের কেন্দ্রিয় কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য। ১৯৪২-এর অক্টোবরে পুলিশ উক্ত দত্ত পরিবার লুণ্ঠন করে বেশ কিছু সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে ১৫টি Defence Saving Certificate নষ্ট করে। দ্বিতীয়বার ঐ পরিবারের কাছে ঘর চাওয়া হয়েছিল সেনাবাহিনীর একটি অস্থায়ী শিবির করার জন্য। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ক্যাম্প বা শিবির তৈরী করা নয়, উদ্দেশ্য ছিল সতীশ দত্তকে গ্রেপ্তার। এক্ষেত্রে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ব্যর্থ হলে ঐ পরিবারের উপর অত্যাচার আরও তীব্র হয়।[৭]

বিধানসভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নলিনাক্ষ সান্যাল ও আশুতোষ লাহিড়ীর প্রশ্নোত্তরের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক স্বীকার করেন মেদিনীপুরে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও স্থানীয় অফিসারদের সমস্ত অত্যাচার সম্পর্কে তিনি

প্রায় অবহিত আছেন, কিন্তু তাঁর বা মন্ত্রীসভার হতে এর কোন প্রতিকারের উপায় নেই। কারণ সমস্ত ঘটনাই উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অঙ্গুলীহেলনে পরিচালিত হচ্ছে।[৮]

এরপর দুই মহকুমার বিপ্লববাদ দমনের উদ্দেশ্যে সরকার কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত District Board, Local Board ও Union Board-গুলির উপর নজর দেয়। এই উদ্দেশ্যে সরকার উক্ত Board-গুলির সভাপতিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছেদ করার জন্য প্রত্যেকটি Board-এ সরকার মনোনীত ব্যক্তি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪২-এর অক্টোবর মাসের মধ্যবর্তী সময়ে মেদিনীপুরের জেলা শাসক নিয়াজ মহম্মদ খাঁন (N. M. Khan) ও হক মন্ত্রীসভার একজন বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সুরাবর্দীর সঙ্গে (পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী) এই বিষয়গুলি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।[৯] এর ঠিক কয়েকদিন আগে জেলা শাসক বর্ধমান বিভাগের কমিশনার এস. কে. হালদারকে উক্ত বিষয়ে একটি পত্র লেখেন।[১০] উক্ত পত্রে জেলা শাসক জানান—কেবলমাত্র ঝাড়গ্রাম Local Board ব্যতীত ঘাটাল, তমলুক ও কাঁথির Local Board-গুলি প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ইতিমধ্যে ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বরে তমলুক Local Board-এর সভাপতি এবং সদর Local Board-এর চারজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে খাঁন যথেষ্ট উৎফুল্লবোধ করেন এবং তমলুক Local Board-এর সহ-সভাপতিকে গ্রেপ্তারের জন্য সরকার সর্বপ্রকার চেষ্টা শুরু করে। জেলা শাসক তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন যে Local Board-গুলি সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে এরা অনেক দূরে সরে গেছে। পাঁশকুড়া থানার কোলা Union Board, নন্দীগ্রাম থানার নরঘাট Union Board এবং ময়না Union Board-এর সদস্য ও সভাপতিরা প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, সুতরাং এদের দমনের জন্য 'ভারত রক্ষা আইন' বা 'Defence of India Act'-এর প্রয়োগ করা হবে কিনা নিয়াজ মহম্মদ খাঁন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ চেয়ে পাঠান।[১১]

স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী সন্তোষকুমার বসু বাংলা সরকারের অতিরিক্ত কর্মসচিব (Additional Secretary) A. E. Porter-কে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র লেখেন। Porter নিয়াজ মহম্মদকে মেদিনীপুরের District, Local এবং Union Board-গুলিকে দমনের জন্য সত্বর 'ভারতরক্ষা আইন' প্রয়োগের নির্দেশ দেন এবং ইতিপূর্বে খাঁন ও সুরাবর্দীর মধ্যে আলোচিত বিষয়কে তিনি প্রাধান্য দিতে বলেন।[১২]

অতঃপর গভর্ণরের নির্দেশ অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী সন্তোষ কুমার বসু 'ভারত রক্ষা আইন'-এর ৩৮-বি ধারার ১নং উপধারা অনুসারে মেদিনীপুরের সমস্ত স্বায়ত্তশাসন বিভাগগুলি ৬ মাসের জন্য বন্ধের আদেশ দেন এবং Calcutta Gazette-এ উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এই নির্দেশ কার্যকরী হবে বলা হয়।[১৩]

মহকুমার Local ও Union Board-গুলির নবনিযুক্ত সরকার নির্বাচিত সভাপতিরা হলেন[১৪]—

তমলুক Local Board	—	মহকুমা শাসক
কাঁথি Local Board	—	ঐ
সদর Local Board	—	ঐ
ময়না Union Board	—	বাবু গণেশ চন্দ্র দাস
কোলা Union Board	—	মৌলবি খাঁদকার সৈয়দ আহাম্মদ আলি
নরঘাট Union Board	—	মৌলবি ইউসুফ মল্লিক

১৯৪৬ সালে ৫ই এপ্রিল স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে মেদিনীপুর জেলায় ২০টি Union Board-কে তাদের কাজকর্ম থেকে বিরত করেন। ১৯৪৬ সালে ১লা আগষ্ট, এই প্রসঙ্গে বিধানসভায় তদানীন্তন স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রী মহম্মদ আলির সহিত বিধানসভার বিরোধী সদস্য নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, রজনীকান্ত প্রামাণিক, অমূল্যচন্দ্র অধিকারী ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। মহম্মদ আলি ঐ সমস্ত সদস্যদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে পড়েন। এমন কি সঠিক ও যথাযথ উত্তরদানে তিনি অক্ষম হয়ে পড়েন। ২০টি Union Board বাতিল করা প্রসঙ্গে তিনি শুধু একটাই অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রত্যেকটি Union Board-ই জনবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত ছিল সেই হেতু এদের বিরুদ্ধে 'সঠিক কার্যকরীনীতি' গৃহীত হয়েছে (Justify the Action)। বিধানসভায় বিরোধী সদস্যরা মন্ত্রী মহোদয়ের 'Justify the Action' কথাটির তীব্র বিরোধীতা করেন এবং এর সদর্থক উত্তর চাইতে শুরু করলে অধ্যক্ষের (Speaker) সুচতুর হস্তক্ষেপে মন্ত্রীমহোদয় সে-যাত্রায় নিস্তার পান।[১৫] যদিও ১৯৪৬-এর জুলাই মাসে স্বায়ত্তশাসন বিভাগ মন্ত্রণালয়ের এক সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছিল এই জেলায় স্বায়ত্তশাসন

বিভাগগুলির নির্বাচন দ্রুত সম্পন্ন হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবায়িত হয়নি।[১৬]

তমলুক ও কাঁথি মহকুমার আন্দোলন দমনের জন্য সরকার উত্তেজনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে নিযুক্ত সেনাপ্রধানদের সঙ্গে স্থানীয় চৌকিদার ও দফাদারদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের উপর জোর দেয়। উত্তেজনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে নিযুক্ত চৌকিদার ও দফাদারদের ভাতা বৃদ্ধি করা হয়।[১৭] তাছাড়া পুলিশ ও সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে যে সমস্ত বড় ও ছোট নৌকা নিযুক্ত ছিল তাদের মালিকদেরও অতিরিক্ত ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সরকারী আদেশ অনুসারে নির্দেশটি ১৯৪২-এর ৭ই নভেম্বর থেকে ১৯৪৩-এর ২৬শে মার্চ পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে বলা হল।[১৮]

তমলুকের জাতীয় সরকারের কাজকর্মে বিচলিত হয়ে জেলা শাসক ও তমলুকের মহকুমা শাসক ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে সুতাহাটা ও মহিষাদল থানায় পিটুনি পুলিশ নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাতীয় সরকারের নাশকতামূলক কাজকর্ম যাচাই করতে গোয়েন্দা বিভাগের রাজ্য পুলিশ অধিকর্তা ও অতিরিক্ত পুলিশ অধিকর্তা তমলুকে আসেন।[১৯] ইতিমধ্যে অর্থাৎ ১৯৪৩-এর আগস্ট মাসে জেলা গোয়েন্দা দপ্তরকে সাহায্যের জন্য দুজন Inspector, একজন Sub-Inspector, দুজন Assistant Sub-Inspector, ১১ জন Constable এবং একজন Clerk রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে মেদিনীপুরে পাঠানো হয়।[২০]

বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সরকারকে সাহায্য করার জন্য এক শ্রেণীর মুসলমান ও মুষ্টিমেয় হিন্দু সর্বদাই স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। স্থানীয় সরকারী অফিসাররা উক্ত শ্রেণীর মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মে উৎসাহ দিয়ে বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্তির লোভ দেখাত। এমনকি স্থানীয় সরকারী প্রশাসনের অধঃস্তন কর্মচারীদের পদগুলি মুসলমানদের দ্বারা পূরণের ব্যবস্থা করা হত।[২১]

বিপ্লব ও বিপ্লবীদের দমনে ব্যর্থ হয়ে অতঃপর তমলুক ও কাঁথির মহকুমা শাসকদ্বয় বাংলার উচ্চ প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই দুই মহকুমার উপর ১৯০৮ সালের 'Indian Criminal Law Amendment Act (পরবর্তীকালে Bengal Criminal Law Amendment Act 1930 এবং ১৯৩২-এর Bengal Suppression Terrorists Outrages' Act—এই আইন দুটি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২২] গোয়েন্দা বিভাগের I. G., D. I. G. এবং

মেদিনীপুরের স্থানীয় অফিসারদের মধ্যে আলোচনা অনুসারে ১৯৪৪ সালে ১৪ই আগস্ট 'Indian Criminal Law Amendment' Act-এর ১৬নং ধারাটি প্রয়োগ করে জাতীয় সরকার ও গরমদলকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২৩] যা হোক মেদিনীপুরের জেলা শাসক, মহকুমা শাসক ও অফিসারদের সঙ্গে বাংলার উচ্চ প্রশাসনিক আধিকারীকদের আলোচনার পর স্থির হয় কেবল তমলুক মহকুমার জন্য বিশেষতঃ জাতীয় সরকার ও গরমদলের কর্তাব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের জন্য তিনটি বিষয় গৃহীত হবে। প্রথমতঃ, প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে ১৫-৫০ বছরের মধ্যে পুরুষদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। দ্বিতীয়তঃ, বিষয়টিকে কার্যকরী করতে তিন কোম্পানি Eastern Frontier Rifles তমলুকে প্রেরণ এবং G. H. Manooch, I. G. Police-এর নির্দেশক্রমে তমলুক, মহিষাদল ও সুতাহাটায় সেনাবাহিনীর মূল শিবিরগুলি স্থাপিত হবে বলা হয়। তৃতীয়তঃ, পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য অতিরিক্ত কাজ হিসাবে চৌকিদার ও দফাদারদের মাথাপিছু অতিরিক্ত ৩ টাকা করে দেওয়া হবে বলা হয়। এক সরকারী ঘোষণায় তমলুককে "সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ভূমি" বা "Place of Terrorist Movement" বলা হয়।[২৪]

সরকার তমলুক মহকুমার নিম্নলিখিত তিনটি থানায় সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে পরিচয়পত্র প্রদানে সিদ্ধান্ত নেয়ঃ

থানা	সন্দেহভাজন ব্যক্তির সংখ্যা
তমলুক	৩৪২২৩
মহিষাদল	৩৬৯৩৮
সুতাহাটা	২৬৪১৬

ইতিপূর্বে এই মহকুমায় 'Border Frontier Rifles-এর যে দলটি নিযুক্ত ছিল তাদের একটি ছোট গোষ্ঠীকে দিয়ে Flag March সরানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তমলুকের অধিবাসীরা এতে অধিক বিচলিত না হয়ে সেনাবাহিনীর এই Flag March-এর পরেই এর বিরুদ্ধে মিছিল, মিটিং শুরু করে।[২৫] সরকারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অব্যবহিত পরেই অনিল বসু নামক এক ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে Special Magistrate হিসাবে তমলুকে নিয়োগ করা হয় এবং তমলুকের মহকুমা শাসক ও অতিরিক্ত মহকুমা শাসকের পূর্বের সমস্ত বিশেষ ক্ষমতাকে বাতিল করা হয়।[২৬] তবে এটা অবশ্যম্ভাবীভাবে সত্য, অনিল বসুকে যে কারণে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে Special Magistrate করে পাঠানো হয়েছিল তিনি কিন্তু ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া উক্ত দুই মহকুমা আধিকারীকদের তুলনায় তেমন

কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। এর পর থেকেই শুরু হয় উপরোক্ত তিন থানার উপর গোয়েন্দা কার্য্যকলাপের শেষ প্রস্তুতি। রাজ্য ও জেলা-গোয়েন্দা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই তিন থানার বিপ্লববাদ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে যে চাতুর্যপূর্ণ জাল বিস্তার করা হয়েছিল তা আংশিক সাফল্য লাভ করলেও সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ হয়। কারণ এর অব্যবহিত পরেই গান্ধীর আন্দোলন প্রত্যাহার ঘোষণার পর তমলুকের জাতীয় সরকার ১৯৪৪ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে ১লা সেপ্টেম্বর তাদের কাজকর্মের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে।

তমলুকের বিয়াল্লিশের আন্দোলনের গভীরতা ও ব্যাপকতা লক্ষ্য করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ প্রশাসন কিভাবে তা দমন করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তা আজকে সম্ভব হত মনে হয় না। "সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ভূমি" বলে চিহ্নিত করে তমলুকের জনসমর্থনপুষ্ট স্বাধীনতা আন্দোলনকে ছোট করার যে প্রয়াস ব্রিটিশ সরকার করেছিল তা ভাবতে অবাক লাগে। মনে রাখতে হবে বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা তমলুকের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন প্রথাকে দমন করতে পারেনি। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারকে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। গান্ধীজীর আহ্বানে জাতীয় সরকার নিজেকে উঠিয়ে নেয়। তাই তমলুককে "সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ভূমি" না বলে বরং জনসমর্থনপুষ্ট স্বাধীনতা আন্দোলনের পীঠস্থান তথা "বিপ্লব তীর্থ" রূপে চিহ্নিত করাই যথোচিত বলে মনে হয়।

৬

'ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা'

প্রণব বাহুবলীন্দ্র

পলাশীর যুদ্ধ চুকেবুকে যাওয়ার তিন বছর পর বিদেশী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে এসে গেল রাজস্ব সংগ্রহ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় প্রশাসনিক কর্তৃত্বভার -চুক্তিমত অখণ্ড বাংলার তিনটি জেলাঃ মেদিনীপুর, বর্ধমান, চট্টগ্রাম। আইনগত দিক থেকে জমিদারি দেখা শোনা বলতে যা বোঝায়, অনেকটা সেই রকম। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর। এবার আর বকলমে নয়, সরাসরি সশরীরে উপস্থিতি। বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে রূপান্তরিত করার প্রত্যক্ষ প্রস্তুতি। কিন্তু বর্দ্ধমান আর চট্টগ্রামের আলাদা আলাদা গুরুত্ব না হয় বোঝা গেল, মেদিনীপুরের নাম ওদের লিস্টে হঠাৎ ঢুকে গেল কেন? বিশেষ করে লাগোয়া পটাশপুর পরগণা তখনো মারাঠা সৈন্য শিবিরের নিয়ন্ত্রণে। তার কারণ, প্রবল ব্যবসা বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রিটিশদের বাস্তবতাবোধ চিরকালই প্রখর। দক্ষিন-পশ্চিম অংশের এই এলাকা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা তো বটেই, তার চেয়েও বড় কথা, ফোর্ট উইলিয়ম শাসনাধীন সমগ্র ব্রিটিশ এলাকায় যে পরিমাণ লবণ তৈরী হয়, তার এক-তৃতীয়াংশ বা তারো বেশী পাওয়া যায় কেবল হিজলী অঞ্চল থেকেই। প্রথম রেসিডেণ্ট অফিসার মিঃ জনস্টোন সাত তাড়াতাড়ি এ কথা সহজে বুঝতে পেরেছিলেন।

বেশী দিন নয়, মাত্র ন'বছর আগে যে মেদিনীপুরকে নবাব আলিবর্দী মারাঠাদের হাতে তুলে দিতে চাননি, সেই ভূখণ্ডকে এখন বিদেশীদের উপঢৌকন দিচ্ছেন অসহায় মীরকাশিম নানান ঘটনার চাপে, হয়তো নিতান্ত বাধ্য হয়ে। মাত্র এক দশকের মধ্যেই ঘটে গেল উড়িষ্যার সঙ্গে পাকাপাকি অসংশক্তি, আর ইংরেজদের সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ সংলিপ্ততা। আর কী আশ্চর্য, উচ্ছল সদাচঞ্চল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের পূর্ব-পশ্চিম তটলগ্ন দুই প্রান্ত চট্টগ্রাম-মেদিনীপুরে গড়ে উঠেছিল ঔদ্ধত্য-দীপ্ত সমান্তরাল জাতীয় সরকার। কোথাও তিন, আবার কোথাও ছ'শো চব্বিশ দিন, যাইহোক না কেন। ঔজ্জ্বল্য কিন্তু কোন অংশে কোন জায়গায় এতটুকু তমোময় নয়। বিধাতা পুরুষের এ এক অদ্ভুত লীলাকৌতুক।

১৭৫৭ থেকে ধরুন অথবা ১৬৬০, মোটের ওপর ১৯০ বছর ইংরেজদের সাথে

মেদিনীপুরের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। হাতের মুঠি ওরা শক্ত করেছে যত, আমরাও ছুঁড়ে দিয়েছি লাগাতর একটার পর একটা চ্যালেঞ্জ। প্রতিপক্ষকে এই যে নিরন্তর চাপে রাখা, আদৌ হাঁফ ফেলতে না দেওয়া, কোনক্রমে এটা কিন্তু তুচ্ছ ব্যাপার নয়। সংগ্রামী শক্তির স্বরূপত্ব যাচাই করার এটাই বোধ হয় সহজতম পন্থা। সাফল্য-অসাফল্য নয়, চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নয়, শত্রুপক্ষকে কতখানি কাঁপিয়ে দিলেন, চকিত গতিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষমতা অর্জন করলেন, এক্ষেত্রে সেটাই একমাত্র বিচার্য বিষয়। সেদিক থেকে বিচার করলে মেদিনীপুর বরাবরই অনন্য। মেদিনীপুর যেন এ যুগের বেপরোয়া অকুতোভয় এক ডেভিড, অবলীলাক্রমে গলিয়াথকে এক লহমায় বানিয়ে দিয়েছে লিলিপুট, একান্ত ঔদাসীন্যে তবু নিষ্ঠা সাধনা অন্তরঙ্গ একাগ্রতার জোরে।

গোড়ার দিকে ব্রিটিশদের কিছু কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছিল। ধূমায়িত বিক্ষোভ, সীমিত পর্যায়ে খণ্ডিত বিদ্রোহ ওদের বিচলিত করেছিল। ইতিহাসের পাতায়ও এরা স্থান করে নিয়েছে। ১৭৬৩—১৮৫৬ সময়সীমাকালে ভারত জুড়ে চল্লিশটিরও বেশী এ ধরণের নিম্নবর্গীয় আদিবাসী অভ্যুত্থানের হদিশ দিয়েছেন আধুনিক গবেষক এবং অন্যান্যরা। ত্রিবাঙ্কুরে এমনকি দেওয়ান ভেলু থাম্পির মৃতদেহ টেনে এনে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে গায়ের ঝাল মিটিয়েছিল ইংরেজরা ১৮০৫ সালে। তবে এইসব স্থানীয় অসন্তোষ বড়জোর স্ফুলিঙ্গের মত, দাবানল সৃষ্টির ক্ষমতা তাদের নেই। দপ করে জ্বলে উঠে দপ করে নিভে গেছে মুহূর্তে। চুয়াড়-পাইক-নায়েক কিংবা সন্ন্যাসী-ফকিরদের বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহে জাতীয়তাবোধ কিংবা স্বাধীনতা-সংগ্রামের মাত্রা আরোপ করা বোধ হয় সম্ভব নয়। অতিরিক্ত রং চড়ানোটাও কাম্য নয়। জাতীয়তা অর্থে যদি অখণ্ড ভারত বোধ ব্যাখ্যাত হয়, স্বাধীনতা অর্থে যদি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর নিগড় থেকে সার্বিক বন্ধন মুক্তি বোঝায়, সীমাহীন শোষণের বদলে কল্যাণপ্রদ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের গ্রহণ দাঁড়ায়, তাহলে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের সামনে বিকল্প পথ নেই। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মেদিনীপুরের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যথার্থ সীমারেখা ১৯০৫-৪৫। একটানা এই ৪০ বছরই আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়।

আলোচ্য চল্লিশ বছরের পটভূমি একটিবার অন্তত: খতিয়ে দেখা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক স্তরে দুটি বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮, ১৯৩৯-৪৫), যুগান্তকারী রুশ বিপ্লব (১৯১৭), চীনা লং মার্চ (১৯৩৪-৩৫), জাপানের অভ্যুদয় (১৯০৫),

ইতালি-জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব (১৯১৯-২১) তুরস্কে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের আবির্ভাব (১৯২৩-৩৮) ইত্যাদি। ভারতের দিকে তাকালেও দেখা যাবে, পটপরিবর্তন ঘটেছে কত দ্রুতলয়ে। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), অসহযোগ (১৯২০), আইন অমান্য (১৯৩০), তারপর ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২)। অগ্নিযুগ ঘুরে ফিরে এসেছে দুবার চলতি শতাব্দীর প্রথম আর তৃতীয় দশকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন চারের দশকে আবার যোগ হয়েছে আকস্মিক বিধ্বংসী প্রলয়ংকর ঝড় (১৯৪২), আর বিভীষিকাময় অতি ভয়ংকর প্রাণঘাতী মন্বন্তর (১৯৪৩)। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), সর্বনাশা দেশভাগ আর কাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভ (১৯৪৭), উদ্বাস্তুস্রোত (১৯৪৭-৪৮)—যুগসন্ধিক্ষণের সমুদ্রমন্থনে পরের কয়েক বছরের এই গরলামৃত পান প্রসঙ্গতঃ অবশ্য ধর্তব্য নয়। কংগ্রেসের পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছে মুসলিম লীগ আর কম্যুনিষ্ট দল। মেদিনীপুরের কথা একটুখানি স্বতন্ত্র হলেও এই জেলা ভারত-বহির্ভূত ভূক্ষেত্র নয়। ভগিনী নিবেদিতা, ঋষি অরবিন্দ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এখানে এসেছেন আর অনুপ্রেরণা ছড়িয়েছেন; নেতাজী সুভাষচন্দ্র সুদূর প্রাচ্য থেকে উদ্দীপনা বর্ষণ করেছেন। বি-ভি নেতৃত্বের নির্দেশে দীনেশ গুপ্ত ঢাকা থেকে এসে তোলপাড় করে দিয়েছেন মেদিনীপুর। মহাত্মা গান্ধী তবু প্রধান পুরুষ; তিনি সশরীরে থাকুন বা না থাকুন, রক্তকরবীর রাজার কত তাঁর অদৃশ্য উপস্থিতি সর্বত্র, নৈঃশব্দ্যও ঝংকৃত অপরূপ বাঙ্ময়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সেই যে মশাল জ্বালানো হলো, তার অনির্বান শিখা কিন্তু ক্রমশঃ দীপ্ত উদ্ভাসিত হতে থাকলো। দুটি খাতে ছড়িয়ে পড়লো মাতৃভূমির যাবতীয় শৃঙ্খলমোচন সংগ্রাম—দীক্ষিত নির্দিষ্ট কর্মীনির্ভর সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লব, আর অবারিত সংখ্যাতীত গণভিত্তিক প্রকাশ্য অহিংস আন্দোলন। প্রথমটিতে শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি, উল্লসিত অন্তরে সমীহভাব দেখিয়েছি, কিছুটা দূরে থেকে প্রশস্তি গাথা গেয়েছি। দ্বিতীয়টিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছি, একেবারে কাছাকাছি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছি, অশংক হৃদয়ে বারংবার স্বদেশমন্ত্র উচ্চারণ করেছি। একটিতে পরোক্ষ সমর্থন, অন্যটিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। দুটিই নাড়া দিয়েছে আমাদের প্রবলতর বেগে। একটিতে যদি আঘাত হানার জন্য দুর্বার গতিতে ছুটে গেছি, অন্যটিতে তবে সহ্যসীমা বাড়িয়ে অপেক্ষা করে থেকেছি। প্রথমটিতে আবেগে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটেছি, শেষটিতে ধীর সমাহিত প্রশান্তচিত্তে সাধন মার্গে বসেছি। দুটিতেই নিঃস্বার্থ

আত্মত্যাগ, অভূতপূর্ব বীরত্ব, জ্বলন্ত দেশপ্রেম—নিক্তির ওজনে কোনটি কারুর থেকে ছোট বড় নয়। একটি বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ ; অন্যটি অবশ্য আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসারিত।

* * *

মেদিনীপুরের কথা আলাদাভাবে এবার টেনে আনা যাক। প্রথমেই জানতে ইচ্ছে করে, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে তাহলে দেখা হবে কোন মাপকাঠির ভিত্তিতে? বাইরের কোন সহায়তা ছত্রচ্ছায়ার ওপর নির্ভর না করে বরং অপ্রত্যাশিত ভ্রূকুঞ্চন থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখে, তিনি একক মহিমায় এগিয়েছিলেন কোন মন্ত্রশক্তিতে? তৃণমূলস্তরে পৌঁছে সংগঠন দৃঢ়বদ্ধ করে গ্রামের পর গ্রাম দীপবর্তিকা জ্বালিয়েছিলেন কোন যাদুদণ্ড বলে? চৌকিদারি ট্যাক্স বর্জন আন্দোলন অবশ্যই উল্লেখযোগ্য তুলনারহিত ঘটনা। দু'দশক পরে বিয়াল্লিশের জাতীয় সরকারেও মেদিনীপুরের উদ্ভাবনী সামর্থ্য সুস্পষ্টরূপে মুদ্রিত। মৌলিকত্ব আর সৃজনশীলতায় অভাবনীয়। নেতৃত্বই ছিল চূড়ান্ত। মূলধন বলতে আর কিছু নয়, অফুরন্ত সাহস একমাত্র অবলম্বন। ঐ অনিশ্চিত ক্রান্তিকালে দুটি ধারার সমন্বয় ঘটেছিল হয়তো বা সকলের অলক্ষ্যে। সে সময় হিংসা-অহিংসা তাত্ত্বিক বাছবিচার করার সাধ্য আছে কার? খর চৈত্রের উত্তাপ আর ভরা ভাদ্রের বর্ষণ যেন মিলে গেছে অকস্মাৎ অনির্দিষ্ট নিগূঢ় সূক্ষ্মতর বিন্দুতে। বিপুল জলসম্ভার নিয়ে স্ফীতবক্ষ নদী তখন ছুটেছে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে।

মেদিনীপুরের মধ্যে একেবারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত চিহ্নিত রয়েছে বিপরীতধর্মী দুটি দিক। অগ্নিমন্ত্র আর অহিংসাব্রত। প্রথম দশকে যদি 'এক্সপোজিশন', আর ত্রিশের দশকে 'ক্লাইম্যাক্স' দাঁড়ায়, চল্লিশের দশকে তবে 'ক্যাটাসট্রফিতে' পৌঁচেছে মানতেই হয়। সমন্বয়ধর্মিতা মেদিনীপুরের মস্ত বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কেউ কারো ঘৃণিত প্রতিপক্ষ নয়, ক্রোধোন্মত্ত বিষদ্গারী নয়, প্রত্যেকে পরিক্রমা করেছে নিজস্ব কক্ষপথ অচঞ্চল স্থিরপ্রত্যয় গতিতে। তারপর মিলিত হয়েছে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মত ত্রিবেণীসঙ্গমের পুণ্যপবিত্র স্থলে। পশ্চিমের রুক্ষতা আসন নিয়েছে পূর্বের উর্বরতার পাশে, কাঠিন্য পরিয়েছে বরমাল্য পেলবতার গলায়, পর্বতের উত্তুঙ্গ মহিমা বরণ করেছে সাগরের অতল বিস্তার। সর্ব অর্থে মেদিনীপুর মহা ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রতর প্রতিরূপ।

চলমান ইতিহাস কখনো নেতৃত্ব-মুখাপেক্ষী নয়, ঘটনা প্রবাহ বরং নতুন নতুন নেতাদের আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। পরিচালকদের চাইতে পরিণতি

সেখানে প্রধান। এতেই বোঝা যাবে, মাটির তলায় কত গভীরে শেকড় ছড়াতে পেরেছে মহাবৃক্ষ। তখন তাকে উপড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়। দাসপুরের চেচুয়াহাট (জুন ১৯৩০), আর মহিষাদলের দানিপুর (সেপ্টেম্বর ১৯৪২) এমন দুটি গ্রহণযোগ্য দৃষ্টান্ত। কোন পূর্ব-পরিকল্পনা নেই, ওপরতলার নির্দেশনামা নেই, শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক নেই; জনতার রোষাগ্নি ভিসুভিয়াস থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাইছে তখন, লাভা স্রোত বয়ে গেছে অকস্মাৎ। ইতিহাস কোন নিয়ামক শক্তিকে কখনো গ্রাহ্য করে না। তবু চরমপন্থী সশস্ত্র বিপ্লবীরা একটা বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। ঝাড়গ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল যাতে আন্দোলন-মুক্ত রাখা যায়, পুলিশের সন্দেহ বেড়ে না যায়, তারজন্য হাজার চেষ্টা করেছেন। আদিবাসী অধ্যুষিত শাল জঙ্গল ঘেরা নিরাপদ গোপন আশ্রয় খুবই দরকার ছিল।

দাসপুর আর দানিপুর সম্বন্ধে শুধু বলা যায়, দুটি ঘটনার চরিত্র বিচিত্র গতিপ্রকৃতি আবার আলাদা ধরনের। স্বল্পদৈর্ঘ্যের খাল-নালাকে পরিকল্পনা মাফিক মাটি খুঁড়ে তৈরী করতে পারে মানুষ। কিন্তু বহতা নদী ধাবিত হয় আপন খেয়ালে, মুহূর্তে রচিত দ্রুতবর্ত্ম ধরে। ভগীরথ শুধু আগমনী সুর রচনা করেন, নিয়ন্ত্রণের রাশ নিতে সাহস দেখান না কখনো; ঐরাবত তো কোন ছার। দাসপুরে যতটা রাজনৈতিক কারণ, দানিপুরে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রায় ততটাই। ত্রিশের দশকে স্বরাজকামী আঞ্চলিক নেতাকে বে-ইজ্জত করে বসেছিল ব্রিটিশ আমলের উদ্ধত অত্যাচারী পুলিশ অফিসার। সামান্য বচসা থেকে মেঘগর্জন। বেতনভুক বঙ্গজ দারোগা তখন বিদেশী শাসক স্পর্ধিত ইংরেজের নামান্তর। ধৈর্যের বাঁধ যখন ভেঙে যায়, এমনি করেই মরীয়া হয়ে ওঠে জনতা। পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার হিসেব-নিকেষ কে করে তখন? চকমকি পাথরের আচম্বিত ঘর্ষণে জ্বলে উঠেছে আগুন সহসা। শেষ আঘাত হেনেছে প্রায় অপরিচিত অজ্ঞাত অবাঙ্গালী বণিক। বীরদর্পে ঘোষণা করেছে সহযোগী অন্যজন—ইংরেজ আর এদেশে নেই, ওরা মরে গেছে। আমরা এখন স্বাধীন। নেতার অপমান তখন সমগ্র জাতির অসম্মানে রূপান্তরিত। বিয়াল্লিশে দানিপুরের তাৎপর্য আবার একদিক থেকে গভীরতর। প্রাথমিক স্তরে স্থানীয় মানুষ আশাতীত সহিষ্ণু। তারা শুধু প্রতিবাদ জানাতে চায়, ন্যায্য অধিকারটুকু বজায় রাখতে চায়। গ্রামের ভাঁড়ার শূন্য করে ক্ষিদে মেটানোর শেষ সম্বল দু' মুঠো চাল আক্ষরিক অর্থে লুঠ করতে এসেছে দূরদেশী মুনাফাখোর যে ব্যবসাদার, তার সীমাহীন লালসাকে বিনা বাক্য ব্যয়ে কি মেনে নেওয়া যায়? রাজনীতির সংস্পর্শ যেখানে গোড়ায় নেই, তা থেকেই ঘটে গেল

আকস্মিক অভাবিত বিস্ফোরণ। ইকনমিক্‌স্‌ই এখানে ডেকে এনেছে পলিটিক্‌স্‌কে হাতছানি দিয়ে, তারপর পরস্পরকে জড়িয়ে একাত্ম একাকার।

সামান্য মানুষের অসামান্য হয়ে ওঠা মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। নেতাকে সরিয়ে জনতা বসেছে মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণময় রাজসিংহাসনের ওপর। ঠিক্‌রে বেরিয়েছে হীরকদ্যুতি আপনা হতে তখন। হাজার হাজার এমন প্রমাণ খুঁজে বার করা যায় অতি সহজে। তবু তার মধ্য থেকে বহুশ্রুত তিনটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ত্রিশের আন্দোলনে রসুলপুর গ্রামের ঝড়েশ্বর মাজিকে জেলে পাঠানো হয়েছিল, গোয়ালের গরু ক্রোক করা হয়েছিল, গোলা ভর্তি রাশি রাশি ধানের সঙ্গে গৃহস্থালির টুকিটাকি সমস্ত জিনিস পোড়ানো হয়েছিল প্রকাশ্য দিনের বেলায় একরকম সকলের চোখের সামনে। কর্মীরা যখন সান্ত্বনা জানাতে এল সন্ধ্যেবেলায়, মা পদ্মাবতী তখন মাটিতে আঁচল বিছিয়ে শুয়েছিলেন একাকী। পরের দিনই সকালে লবণকেন্দ্রে হাজির হয়ে বললেন: "আমার একটি ছেলে জেলে গেছে, আরো ছেলে আছে ; আটশো মন ধান ছাই হয়েছে, আবার ফসল ফলবে ; কোন দুঃখ নেই আমার, বীর পুত্রের জন্য আমি গরবিনী"। বিয়াল্লিশে পুলিশের গুলিতে মরেছিল দশ-বারো বছরের একটি ছোট ছেলে তমলুকে। গভীর রাতে বিশিষ্ট নেতা যখন পেঁছিলেন তার কুঁড়েঘরের সামনে, আধা-ঘোমটা টেনে হতভাগিনী মা বেরিয়ে এল কাঁদতে কাঁদতে। বললো: "আমরা ছোটজাত, লেখাপড়া জানি না, দুবেলা দুমুঠো খেতে পাই না। মনের মধ্যে কী হচ্ছে বোঝাতে পারবো না ; তোমরা এই যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তাহলে শোক ভুলবো।" বত্রিশের ভগবানপুর: বীরের ভঙ্গীতে, অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে গুলি খেয়েছিলেন ৭৫ বছর বয়েসী কামদেব প্রধান। ঈষৎ সহানুভূতি দেখিয়ে এস-ডি-ও জিজ্ঞেস করেছিলেন—"আপনার শেষ সাধ কী?" শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে মরণের দুয়ারে পা-বাড়ানো বৃদ্ধ একটি শব্দ উচ্চারণ করেছিল শুধু, অতিকষ্টে—"স্বরাজ!" ধ্যানমগ্ন হতে না পারলে স্বদেশাত্মার পরিপূর্ণ রূপ অনুভব করা যায় না। ছন্দোবদ্ধ পংক্তির গণ্ডী ছাড়িয়ে জন্মভূমি যে স্বর্গাদপি গরিয়সী, সে কথাও কল্পনা করা যায় না।

আন্দোলনের পীঠস্থান মেদিনীপুরের 'বিপ্লব-জমিন' কোনকালেই 'পতিত' নয়। মেদিনীপুরের মাটির দিকে সকলে তাকিয়েছে বিস্ময় নয়নে চিরকাল। এখানে 'আবাদ' হয়েছে যেমন, 'সোনাও' ফলেছে তেমনি অবিরল। দিতে পারা যদিবা অর্ধসত্য হয়, নিতে পারাটাই পূর্ণসত্য প্রকৃত। বিদ্রোহ-বিপ্লব কোনদিন

আমদানি করা যায় না। তহবিল শূন্যে থাকলে কয়েক বছরে দেউলিয়া হয়ে যেত মেদিনীপুর। কারণ, উচ্চ ভাবাদর্শ যত মূল্যবান হোক না কেন, তাকে রূপায়িত করার জন্য সাধারণ মানুষেরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। মেদিনীপুরের মহিমাও তাই তুলনারহিত। মারাঠা-শিখ-রাজপুত সম্মিলিত শৌর্য যেন ভর করেছিল মেদিনীপুরের চরিত্রে আগাগোড়া ব্রিটিশ রাজত্বকালে। দীর্ঘকালব্যাপী স্বাধীনতা-স্পৃহা সঞ্চারিত করা যায় না। আপন হৃৎপিণ্ডটাই যেন উপড়ে ফেলতে চেয়েছে মেদিনীপুর বরাবর। সহজাত অন্তর্নিহিত আত্মিক উৎস পরিস্ফুট না হলে মাতৃমুক্তির বোধন হয় না, আর মহাশক্তি জাগরিত না হলে দানবদলান লক্ষ্যে মহাসমরে নামা যায় না।

বিদেশী শাসকগোষ্ঠী আর স্বদেশী নেতাদের টুকরো টুকরো কয়েকটি মন্তব্য এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে মেদিনীপুরকে সঠিক বোঝানোর জন্য। ১৯২২ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত আমলাদের সুর একই রকম। ওরা কি তাহলে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন? বর্দ্ধমানের কমিশনার যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন চিফ সেক্রেটারিকে ১৯২২ সালের গোড়ায়ঃ 'মেদিনীপুর জেলার পরিস্থিতি ক্রমশঃ জটিলতর হচ্ছে'। পরের মাসে লিখছেনঃ 'জেলার পশ্চিমাঞ্চলে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর মানুষজন সম্ভবতঃ বিশ্বাস করতে সুরু করেছে, ব্রিটিশ রাজত্বের অস্তিত্ব বুঝিবা আর নেই'। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি এ ধরনের আর একটি রিপোর্ট (ডি. ও. ৪৪৬ জে. ওয়াই): 'মেদিনীপুর সম্বন্ধে আমি একেবারেই নিরাশ....নিতান্ত অজ্ঞ এবং চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত সাধারণ মানুষদের এমন ব্যাপক পরিবর্তন আমার কাছে অভাবনীয়'। লৌহমানব জেমস পেডি কখনো তমলুক, কখনো কাঁথি, আবার পরক্ষণে ঘাটালকে নিকৃষ্টতম মহকুমা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ১৯৩২ মার্চে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিখে পাঠাচ্ছেনঃ এই ডিভিজনে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত শান্ত জেলার তুলনায় মেদিনীপুরের অবস্থা বিপরীত ও স্বতন্ত্র। গড়বেতা, দাঁতন, কেশপুর. সবং, দাসপুর কিংবা গোটা তমলুক-কাঁথি মহকুমায় 'মহিলারা অগ্রণী সর্বত্র'। কথাটা কোন অংশে মিথ্যে নয়। একজন গবেষক দেখিয়েছেন, ১৯৩২ প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে কেবল নন্দীগ্রাম থানাতেই আইন অমান্য আন্দোলনে কিছু কম ৩৫ হাজার পুরুষ যেখানে অংশ নিয়েছিলেন, প্রায় ২০ হাজার নারী সেখানে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন। লবণকেন্দ্রে পুরস্ত্রী উপস্থিতির সংখ্যা কাছাকাছি ৪ হাজার; কারাদণ্ড ভোগ করেছেন ২৫; লাঠিচার্জ কিংবা

ধাক্কাধাক্কিতে আহত হয়েছেন ১২৪। আক্ষরিক অর্থে আকাশে-বাতাসে শংখধ্বনি ভাসিয়ে বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ওঁরাই।

তিন-তিনজন গভর্ণরের বক্তব্যও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। জন এণ্ডারসন তমলুক-কাঁথির ওপর খড়্গহস্ত ত্রিশের দশকে। মেদিনীপুর শহরের ঘটনায় রীতিমত হিংস্র। চল্লিশের দশকে জন আর্থার হারবার্ট দেখেছেন বড় মাপের বিদ্রোহের প্রস্তুতি। এমনকি ২৯ সেপ্টেম্বর থানা দখল অভিযানকে ছোটোখাটো রিহার্সেল বলে ধরে নিয়েছেন তিনি। রিচার্ড গার্ডনার কেসির কাছে অসহ্য মনে হয়েছে পরিস্থিতি, পুরোপুরি কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছেন তিনি; কারণ এ ধরণের ব্যাপার বরদাস্ত করা কোনমতে সম্ভব নয়। এত ফিরিস্তি দেওয়ার পর একটা কথা না বললে কিন্তু অন্যায় করা হবে। 'মুক্তমন' আর 'বদ্ধমন' দুটি শব্দ পাশাপাশি আছে আমাদের চিরাচরিত শাস্ত্রে। ইংরেজদের বেলাতেও ঐ মন্তব্য সমানভাবে খাটে। খোদ ইংলণ্ড থেকে 'ভারত বান্ধব সমিতি' এসেছিলেন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরজমিনে পর্য্যবেক্ষণ করতে। সদস্যদের অন্যতম সহযাত্রী ছিলেন মিঃ ম্যাটার্স ও মিস হুইটলি। ওদের অভ্যর্থনা জানাতে হাজার হাজার মানুষ জড় হয়েছিল কাঁথির দারুয়া ময়দানে ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২। অচেনা বিদেশীদের অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি আমাদের মানসিক আঘাত নিরাময় করতে কিছুটা সুযোগ এসেছিল নিশ্চয়ই। এদিকে মহাত্মা গান্ধীও চিঠি লিখছেন জওহরলালকে ২১ জানুয়ারি ১৯৩৪ঃ 'মেদিনীপুরের ওপর নারকীয় অত্যাচার শুনে হতভম্ব হয়ে পড়েছি। এ যে পাঞ্জাব-ম্যাসাকারকেও হার মানিয়ে দেয়'। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবু বাংলা-প্রিমিয়ার ফজলুল হকের উক্তি (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩) আজও ইতিহাসের বস্তু ঃ 'গত পাঁচ মাস মেদিনীপুরের ইতিহাস প্রকৃত পক্ষে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস।....মেদিনীপুরের ঘটনা বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। এটা এখন সর্ব-ভারতীয় ব্যাপার।'

* * *

সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে কোন কোন ঘটনাকে একেবারে ওপরের সারিতে রেখে দেওয়া যায়? ঐতিহাসিক মূল্যে সর্বকালীন মর্যাদা আনা যায়? যদিও অফুরন্ত ঐশ্বর্যরাশি ক্রমিক পর্যায়ে বাছাই করার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। হেমচন্দ্র কানুনগো ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার প্রথম পরিকল্পনা গড়েছিলেন, এটিকে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে ভাবুন আর না ভাবুন; ক্ষুদিরামের ফাঁসি (১৯০৮) কিন্তু সমস্ত দেশকে নাড়া দিয়েছিল প্রচণ্ডতর বেগে।

গ্রামে গ্রামান্তরে সাধারণের মুখে মুখে করুণরাগিনীর জনপ্রিয় গান শোনা যায় তখনই, দেশবাসীর গোপন হৃদয় যখন থর থর কেঁপে ওঠে সীমাহীন ব্যথা আর বেদনায়। গীতিকারের নামও তখন হারিয়ে যায়। মজঃফরপুরের রাস্তায় যে বোমাটি ছুঁড়েছিলেন তিনি, তা ছিল নির্জীব ভারতের প্রথম প্রতীকী উচ্চকিত প্রতিবাদ। মাতঙ্গিনী প্রাণ দিয়েছিলেন (১৯৪২) ব্রিটিশ সেনানীর বুলেটে, একেবারে সামনাসামনি প্রকাশ্য রাজপথে। অসীম সাহসিকতার ঐ আশ্চর্য কাহিনী লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায় চিরকালের জন্য। ক্ষুদিরাম তরুণ, মাতঙ্গিনী বৃদ্ধা। প্রথমজন সশস্ত্র সংগ্রামে অগ্রগামী, অন্যজন অহিংস আদর্শে যোগমার্গী। মরণকে বরণ করে দুজনেই গেয়েছেন জীবনের অফুরাণ জয়গান।

মেদিনীপুর শহরে পরপর তিন ব্রিটিশ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিধন (১৯৩১, ৩২, ৩৩) রোমাঞ্চকর এবং অভূতপূর্ব। বিমল দাশগুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য প্রমুখ এক গুচ্ছ সতেজ তাজা প্রাণ আজো তাই সশস্ত্র বিপ্লবীদের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রুদ্র যেন মেতেছেন প্রলয় নাচনে দক্ষসংহার শেষে। ফ্যাবিয়ানপন্থীদের তাঁরা সরিয়ে রেখেছিলেন দূরে, অনেক দূরে। একাদশতনু তখন ভৈরববেশে শত্রুধ্বংসী পাশুপত নিয়েছেন হাতে, বাজিয়ে দিয়েছেন ডমরু-বিষাণ অট্টহাস্য নিনাদে। ....অসহযোগ আন্দোলনের সমকালে (১৯২০) গোটা জেলাকে সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন বীরেন্দ্রনাথ। কাঁথি তখন অগ্রণী ; পেছিয়ে যাওয়া কাকে বলে, কোনদিন কোন ছলে, কথাটাই সে শেখেনি। এমনকি গান্ধীজীর অনুশাসন কিঞ্চিৎ এড়িয়ে বাড়তি দুধাপ এগিয়ে গেছলেন দেশপ্রাণ শাসমল। ইউনিয়ন বোর্ড বাতিল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন, সর্বস্ব পণ করে ট্যাক্স বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন। মেদিনীপুর তখন ভারতের আকাশে ধ্রুবনক্ষত্র সদৃশ। ....তমলুকে জাতীয় সরকার পত্তন (১৯৪২) অবশ্যই সাম্প্রতিক ইতিহাসে অনন্য। এই পাল্টা সরকারের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব আর কোথাও দেখা যায়নি। নজীরবিহীন এ কৃতিত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব রোমের 'ট্রায়ামভিরেট'-এর মত এখানেও দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন সতীশ সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, সুশীল ধাড়া—খ্যাতিমান অকুতদার বীর্যবন্ত ত্রয়ী। স্পর্ধিত দাম্ভিকতার জবাবে দর্পিত ঔদ্ধত্য উপহার পাঠিয়ে বিদেশী শক্তিকে মোলাকাত করেছিল মেদিনীপুর, এইভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম লগ্নে।

মেদিনীপুর জেলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ কয়েকটি পরিবারের নাম নিঃসন্দেহে তর্কাতীতভাবে উল্লেখযোগ্য। এলাহাবাদের নেহরু কিংবা কলকাতার

বসু পরিবারের মত এখানেও বেশ কয়েকটি বাড়ী আলাদাভাবে বেছে নেওয়া যায়। এ বিষয়ে সবচেয়ে আগে মনে পড়বে—নাড়াজোলের রাজা, মেদিনীপুরের ঘোষ, মুগবেড়িয়ার নন্দ, কলাগেছিয়ার মাইতি, তিলন্তপাড়ার মাইতি, কিংবা তমলুকের মুখার্জী—এ ধরনের কতকগুলি বিখ্যাত ফ্যামিলি। আরো অসংখ্য নাম মনে আসছে, কিন্তু ফর্দ দীর্ঘ করে লাভ নেই। সন্ধ্যার নির্মল আকাশে অজস্র তারা যখন ফুটে ওঠে, চোখ ফেরাতে গিয়ে তখন বিশেষ কোন দিকে থেমে থাকা যায় না। নাড়াজোলের রাজারা যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন, যে বদান্যতা দেখিয়েছিলেন, তারজন্য কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। চাপেকার-জননীকে শ্রদ্ধা জানাতে নিবেদিতা স্বয়ং গিয়েছিলেন পুনায়। লোকান্তরিতা না হলে নিশ্চয় তিনি কড়া নাড়তেন ঘোষ বাড়ীর দরজায়। আসলে জেলার শত শত মধ্যবিত্ত তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত পরিবার স্বদেশীদের সঙ্গে সংস্রব রেখে চলেছেন, এটা একটা মস্তবড় ইতিবাচক দিক। তবে কেউ প্রচ্ছন্নভাবে, কেউবা সর্বজন সমক্ষে।

আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অন্তঃসলিলা কারণ হিসেবে অনেকে অবশ্য দুটি ভিন্নতর আন্দোলনকে আঙুল তুলে দেখাতে চেয়েছেন জেলার কিয়দংশ উড়িষ্যার সংগে সংযুক্তির বিরুদ্ধে গণ-প্রতিবাদ (১৯৩১-৩২), তারো আগে মাহিষ্য সমাজের কৌলিন্য প্রতিষ্ঠার জোরদার শাস্ত্রসম্মত প্রয়াস। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের সুদূর বিস্তৃত প্রভাব কতখানি কার্যকরী হয়েছে তাও ভাববার বিষয়। তাছাড়া উৎকল শ্রেণী, মধ্যশ্রেণী এবং কুলীন ব্রাহ্মণদের পারস্পরিক সম্পর্ক রীতিমত ইণ্টারেসটিং। আর একটি অনুধাবনযোগ্য বিষয় হলো, শাক্তপীঠস্থান রূপে বহুখ্যাত তমলুক-কাঁথি এলাকায় কিভাবে অহিংস বিক্ষোভ দানা বেঁধেছিল হঠাৎ; অথচ সশস্ত্র বৈরিতা কেনই বা ছড়িয়ে পড়লো জেলার পশ্চিমাংশে, বৈষ্ণব গোস্বামীরা যেখানে প্রচার করেছিলেন চৈতন্যমার্গী প্রেমধর্ম অন্ততঃ কয়েক শতাব্দী থেকে? তবে এতসব বিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব এক্ষেত্রে আপাততঃ অপ্রাসঙ্গিক।

এই চল্লিশ বছর পরিধিতে মেদিনীপুরের যথার্থ নায়ক কে? বীরেন্দ্র শাসমল অথবা অজয় মুখুজ্জে? একজন যদি মুকুটহীন রাজা হন, অন্যজন তবে মন্ত্রণাদাতা চাণক্য। একজন দ্বিতীয় দশকে পরিশ্রমী সংগঠক, অন্যজন চারের দশকে ধুরন্ধর পরিচালক। প্রথমজন গোটা জেলা ঘুরে প্রাণ স্পন্দন এনে দিয়েছেন, সেদিক থেকে দ্বিতীয়জন মোটামুটি নিজের মহকুমায় সীমাবদ্ধ থেকেছেন। প্রথমজনে যতটা ব্যাপ্তি, দ্বিতীয়ে ততটাই গভীরতা। চকিত দর্শনে একজন চিক্কন শ্যামল, অন্যজন গৌরবর্ণ উজ্জ্বল। একজন বিবাহবন্ধন স্বীকার করলেও অন্যজন

আজীবন অপত্নীক। একজন কথাবার্তায় ইংরেজীতে তুবড়ি ছোটান, বাগ্মীঅন্য অন্যজন গল্পে গল্পে আগুন ঝরান। একজন মূলতঃ শহরের তারপর গ্রামের, অন্যজন প্রধানতঃ গ্রামের তারপর শহরের। একজনের দরবার মস্তিষ্কে, অন্যজনের সমাদর হৃদয়ে। একজন মেদিনীপুরের পাশাপাশি কলকাতার ওপর নজর রাখতে গিয়ে তেমনভাবে তাল মেলাতে পারেননি; অন্যজন রাজধানীতে খবরদারি আদৌ আয়ত্তাধীন বলে ভাবেননি এবং সেজন্য জেলার বাইরে নেতৃত্ব ছড়ানোয় কোন দিনই এগিয়ে আসতে চাননি। দুজনেই গান্ধী শিষ্য, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অথচ দ্বিধাগ্রস্ত, একরোখা অথচ অভিমানী। এঁদের শ্রেষ্ঠত্ব কিন্তু পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ সামঞ্জস্যময় নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তনে। অর্থাৎ তত্ত্ব রূপায়নের বেলায় দরকার মত অদলবদল ঘটিয়েছেন, গতানুগতিকতার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসার সাহস দেখিয়েছেন। যদিও প্রথমজন দরদী, অন্যজন নিরাসক্ত। না, তবু এরা নন, মাতঙ্গিনী-ক্ষুদিরামও নন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে মেদিনীপুরের প্রকৃত নায়ক খ্যাত-অখ্যাত, ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-পণ্ডিত, ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক, স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নামহীন গোত্রহীন অগণিত মানুষ। তারাই চালিকাশক্তি, তারাই নিয়ন্ত্রক।

বিদ্যুৎ-বহ্নিতে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে মেদিনীপুর একলা চলেছে কখনো; কখনো বা গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে একতারা ফেলে রেখে সশব্দে বাজিয়ে দিয়েছে ভেরি। ইংরেজ কবির মত এরাই বোধ হয় উচ্চারণ করতে পেরেছে অন্তরের অন্তস্থল থেকে: 'But above all other things, Sprit, I love thee'. যে জয়ধ্বজা বহন করেছে মেদিনীপুর, ঝড়ই তার সত্যিকারের প্রতীক। কালবৈশাখীর আশীর্ব্বাদ আর শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ নিয়ে গোটা জেলা বসেছিল রাত্রির তপস্যায় একদা। আপন হাতেই চূর্ণ বিচূর্ণ করেছে নিজ মর্ত্যসীমা। দেবতার অমর মহিমা তবু ঝরে পড়েছে কিনা, সেটাই আজ একমাত্র জিজ্ঞাসা।